স ং শ প্ত ক

শহীদুল্লা কায়সার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, নং বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

আগামী দিনের

বংশধরদের হাতে

উৎসর্গিত

দুঃসাহস ওই খানকী মেয়ের! পঞ্চায়েৎ মানে না! গর্জে উঠেছিল ফেলু মিঞা। পাঠিয়েছিল রমজানকে আর পেয়াদা কালুকে। পেয়াদা চুলের মুঠো ধরে হেঁচড়ে হেঁচড়ে টেনে এনেছে মেয়েটিকে।

হর সখ্‌ছ্‌ যে মোমিন মুসলমান সে গোনাহ্‌কে ভয় করে। গোনাহ্‌ দুই কিসিমের—এক কবীরা গোনাহ্‌, দোসরা সগীরা গোনাহ্‌। সগীরা গোনাহ্‌র তওবা আছে, মাফ আছে। কিন্তু কবীরা গোনাহ্‌র তওবা নেই, মাফ নেই। বড় কঠোর তার শাস্তি। যেনাহ্‌ কবীরা গোনাহ্‌। পাটের গাছের মত লম্বা দাড়ির আগায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলে গেলেন খতিব সাহেব। তিনি হাফিজ-ই-কোরান, সহি হাদিসের মশুর ওস্তাদ। তিনি মসজিদের খতিব। জুমার নামাজ এবং খোতবা দুটোই তিনি পড়ে আসছেন গত পঁচিশ বছর। তাঁর কথা পবিত্র, কোরানের বয়াতের মতোই অভ্রান্ত অবশ্য পালনীয়। তাই তিনি যা বলেন শুধু বলেন না, এলান করেন।

কী শাস্তি। কী সেই কঠিন শাস্তি। পঞ্চায়েতের শেষের দিকে বসে আছে গ্রামের ছেলেপুলেরা, মাতব্বর নয় এমন মাঝবয়সীরা। উৎকণ্ঠায় ওদের জিহ্বার তালু শুকিয়ে আসে—কী শাস্তি হবে ওই পতিতার! যেনার বিচার তারা কোনদিন দেখেনি, শোনেও নি। দু'চার মৌজায় যেনার বিচার কখনো হয়েছে কিনা সে কথাও জানা নেই কারও।

শরিয়ত বলে, চুরি করলে যে হাত দিয়ে চুরি করেছে সে হাতটি কেটে দাও, খুন করলে ঠ্যাংটা ছেঁটে ফেল আর যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার, পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা যেনাকারিনীর মৃত্যু হয়। এতটুকু বলে পানের পিক গেলবার জন্য থামলেন খতিব সাহেব।

ছাঁৎ করে ওঠে সেই শেষ কাতারের মানুষগুলোর বুক।—বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ঢেলিয়ে মেরে ফেল? ওই মেয়েটাকে এ ভাবেই মারতে হবে? পানের পিকটা পেটের দিকে চালান দিয়ে বোজা চোখে উর্ধ্বমুখী হলেন খতিব সাহেব। গভীর চিন্তায় যেন ডুবে গেছেন তিনি। শরা-শরিয়তের জটিল ব্যাপার, না ভেবে উপায় আছে তাঁর? সেই অবস্থাতেই চিবানো পানের দলাটা জিবের আগা দিয়ে ঠেলে ঠেলে বাঁ-গাল থেকে ডান গালে সরিয়ে আনেন। ঠোঁট জোড়া বন্ধ রেখে গরুর জাবর কাটার মতো আস্তে আস্তে চিবোতে থাকেন।

সারা মজলিসের চোখ খতিব সাহেবের মুখের উপর। শরিয়তের এমন

কঠিন বিধানটি ঘোষণা করার পরও যখন চোখ বুজে ভাবছেন তখন আরও কিছু নিশ্চয় বলার আছে খতিব সাহেবের। কি বলবেন তিনি?

অবশেষে চোখ খুললেন খতিব সাহেব। সকলের দিকে এক নজর বুলিয়ে বললেন: তবে এই আউরত পয়লা গোনাহ্ করেছে, তাই আমি বলি ওকে শুধু দোররা মেরেই ছেড়ে দেওয়া হোক। পাঁচ দোররা।

আরবী ড়-আইন বর্ণটিকে যেমন একেবারে গলার গভীর খাদ থেকে টেনে উচ্চারণ করতে হয় তেমনি ভাবে আলজিহ্বারও নীচ থেকে টেনে টেনে 'দোররা' শব্দটি বার কয়েক উচ্চারণ করেন খতিব সাহেব।

আল্লাহ্ পাক, তুমিই গোনাহ্ মাফ করনেওয়ালা, মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত জোড়া আকাশের দিকে উঁচিয়ে কথা শেষ করলেন খতিব সাহেব। তারপর কোলের উপর রাখা তসবির ছড়াটা হাতে তুলে নিলেন। তসবির গোটা গুনে গুনে আল্লাহ্ পাকের নাম স্মরণে মন দিলেন।

দোররা? পাঁচ দোররা?

বুক অবধি মাটিতে পুঁতে টিলিয়ে টিলিয়ে মেরে ফেলবার অমোঘ বিধান শুনে বুক যাদের ছাঁৎ করে উঠেছিল তারা কি আশ্বস্ত হল?

না। আশ্বস্ত হয় না শেষের সারির লোকগুলো। গায়ের লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় তেমনি একটা ভয়াকুল শিহরণ, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন বয়ে যায় সেখানে। মেয়েটি কেমন করে সইবে ওই ভয়ঙ্কর শাস্তি? তাই ওদের আশঙ্কা। আবার কারও কৌতূহল। চোখগুলো খতিব সাহেবকে ফেলে এবার মেয়েটির উপর নিবদ্ধ হল।

নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, যেমনটি প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ওসব হুমকি ধমক বুঝি বহু শোনা আছে তার, পরোয়া করে না সে। শুধু একবার ডান পা থেকে বাঁ পায়ে নিয়ে এল দেহের ভারটা। অবস্থান পরিবর্তনের আচমকা আলোড়নে ওর অন্তর্বাসহীন দুটি স্তন উত্তাল তরঙ্গের ফনার মতন মাথা তুলে কেঁপে কেঁপে আবার স্থির হয়ে যায়। ডান পায়ের উপর ভর রেখে ছেঁড়া আঁচলটাকে এবার খুব সেঁটে পিঠের এলোমেলো ছড়ানো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে আনল মেয়েটি। তারপর গলার কাছটিতে দোপাট্টা করে বেঁধে নিল। আর সে বন্ধনে ওর ফালি-বাঁশ দেহটি নাভি অঞ্চল থেকে ঈষৎ বেঁকে এল ছিপের আগার মতো। পুষ্ট অথচ ধারালো দেহের ওই বঙ্কিম ভঙ্গিটিই যেন বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষণা। থোড়াই পরোয়া করে সে এই পঞ্চায়েতের।

মুহূর্তে চকচকিয়ে ওঠা চোখ জোড়া অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় ফেলু মিঞা। লালা ঝরে রমজানের জিবের ডগায়, লোভী কুকুরের মতো।

একবার আড়চোখে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় খতিব সাহেব। তসবী গোটার উপর দ্রুততর হয় আঙ্গুলের সঞ্চালন। দোয়া পড়ে দূরে রাখেন পাপের শয়তানকে—তওবা আসতাগ ফিরিল্লা। তওবা তওবা।

মেয়ে মানুষ। তাকে দোররা মারাটা কি ঠিক হবে, না সম্ভব হবে?

মিঞা কি বলেন? প্রশ্নের আকারে জবাবটি ও উপস্থিত করে সতুর বাপ। তারপর ভার-ভারিক্কী মুখের তোয়াজটা অপ্রশস্ত হাসির আকারে মেলে ধরে মিঞা অর্থাৎ ফেলু মিঞার দিকে। তিনিই কর্তা তিনি যা বলবেন সেটাই তো হবে শেষ বিচার, হক বিচার।

গোটা মজলিসের চোখ এবার ফেলু মিঞার দিকে। মোগলীয় হুঁকোর নল হাতে চেয়ারে বসা আতরের খোসবু ছড়ানো ওই যে মিঞার বেটাটি সে কি একটা 'সাব্যস্তের' কথা বলতে পারে না?

'ন্যায্য' কথাই বলেছে সতুর বাপ। মেয়ে মানুষকে মজলিসের সামনে, বলতে গেলে গোটা গেরামের সামনে বেপর্দা করে দোররা মারা—এ বড় না-জায়েজ ব্যাপার। সতুর বাপের সমর্থনে একটা জোরালো যুক্তিই তুলে ধরলেন কারি সাহেব। তিনিও হাফিজ-ই-কোরান, শরা-শরিয়ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অতএব ফেলবার নয় তাঁর কথা।

সত্যি-ই তো। গোটা গেরাম না হোক মজলিসের এত লোকের সামনে একটি যুবতী মেয়ের নিতম্বে চাবুক মারা, এ বড় বিশ্রী কারবার। শেষের সারির লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওরা কি বলবে কিছু?

জরী সুতোয় পেঁচানো রাবারের নলটি আলবোলার গায়ে জড়িয়ে রেখে মুখের অবরুদ্ধ ধোঁয়া পরম আয়াশে ঢোকে ঢোকে ছেড়ে দেয় ফেলু মিঞা। চোখ উপরে তুলে অপেক্ষা করে, হাল্কা মেঘপুঞ্জের মতো ধোঁয়াটা যতক্ষণ কুণ্ডুলী পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁচারির উঁচু চালের সাথে লাগোয়া দমদমায় অদৃশ্য না হয়ে যায়। তারপর মিঞা তরবিয়তে একটু হেলে তুলে বলল: সতুর বাপ মাতবর এবং কারি সাহেব যথার্থই বলেছেন। আমি বলি ওকে ছেঁকা দেয়া হোক। আর গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢোল পিটিয়ে দেয়া হোক, ওকে কেউ যায়গা দেবেনা, খাবার দেবেনা; দিলে এক ঘরে হবে, মেল থেকে বরখাস্ত হবে।

তথাস্তু। তথাস্তু। মিঞার কথার উপর কি কথা আছে? সকল মাতবর

এক বাক্য সাব্যস্ত করল যেনাহ্ করার অপরাধে হরমতিকে ছেঁকা দেয়া হবে। এবং একঘরে করা হবে।

মেয়েটি কি একবার কেঁপে উঠল? ভয় পেল?

তেমন কোন আভাস নেই মেয়েটির চোখে অথবা মুখে। সেই যে চেলা কাঠটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণে মুখটা তুলেছে ও। চোখ মেলে দেখছে দণ্ডদাতাদের। মেয়েটি গৌরবর্ণা, সুন্দরী বললে খুবই কম বলা হয় বুঝি। জ্বরের তাপে জ্বল জ্বল করছে গৌর মুখখানি। চোখ দুটি কামার চুল্লির গনগনে দুটুকরো লোহার মতো পুড়ছে আর আগুনের হলকা ছোটাচ্ছে। দেমাক নয়, এ তার প্রচণ্ড ঘৃণা। চোখের গর্ত থেকে গরম ধাতুর মতো গলে গলে পড়ছে সে ঘৃণা। বেপরোয়ার সেই দৃষ্টিতে ও যেন শেষবারের মত জরিপ করে নিল কে তার শত্রু, কে তার মিত্র। তারপর আগের মতো ঘাড়টাকে শক্ত আর তেরছা করে চেয়ে রইল সেই চেলা কাঠের দিকে। কাঠের মুখটা পোড়া। কেউ হয়ত তামাক খাবার জন্য উনুন থেকে তুলে এনেছিল। বিচারকরা কেউ তাকাতে পারেনা পাপিষ্ঠার সেই জ্বলজ্বলে মুখের দিকে। অবশেষে হুকুম এল ফেলু মিঞার : কালু, শুরু কর্ তোর কাম।

ফেলু মিঞার একাধারে লেঠেল, পেয়াদা আর খাস নফর কালু। হুকুম পেয়েই কালু লেগে যায় ছেঁকার এন্তেজামে।

যারা মাতবর নয় তাদের মাঝে শেষের সারির আগের সারিতে বসেছিল সেকান্দর মাষ্টার। মেয়েটি যে ব্যাভিচারিণী সে সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ নেই ওর। তাই সহানুভূতিও নেই মেয়েটির প্রতি। তবু কি যেন বলার থেকে যায়, ঠোঁটের গোড়ায় এসেও কথাটা বের হতে পারেনা। বলাও হয়না। এক বাজারে দুই ভাও, এটা কোন দেশী কথা। 'অন্যায্য' কথা। উল্টো পক্ষের বিচারটা কি হবেনা? একেবারে শেষের লাইন থেকে আর্ধেক দাঁড়িয়ে বলে লেকু। বলেই টুপ করে বসে পড়ে।

শেষের সারির লোকগুলো একটু নড়েচড়ে বসে ওরই কথায় যেন সায় দিল। এ কী বেতমিজী! মাতবরদের এক মুখের রায়কে বলে কিনা এক বাজারে দুই ভাও? লাল হয়ে ওঠে মাতবরদের মুখ, কিন্তু, না শোনার ভান করে চুপ মেরে রইল ওরা।

শুধু ঘাড়টা ফিরিয়ে একবার দেখল সেকান্দর মাষ্টার। ওর কথাটাই লেকু বলে ফেলেছে, অতি নিখুঁত ভাবে। নিজে বললে, অত পষ্টাপষ্টি বলতে পারতনা সেকান্দর মাষ্টার।

আসলে কারো কাছেই অস্পষ্ট থাকার মতো নয় ব্যাপারটা। সবাই জানে মেয়েটি ছিনাল, কসবী। পাপের শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু যে হার্মাদ ছেলে আনল ওর পেটে সেও তো এই মজলিসে হাজির। তাকে চেনেনা কে! মেয়েটির শাস্তি হলে সে লোকটিরও বিচার হওয়া দরকার বই কি? এটাই সেকান্দরের কথা।

লেকুর কথাটা আমারও। এক হাকিমের দুই বিচার, সেটা অবিচার। রমজান কিছু বলুক। যেন একটা বোমা ফাটাল সেকান্দর। আভাষ নয় ইঙ্গিত নয়, একেবারে স্পষ্ট কথাটা বলেই ফেলল ও?

কারো পছন্দ হলনা কথাগুলো, ভাঁটার মত চোখে ক্রোধ ফাটায় রমজান। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে নেয় সতুর বাপ। প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে চিল্‌মচিতে পানের পিক ফেলে ফেলু মিঞা।

সেও একটা দিক বটে। মাষ্টারের কথাটা গওর করতে হবে আমাদের। তবে ভাই জুম্মা শেষ হল অনেকক্ষণ। বেলা আসর হতে চলল। খাবনা আমরা? সামনের মিটিংএ বিষয়টা আসতে পারে, কি বল মাষ্টার? চাতুর্যের সাথেই আলোচনার গলা কেটে দিল ফেলু মিঞা।

মাষ্টার অর্থাৎ সেকান্দর আর না করে কেমন করে! বলছে ফেলু মিঞা, তার উপর লেকু ছাড়া আর কেউ কি মুখ খুলবে? তেমন কোন ভরসা দেখছেনা ও। অতএব রফার নামে ধামাচাপার প্রস্তাবটাই মেনে নেয় মাষ্টার।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি আঁকা তামার একটি পয়সা। কাঠ কয়লার আগুনে পুড়ে পেয়েছে নতুন এক চেহারা। না আছে সেই মুকুট, না সম্রাটের মুখ, মনে হয় জমাট আগুনের একটি গোলাকার পাত। চিমটে দিয়ে কয়লা থেকে যখন কালু তুলে আনল গনগনে পয়সাটা গোটা মজলিসে কেঁপে কেঁপে গেল একটি ভীতির ছায়া। শুধু ভাবান্তর নেই মাতবরদের মুখে। আপনাদের বিচারের মানদণ্ডে তারা অবিচল।

ইতিমধ্যেই বসিয়ে দেয়া হয়েছিল মেয়েটিকে। দুজন যোয়ান তার হাতপাগুলো চেপে ধরেছে, যদিও নাকের আদলে ছোট্ট একটি কুঞ্চনে আর বিনা প্রতিবাদে ওদের হাতে হাতপাগুলো সঁপে দেওয়ার মাঝে কেমন একটা অবজ্ঞা ছিঁটিয়ে রেখেছে মেয়েটি। যেন বলছে প্রয়োজন কি এই জবরদস্তির! এবার রমজান নিজেই এগিয়ে আসে। দু তালুর যাঁতায় খুঁতনিটা চেপে রেখে উ চিয়ে ধরে ওর মুখখানি। চোখ বুজে নেয় মেয়েটি।

মেয়েটি কি কাঁপছে? যেমন কাঁপে কোরবাণীর পশুগুলো? দূর থেকে

লেকু কিছুই বুঝতে পারেনা। রমজানের হাতের ফাঁক দিয়ে যতটুকু নজরে পড়ে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে কেমন ঝিম মেরে আছে ও। লাল টকটকে ওর মুখ, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে ঠাঁই করেছে। মনে হয় পাকা শসার ছিলকের মত চিকন মুখের চামড়া ফুঁড়ে এখনি রক্তের ফিনকি ছুটবে।
চিমটের আগায় পোড়া পয়সাটা ধরে এক পা এগোয় কালু, ছ্যাঁৎ করে চেপে ধরে, অনেকক্ষণ চেপে রাখে, মেয়েটির কপালের ঠিক মাঝখানে, যেখান থেকে কিঞ্চিৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওর সুন্দর টিকোল নাকটি আর তুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তুটো কাজল রেখা ভ্রূ।
লেকু দেখল নির্দয় ব্যাধের মুঠোয় অসহায় পাখির ছানার মত কী যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে গেল মেয়েটি। তার পর নিথর হল। মনে হল লেকুর, পায়ের তলায় মাটিটা ওর শরীরের ভর আর রাখতে পারছেনা, এখুনি বুঝি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে ও। অসহ্য! অসহ্য! আল্লাতালা কি মানুষের রুহগুলো কেড়ে নিয়েছে? সেই যে সিনার নীচে থাকে মানুষের 'কইলজা' সে কি পাথর বনে গেছে? নইলে মানুষ কেমন করে এত বেরহম হয়, চেয়ে চেয়ে দেখে অমন নিষ্ঠুর নির্যাতন!
কলি। কলি। ঘোর কলি। আল্লার তুনিয়া কি আর আছে? এখন ঘরে ঘরে, মানুষের মনে মনে শয়তানের বসতি। শাস্তি যতই কঠিন হোক শয়তানের গায়ে লাগেনা তার আঁচড়। সকলে মিলেই এই রায় দেয় মাতবররা এবং এ যে অভ্রান্ত সত্য তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই ওদের মনে। প্রমাণ তো হাতের কাছেই। নইলে গাঁ ভর লোকের সামনে এত ঘটা করে হাতপা চেপে ধরে কপালের এক পয়সা পরিমাণ চামড়া পুড়িয়ে দেয়া হল অথচ একটু 'আহ' শব্দ করলনা মেয়েটি? তেমন যে পশু ছাগল, কোরবাণীর সময় কেমন করে দেখনি? ছটফটিয়ে চিল্লিয়ে ঠ্যাং ছুঁড়ে কী একাকার কাণ্ড করে, সামলানো দায়।
হ্যাঁ হ্যাঁ কলিকাল ছাড়া আর কি! সমাজ মানেনা, বিচার মানেনা, শাসনকে ভ্রূকুটি করে ছোটলোকের জাত। আসকারা পেয়ে ব্যটারা মাথায় চড়েছে, গায়ে ব্যটাদের চর্বি জমেছে। যেন জনান্তিকেই কথাগুলো বলে গেল ফেলু মিঞা।
ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের নাম আর প্রতিকৃতি অঙ্কিত কলঙ্ক চিহ্নটি ললাটে নিয়ে চলে যায় মেয়েটি। ঠিক দৃপ্ত ভঙ্গিমায় নয়, এতক্ষণে ওর শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, পা জোড়া ঠিকমত ভার সামলাতে পারছেনা।

যন্ত্রণার কালো কুঞ্চনে বিকৃতি নেমেছে ওর মুখে আর জল জমেছে চোখে।

ব্যাভিচারিণীর সমুচিত দণ্ড বিধান করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে ফেলু মিঞা। ঠোঁটের দৃঢ়তায় তার শক্তি আর মর্যাদার সদম্ভ ঘোষণা।
ইয়া পরোয়ার দেগার! গোনাহ্‌গার বান্দার সকল গোনাহ্‌ তু-ই মাফ করনেওয়ালা। সকলের হয়ে খোদার কাছে মাফ চেয়ে নিলেন খতিব সাহেব। তসবীর ছড়াটা পকেটে পুরে বিদায়ের জন্য মিঞার অনুমতি চাইলেন।
ক্রুর উল্লসিত দৃষ্টি রমজানের। সে দৃষ্টিটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে মিঞা মসজিদের উত্তর কোণের দিকে যে দিক দিয়ে এই মাত্র চলে গেল মেয়েটি।
ব্যাটা বদমাস। হারামখোর। তুমি সাজ সাধু? এক রোখা শুয়রের মতো গোঁৎ গোঁৎ করে তেড়ে আসে লেকু। এখুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে রমজানের উপর।
চোখের পলকেই বেধে যেতো তুমুল কাণ্ড। ঠিক সময়টিতেই সেকান্দর লাফিয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে।
কর কি? কর কি? বুড়ো কারি সাহেবও ধরে ফেললেন লেকুর হাতটা। দেখলেন, দেখলেন হুজুর? আপনার সামনেই? ভাঁটার মতো চোখে ক্রোধ শানিয়ে গর গর করে রমজান তার নালিশ জানায় মুনিবের কাছে। সুচতুর মিঞা। সকল তুণেই অস্ত্র মজুদ রাখতে হয় তাকে। নইলে মিঞাগিরি চলেনা। একটু হেসে বলল ফেলু মিঞা থাক, আর কথা বাড়াও কেন। এদিকে এস, চৌদ্দ নম্বর তৌজির তহসিল খাতাটা বের করে রাখ। কাজ আছে। আমি ততক্ষণে খেয়ে আসি।

ভোঁ দৌড়ে চলে আসে মালু।

জানো রাবু আপা! হুরমতি বুয়াকে ছেঁকা দিয়েছে। ইস্ কী যে তাঁতাল শিকটাকে, লাল আগুনের মত হয়ে গেল, দিল চেপে হুরমতি বুয়ার কপালে। ক্ষোভে, কান্নায়, উত্তেজনায় স্বরটা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে মালুর। ওর বার বছরের জীবনে এ হল নিষ্ঠুরতম ঘটনা।

শুনলে তো বড় আপা! তোমার মামাটা কি রকম হার্মাদি শুরু করেছে। সাতদিনও হলনা বেচারীর বাচ্চা হয়েছে। এরি মধ্যে কী টানা হ্যাঁচড়া। বড় আপা অর্থাৎ আরিফা রাবুর চেয়ে দুবছরের বড়। তাই বড়র গাম্ভীর্যটা ছেলেমী উৎসুক্যে ক্ষুণ্ণ না করে-তাকাল মালুর দিকে। শুধাল, হুরমতি এখন কই রে? উত্তরটা দিতে গিয়ে এবার কেঁদেই ফেলল মালু। জড়িয়ে জড়িয়ে ভেজা গলায় বলে, জানেন বড় আপা! এই, এত বড় ঘা হয়েছে। দেখলে ডর করে। হাতের আঙ্গুলগুলো সাজিয়ে ঘায়ের আয়তনটা দেখাতে চেষ্টা করে মালু। তারপর সার্টের খুঁটে চোখগুলো রগড়ে রগড়ে মোছে, জবাব দেয় বড় আপার প্রশ্নের—হুরমতি বাড়িতে। বলেই উল্টোমুখী হয় মালু। ওকে এখুনি ছুটতে হবে রাশুদের বাড়িতে, খবরটা দিতে হবে রাশুকে। আজ সে সিন্নি খেতেও যায়নি, পঞ্চায়েতের এমন হুলুস্থুল শাস্তিটাও দেখতে যায়নি। কেন, সেও এক ধন্দ মালুর মনে।

একটু দম নিয়ে ছুট্ দেবে মালু। এরি মাঝে কিসে যেন কি হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে দেখবার অবকাশ পেলনা। দুমদাম কিল থাপ্পড়ে পিঠটা তার জর্জরিত হল, কান আর গালের উপর শক্ত শক্ত চড় পড়ল। আর সাথে সাথেই শুনল যে কণ্ঠটিকে সে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী ভয় করে সেই কণ্ঠের নিত্যকার শোনা গালি: হারামজাদা কমিনা, ডাকতে ডাকতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল মাথাটা। লেখা নাই পড়া নাই শুধু ড্যাং ড্যাং।

মালু জানে গালির মাত্রাটা যতই উচ্চগ্রামে পৌছাবে ততই কমতে থাকবে প্রহারের মাত্রা। তাই টানে টানে মাথাটা মার হাতে সঁপে দিয়ে সুবোধ ছেলেটির মত অপেক্ষা করে কখন একটু ঢিল পড়বে মারের।

কানটারই ব্যথা সবচেয়ে বেশী। টন টন করছে কানের সাথে সাথে মাথা-

টাও। এদিক ওদিক একটু ঢিল দিয়ে, একটু শক্ত করে দেখল মালু কিন্তু উপায় নেই। আজ কিছুতেই ফস্‌কাচ্ছে না মায়ের আঙুল। যেন চিমটের মতো কামড়ে রেখেছে মালুর কানটা। কিন্তু সুযোগটা অকস্মাৎই এসে গেল। মার ডান হাতটা একটু ক্লান্ত হয়ে আসছিল, অতর্কিতে সেই হাতটাই খামচে দিল মালু। তখ্‌খুনি ছুট দিল দরজার দিকে। সেখানে বাঁধা পড়ল রাবুর হাতে।

খোদার কহর পড়ুক তোর উপর, জাহান্নামে যাবি তুই। জল্লাদ হবি। বাপের নাম ডুবাবি……কোত্থেকে একখানি কঞ্চি জোগাড় করে তেড়ে আসেন মা। ব্যথা পেয়েছেন তিনি। ডান হাতের নীচে প্রায় এক আঙুল চামড়া খামচে দিয়েছে মালু। কয়েক ফোঁটা রক্তও জমেছে। এই কঞ্চিটা আজ তোর পিঠে আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করব, তোর হাড্ডি মাংস একসার করব। মা প্রায় ধরে ফেলেন মালুর চুলের ঝুটি।

মাফ করে দেন খালা। আমিই ওকে শাসন করছি। দুহাত বাড়িয়ে মারমুখী মালুর মাকে রুখে দাঁড়ায় রাবু।

কথায় বলে, বাপ যদি হয় আলেম ছেলে হয় জালেম। এই ছেলে ঠিকই জালেম হবে, লাই দিয়ে দিয়ে ওকে নষ্ট করছো তোমরা। বিদ্যেবুদ্ধি কিচ্ছু হবেনা, এই ছেলে জালেম হবে, জল্লাদ হবে। কহর দিতে দিতে চলে যান মা।

রাবুর আঁচলের তলায় খুক করে হেসে দেয় মালু। এটা ওর বরাবরের কৌশল। রাবু আপার আঁচলের আশ্রয় নিয়ে হাড্ডি মাংস একসার হওয়া থেকে অনেকদিন রক্ষা পেয়েছে ও। আজও রক্ষা পেল।

আঁচলের ভেতর থেকে ওর কানটি খুঁজে নিয়ে টেনে ধরে রাবু, বলে সত্যি জল্লাদ হবি তুই। মাকে এমন করে খামচায়! কষ্ট পায়না মা? রাবু আপার শাসনটাও মিষ্টি, মার কর্কশ আদরের পাশাপাশি কথাটা সব সময় মনে পড়ে মালুর। আজও মনে পড়ল। কানের সেই টন টন ব্যাথাটা যেন ভুলে গেল ও। একগাল হেসে বাঁ কানটি বাড়িয়ে দেয় রাবুর দিকে, বলে, দেখনা টেনে টেনে কেমন লাল করে দিয়েছে। আমার বুঝি কষ্ট লাগেনা! বলতে বলতে গলাটাও কি এক অভিমানে ভারি হয়ে আসে ওর।

হেসে দেয় রাবু। আরিফাও ওর বলার ঢংয়ে না হেসে পারে না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যায় রাবু। দৌড়ে যায় উঠোনের দিকে। ফিরে আসে এক মুঠো মাটি নিয়ে। মাটিটা মালুর হাতে দিয়ে বলে, এই মাটি ছুঁয়ে বল আর কখনো খামচাবিনা খালাকে, নইলে আমিই পিটিয়ে তোর হাড্ডিমাংস একসার করবো।

না, আর কখনো খামচাবো না, মাটি ছুঁয়ে বলতে গিয়ে এবার কেন যেন কাঁদো কাঁদো হয় মালুর স্বরটা।

চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক এখানে, আমাদের নিয়ে যেতে হবে, বলে শোবার ঘরের দিকে চলে যায় রাবু। কিছুক্ষণ বাদ বেরিয়ে আসে তোয়ালে জড়ানো একটা পুঁটলি নিয়ে।

নে চল এবার, বলল রাবু; সামনে সামনে যাবি, লোক দেখলেই হুঁশিয়ার করে দিবি।

হুঁশিয়ারির ব্যাপারটা শুনেই বুঝে নেয় মালু কোথায় যেতে হবে। বীরপুরুষের মতো বুকটাকে ফুলিয়ে তোলে, হাফ প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে ছটফট করে কখন রাবু পা বাড়াবে।

এ তোর বাড়াবাড়ি, সত্যি বাড়াবাড়ি। মুরুব্বীর মতো গম্ভীর আর কেমন ভারিক্কী মেজাজে বলে আরিফা।

জানালা দিয়ে ও এতক্ষণ দেখছিল রাবুর কাণ্ডটা। টিন খুলে বিস্কুট বের করেছে রাবু। আলমারি থেকে বের করেছে সাবুদানা, তোরং খুলে বের করেছে তুলো আর কি একটা মলম। সব এক জায়গায় করে বেঁধেছে তোয়ালেটায়।

খারাপ মেয়ে ছিনালী করেছে, যোগ্য সাজাই পেয়েছে। তাতে তোর অত দুশ্চিন্তা কেন? জোরে জোরেই বলে আরিফা।

রাবু যেন শুনতেই পায় না ওর কথা। একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে মালুর হাতটা ধরে পা তোলে।

ওর এই গোয়াতুর্মিটাকেই দুচোখে দেখতে পারে না আরিফা, গাছে চড়তে গিয়েও এমনি করে ও। হয়ত সরু ডালে ভর্তি গাছটা, আরিফা না করল উঠিসনে, ব্যস তখুনি ওর রোখ চেপে গেল, উঠতেই হবে ওই গাছের মগডালে।

ডাকবো আম্মাকে? পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে আরিফা। চিত্রার্পিতার মতো দাঁড়িয়ে যায় রাবু। আতংক বিবর্ণ মুখটি এতটুকু হয়ে যায়।

হি হি করে হেসে ওঠে আরিফা, তুই কি একলাই যাবি? আমি বুঝি যেতে পারি না!

আরিফার কথায় আশ্বস্ত হলেও রাগ পড়ে না রাবুর, এমন করে ভয় দেখানোর কোন মানে হয়?

আম্মা, খালা, সবাই পাক ঘরে। সাঁ করে বেরিয়ে যায় ওরা। বাড়ীর

পেছনেই পুকুর। পুকুরের পর সুপুরি বাগিচা। বাগিচা পেরিয়ে গাং। গাংয়ের ওপারে মাঝিবাড়ি। তারপর গ্রামের রাস্তা। এই রাস্তার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয় ওদের। কারা যেন আসছে রাস্তা দিয়ে। মালু রাস্তার কিনারেই দাঁড়িয়ে থাকে। রাবু আর আরিফা ঝট করে সরে যায় মাঝিবাড়ির বেত-ঝোপের আড়ালে।

ছয়মাস আগেও এরকম ছিল না অবস্থাটা। সারা গ্রাম চষে বেড়াত ওরা দুবোন। গাছে চড়ত, ফল পাড়ত, সাঁতার কাটত বাইর বাড়ির বড় পুকুর-টায়। সে সব বন্ধ হয়েছে। আরিফার আম্মা, রাবুর জেঠি আম্মা, তিনি একদিন ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজটায় বসে বসেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা।

শোন আরিফা। শোন রাবেয়া। তোমাদের চুল বাঁধতে হবে টেনে, খোঁপা করে। এলোচুলে শয়তান ভর করে। ঘোমটা রাখতে হবে মাথায়, বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবেনা, এমনকি বাইর বাড়ি বা কাচারী ঘরেও না। কথা বলতে হবে আস্তে আস্তে বাড়ির পুরুষরাও যেন শুনতে না পায়। চেঁচানোটা হল অসভ্যতা, ছোটলোকরাই চেঁচায়। পরপুরুষদের সুমুখে বের হবে না, বাড়ির চাকরদের সুমুখেও না। এক এক করে নির্দেশগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন তোমরা এখন বড় হয়েছ, 'বালেগা' হয়েছ।

বিস্ফারিত চোখে ওরা শুনে গিয়েছিল, ভুলে যেতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি মাসে ভাল করেই বুঝে নিয়েছে ওসব ভুলে গেলে চলে না। আমল করতে হয়। অবাধ্যতার জন্য কম মার খায়নি ওরা। মার খেয়ে খেয়ে ভয় জন্মেছে ওদের, তাই সবদিক সামলে সুমলেই নিয়ম ভাঙ্গে ওরা। কিন্তু একটা ব্যাপার ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কখন বড় হয়ে গেল ওরা। আর হলই যদি বা তফাৎটা কোথায়? এই তফাৎটা বুঝতে পারছে না বলেই গত ছমাস ধরে গালটা তিরস্কারটা মালুর মতোই ওদের নিত্য পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

না, অপরিচিত কেউ না। সতুর বাপ, পেছনে ছেলের কাঁধে সুপুরীর ভার চাপিয়ে চলেছে হাটে।

ধ্যৎ, ও তো সতুর বাপ। আমি ভাবলাম কেনা কে। বেতের কাঁটায় আটকে যাওয়া শাড়ির প্রান্তটা সন্তর্পণে আলগা করে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আসে রাবু। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাপ বেটার চলার দিকে। ছোপ ছোপ সবুজ আর হলুদ রং কাঁচা পাকা সুপুরীগুলো ভারি সুন্দর, ভারের দুপাশে

ঝোলান থোকগুলো দ্রুত পায়ের উঠতি পড়তি বেগে দুলে দুলে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে আর ভারটি দুপাশে বেঁকে আসছে ধনুকের মত। তন্ময় হয়ে দেখে রাবু, এ সব দৃশ্য দেখা নাকি নিষিদ্ধ ওদের।

থোকে থোকে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে গোটা দুই সুপুরী ঝরে পড়ে রাস্তায়। দুকদম এগিয়ে মালু চট করে তুলে নেয় প্যাণ্টের পকেটে। ইসারা দেয়, এসে পড়, রাস্তা সাফ।

তুই বুঝেছিস ঘোড়ার ডিম, ঝোঁপের আড়াল থেকেই বলে আরিফা।

কি বলছিস! সুপুরি থোকের উপর থেকে চোখ তুলে আরিফার দিকে তাকায় রাবু।

চেনা অচেনা কারো সুমুখেই যেতে পারবিনে। সেই হোল গিয়ে পর্দা।

ধ্যৎ তা হবে কেন? সতুর বাপ, সেই ছোট্টটি থেকে দেখছে আমাদের। ওর সামনে আবার পর্দা কি রে?

তাই তো বলছি তুই বুঝিসনা কিছুই। আরে বেকুফ অচেনা লোক হঠাৎ করে দেখে ফেললে বরং ক্ষতি কম, চেনা লোকে দেখলেই তো মুশকিল। ওরা বদনাম করে। এখানে সেখানে রটিয়ে বেড়ায়।

রাবু বুঝতে পারেনা ওর কথা। বুঝি ভালো করে বুঝবার জন্যে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে, তা হলে তুই বলতে চাস, ওই সতুর বাপ বুড়োর সামনে আমাদের বের হওয়া চলবেনা?

আলবৎ না। সেই যে গেল বছর আমরা কলকাতায় গেলাম, কি বলেছে মেজো ভাই, মনে নেই?

কি বলেছে?

আহ্, তুই কিচ্ছু মনে রাখতে পারিসনে। আম্মাকে নিয়ে আমরা সিনেমা গেলাম না? ঘোর আপত্তি ছিলনা আম্মার? মেজো ভাই যখন বুঝিয়ে বলল, সিনেমায় সব বিদেশী বেগনা লোক, ওরা দেখলে পর্দা ভাঙ্গেনা। চেনা লোকের কাছেই তো পর্দার দাম। তারপর সে না রাজী হলেন আম্মা সিনেমা দেখতে?

মেজো ভাই সবসময়ই উল্টোপাল্টা চালায়, সে আমার জানা আছে। গম্ভীর হয়ে বলল রাবু।

বুঝি আরো কিছু বলতে যায় আরিফা। কিন্তু থেমে যেতে হয়। ওদিকে অধৈর্য হয়ে মুখ খিঁচিয়ে চলেছে মালু—সাধে কি গুরুজনরা বলেন মেয়েদের নিয়ে বেরিয়োনা রাস্তায়, ওরা পথের মাঝেই কোঁদল বাধায়। কবে ঠাট্টা করে

কথাটা বলেছিল জাহেদ, ওদের সবার মেজো ভাই, মালু মনে রেখে দিয়েছে। আজ সুযোগ বুঝে ঝেড়ে দিল কথাটা।
ওর মুরুব্বিপনা দেখে মুখ টিপে হাসে রাবু, বলে, মেজোভাইকে তো আচ্ছা পীর ঠাউরেছিস, তোর আর ভাবনা কি ?
কয়েক লাফে রাস্তাটা একরকম টপকে চলে আসে ওরা। ভুইঞা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কারি বাড়ির পাটি পাতার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এর পর একটা লম্বা ধানক্ষেত। ক্ষেতের ওপারে হুরমতির বাড়ি।
এতদূর এসে শেষে ওই ক্ষেতটাই বুঝি ওদের আটকে রাখল। ক্ষেতের একদিকে সদর রাস্তা। অন্যদিকে মিঞাদের নারিকেল-সুপারির বাগিচা। দুদিকেই লোক চলাচল।
হাফ প্যান্টের দুপকেটে দুহাত গুঁজে ক্ষেতের আলটা ধরে ছোট ছোট পায়ে এগোয় মালু। কিছুদূর গিয়ে পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে তালুটা প্রসারিত করে মালু, অর্থাৎ, এগিওনা, রাস্তা মুক্ত নয়।
কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! মশার কামড় খেয়ে চটে যায় আরিফা: মশা আর আস্ত রাখবে না আজ, তার উপর বাড়ি ফিরে আম্মার কিল। সবই তোর জন্য। রাবুও রেগে ছিল। এই মাত্র একটা লাল কালো পিঁপড়ে লেজ মুখ খিঁচিয়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছে ওর কবজির গোড়ায়, সেও জবাব দেয় তিরিক্ষি মেজাজে; আমি খুব পায়ে ধরে সেধে-ছিলাম কিনা ? এলি কেন ?
সংকেত আসে না মালুর। মাঝে মাঝে গোড়ালিটা উঁচিয়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা হতে চেষ্টা করছে ও। যাতে দূর বাঁকটাও দেখতে পায় সহজে। কাজটায় রীতিমত হাত পাকিয়ে ফেলেছে মালু। রাবু আর আরিফা যেদিন থেকে পর্দা নিয়েছে সেদিন থেকেই মালু ওদের আইন অমান্যের বিশ্বস্ত সহচর। এই তো সেদিন লস্কর বাড়ির বিয়েটা দেখিয়ে আনল রাবুকে। বড় সখ ছিল রাবুর কনে সাজান দেখবে। তা দেখেছে বই কি! আর মান্দার বাড়ির জাম খাওয়া ? সে তো একেবারে দিনদুপুরের ব্যাপার। মান্দার বাড়ির 'ভুতি' জামের তুলনা হয়না, যেমন মিষ্টি রস তেমনি পুরু মাংস, ভেতরে দানা এক রকম নাই বললেই চলে। রাবু আপা বলল, ওই জাম খেতে হবে এবং গাছে বসেই। মালু তো খুসিতে ডিগবাজি খায়।

পাঁচবেলা নামাজের মাঝে যোহরটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। তার উপর যোহর

সেরে আম্মা ওজিফা পড়েন, সেও বেশ সময় নিয়ে। ওই সুযোগেই কেটে পড়েছিল ওরা। নামই মান্দার বাড়ি, কবেকার 'ছাড়াবাড়ি' কে জানে! সৈয়দদেরই সম্পত্তি, এখন গাছগাছালির জঙ্গলে ভর্তি। তাও সব যে মান্দার তা নয়, আম জাম কাঠাল, সব গাছই রয়েছে কমবেশি। সে কি ফুর্তি রাবুর! ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে সবচেয়ে সেরা জামগুলো পেড়েছেও। ছুঁতে গেলেই রস বেরিয়ে পড়ে এমনি টসটসে জাম, এক আঁচল ভর্তি করে বসেছিল চওড়া দেখে একটি ডালে, পা দিয়েছিল নীচের দিকে ঝুলিয়ে। আর সেই অবস্থাতেই টপাটপ এক আঁচল জাম শেষ করেছিল রাবু। আর মাঝে মাঝে দুএক মুঠো ফেলে দিচ্ছিল নীচের দিকে। সার্টের খুঁট পেতে ধরে নিচ্ছিল মালু। ওর তো পাহারা দেবার কঠিন দায়িত্ব, গাছে চড়লে চলবে কেন? তবু ওতেই আনন্দ ধরছিলনা ওর। রাবু আপাকে খুশি করে এত আনন্দ পায় ও! কথাটা যেন আজই প্রথম মনে করল ও। আর মনে করে ওর বুকটা যেন হঠাৎ লাফিয়ে অনেক উঁচু আর চওড়া হয়ে যায়।

কিন্তু বড় আপার খেয়াল খাসলতটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। এমনিতেই একটু ভীরু বড় আপা। তার উপর আজকাল ভারিক্কি হচ্ছে, মেজাজটা হচ্ছে পাকা গিন্নীর মত। আর সবতাতেই পিছুটান। অথচ ইচ্ছারও কমতি নেই। আগ্রহ আছে গাছে চড়ে জাম খাবার, কিন্তু মনের ভেতর রয়েছে ভয়। সেদিন মান্দার বাড়িতক পৌঁছেও শেষ সময় আচ্ছা এক ব্যাগড়া বাধিয়ে দিল।

যোহরের সময় গাছে চড়তে নেই। শনি ধরবে। বলেছিল আরিফা এবং রাবুকে বাধা দেবার জন্য রীতি মতো টানা হ্যাঁচড়া শুরু করেছিল।

মিথ্যে কথা। কতদিন চড়লাম। ওর নিষেধটাকে একটুও গ্রাহ্য না করে রাবু শাড়ির আচলটা আঁট করে নিয়েছিল কোমরের চারপাশে।

এই শোন।

তাড়াতাড়ি বল। আজকাল কথা বলতে বড় বেশি সময় নিস তুই। একটুও তর সইছিলনা রাবুর।

আমি বলি, মালুকে চড়িয়ে দে না গাছে। ও পেড়ে পেড়ে নীচে ফেলুক। আমরা আঁচল বিছিয়ে ধরি।

মালুকে যদি শনিতে ধরে? ওর জানটার বুঝি দাম নেই? দিন দিন, কী যে হচ্ছিস তুই, বড় আপা! জাম গাছের মোটা কাণ্ডটা দু হাতে জড়িয়ে ধরে তর তর করে উঠে গেছিল রাবু।

ওজিফা তেলাওয়াত শেষ করে আম্মা এসে দেখেন অঘোর ঘুমচ্ছে রাবু আর আরিফা।

এই আরিফা, এই রাবেয়া। কী যে অলক্ষী হয়েছিস তোরা। দেখ তো দালানের ছায়াটা উঠোনের শেষ মাথায়, বেলা আসর ধরে ধরে। এখনো ঘুমুচ্ছিস তোরা? ওঠ, ওঠ। তাড়া দিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেছিলেন আম্মা। আর দাওয়া থেকে দেখছিল মালু, মুখে আঁচল পুরে হাসি চাপতে গিয়ে কী বিষম খাচ্ছে রাবু।

এমনি করে নিয়ম ভাঙ্গে ওরা। ধূলো দেয় আম্মার চোখে। মালু ওদের ডান হাত বাঁ হাত, পথের দিশারী। আর যখন ধরা পড়ে যায়? উহ্, সে কথা মনে করতেও ছাঁৎ করে ওঠে মালুর বুকটা। মনে হয় এখনো কঞ্চির বাড়িগুলো জেগে আছে ওর পিঠে।

সেদিন আম্মা গিয়েছিলেন তাঁর বাপের বাড়ি, মিঞা বাড়ি। রাবুর তো মহাফুর্তি। গোটা একটা দিন কোন পর্দা নেই, শাসন নেই! কি মজা! আম্মার ছায়াটা মিলিয়ে যেতেই তিনজনে মিলে টুক করে সটকে পড়ল। মাঝি বাড়ির লাগ সৈয়দদের একটা পুকুর, সে পুকুরটা সেঁচা হয়েছে কিছুদিন আগে। মাছটাছ মারা, সে পর্ব ও শেষ। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই ওরা খবর পাচ্ছে পাঁকের তলায় লুকিয়ে থাকে যে সব মাছ সিং মাগুর বাইন কই, তারা সব পাঁক খেয়ে খেয়ে এখন উপরে উঠে আসছে। পাঁকের গায়ে গায়ে শুধু মাছ আর মাছ। এমনিতেই পুকুর সেঁচার সময় যেতে পারেনি ওরা, না আরিফা, না রাবু। অথচ সেই থেকে ছনবন করছে ওদের মনটা।

পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে, লোদ কাদায় সারা গা একাকার করে আশ মিটিয়ে মাছ ধরল ওরা। এ ওর গায়ে কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল, মাছ ভেবে সাপের গলা টিপে ধরে চমকে উঠল, সিং মাছের কাঁটা ফুটিয়ে আঙ্গুল বিষ করল। যেন কত জন্মের অন্ধ অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ওরা দুজন। মুক্ত আলো বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছে ওরা, সেই পাঁক কাদার রাজ্যে বসিয়ে দিয়েছে আনন্দের হাট। আর সেই আনন্দ মেলার কর্ণধার মালু।

নাঃ রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হওয়ার কোন আলামত দেখছেনা মালু। খেয়ালই ছিলনা যে আজ হাটবার। খেয়াল থাকলে এমন সময় কখখনো বের হতনা ও।

হঠাৎ ওর নজর পড়ে মিঞাদের নারকেল-সুপুরির বাগিচাটার দিকে। ক্ষেত থেকে একটা ছাগল খাসিকে কে যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে বাগিচার দিকে। লোকটা যেন চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার ফুরসুতও নেই, প্রয়োজনও নেই মালুর। আসল বিপদের জায়গা হল রাস্তাটা। সেটা যদি একটু ফাঁকা পায় তা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে রাবুদের ইশারা দিতে পারে মালু।

যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে এবার চল্, বিরক্ত স্বরে বলে আরিফা।

পিঁপড়ে আর মশার কামড় খেয়ে রাবুরও মেজাজটা কম খাট্টা হয়নি। তার উপর কয়েকটি শুকনো পাটি পাতার ঘঁসা লেগে হাতের চামড়াটা জ্বালা করছে। কিন্তু রেগেই-বা লাভ কি? কার উপরই বা রাগবে? এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার ও কোন অর্থ হয়না। নিরুত্তর থাকে রাবু। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—বড আপা, বড় আপা তোর মাথার উপর সাপ। ভয়ে আতংকে কোনদিকে ছুটবে দিশে পায়না আরিফা। কয়েকটা পাটিপাতার ডালসুদ্ধ ভেংগে নিয়ে হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে যায় ও।

তুই তো আচ্ছা ভীতু হয়েছিস? হি হি করে হাসে রাবু। শাড়ির প্যাঁচটা একটু আল্গা করে বুকে থুতু ছিঁটোতে ছিঁটোতে উঠে দাঁড়ায় আরিফা। কাঁপছে গাটা। রেগে টং হয়, এমন করে ভয় দেখাস তুই?

বেশ করেছি। ফিরি ফিরি করে দিক্ করছিলি কেন এতক্ষণ?

দুটো মেয়ে মানুষ এক সাথে হয়েছে কি চুলোচুলি করবেই, সেয়ানা ঢংয়ে বলে মালু আর মুখ খিঁচোয়। আহ্ রাবু আপা জলদি করনা, সেই কখন থেকে হাত ইশারায় ডাকছি তোমাদের! এবার চিল্লিয়ে ওঠে মালু।

মাঝারি গোছের একটা দৌড় দিয়েই ওরা পৌঁছে গেল হুরমতির বাড়ি। গেরস্ত বাড়ির মতো নয়। বেল গাছের তলায় ছোট্ট উঠোন, একটি মাত্র ঘর। কিন্তু টিনের চালা। নবজাতককে পাস দিয়ে শুয়ে রয়েছে ও।

গালের উপর হাতটি রেখে চমকে উঠল রাবু। হুরমতির গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরেও রাবু-আরিফাকে চিনল হুরমতি, উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না।

হুরমতির কপালটার দিকে তাকাতে বড় কষ্ট হয় রাবুর। এক দলা ঝলসানো মাংস ফুলে নাকের দিকে ঝুলে পড়েছে। বীভৎসর কদাকার। হা আল্লা! এমন জুলুম মানুষ মানুষের উপর করে? গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়? কাঁচা হলুদের মত রং এমন সুন্দর কপাল হুরমতির। কোন্ নিবাদের

হাত উঠল সে কপালে? চিরজন্মের মতো কালো কলঙ্ক এঁকে দিল? খসে পড়ুক সে হাত। বাজ পড়ুক সে হার্মাদের মাথায়। মনে মনে যেন প্রার্থনা করল রাবু।

এক পয়সার ঘায়ের উপর পুরু করে মলম মাখল রাবু। তারপর তুলো বসিয়ে বেঁধে দিল কপালটা।

ঘরে উল্টো কোণায় হাঁড়ি পাতিল নিয়ে নড়াচড়া করছে লেকুর বৌ আম্বরি। এগিয়ে এসে বলল, লেকু ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ও থাকবে হুরমতির সাথে। ভালই হল। আশ্বস্ত হয় রাবু। আম্বরিকে পাঠিয়ে দেয় সাগু জ্বাল দিতে। তারপর আরিফা শুদ্ধ মাটির ঘড়ায় করে পানি তুলে আনে ডোবা থেকে। প্রায় তিন ঘড়া পানি নিঃশেষ করে হুরমতির মাথায়।

নগ্ন লালসা আর কদর্য কামনার নিষ্ঠুর শিকার হুরমতি। ঈর্ষা লোভ হিংসার বিষচক্রে, রূপবতী যৌবনের সর্বনাশা আগুনে বিষিয়ে দগ্ধে পুড়ে দিন কাটে হুরমতির। ছোট বেলায় মা হারিয়েছে। বাপ তার কোন কালেই ছিল না। মমতার ছোঁয়া কদাচিত পেয়েছে জীবনে। তাই স্নেহের এই পরশটি ওকে অভিভূত করে। হুরমতির তপ্ত কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামে।

কিছুক্ষণ রাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল হুরমতি। বলল, রাবু, বুজান, সে হয় না।

কেন হয় না। জন্ম হোল তোর আমাদের বাড়ি। বড় হলি আমাদের বাড়ি। আমাকে আপাকে কোলে করে এত বড় করলি। আর এখন আমাদের বাড়ি তোর বাড়ি না? কেন হয় না বল্!

কি বলবে হুরমতি! শুধু পানি ঝরে ওর চোখ দিয়ে। বড় হলে বুঝবে বুজান। এখন বুঝবে না। বলেই মুখটা ঘুরিয়ে নেয় হুরমতি।

সত্যি, রাবু বোঝা না হুরমতির এমন করে দূরে সরে যাওয়া আর পর হয়ে যাওয়াধ ব্যাপারটা।

হুরমতির মায়ের জন্ম মিঞা বাড়িতে। আরিফার আম্মা যখন মিঞা বাড়ি ছেড়ে সৈয়দ বাড়িতে এল বাড়ির বড় বৌ হয়ে তখন বাঁদি হিসেবে সঙ্গে এসেছিল হুরমতির মা। তারও অনেক বছর পর হুরমতির জন্ম হয়েছিল এই সৈয়দ বাড়িতে। হুরমতির তখন কতই বা বয়স, পাঁচ কি ছয়, ওর মা মিঞাবাড়ি গিয়েছিল বেড়াতে সৈয়দ গিন্নীর সাথে। সেই সময় একদিনে বার তিন কয় করেই শেষ নিশ্বাস ছেড়েছিল। মালুর মা, খালার কাছেই এ

সব কথা শুনেছে রাবু এবং আরিফা। আর ছোট বেলা থেকে চিনে এসেছে হুরমতির কোল। সেই হুরমতি যে কেমন করে আলাদা বাড়িতে একলা থাকে আর পর হয়ে যায়, এখনো বুঝে উঠতে পারে না ওরা।
হুরমতি। হুরমতি। খোদার দোহাই তোর। তুই চল আমাদের বাড়ি। ছোট্ট বুকের গভীর আকুলতায় ওর হাত দুটি ধরে বলল রাবু। এমন অবস্থায় হুরমতিকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন চায়না ওর।
আচ্ছা যাব। জ্বরটা একটু কমুক। ওকে নিরাশ না করার জন্যই হয়ত বলল হুরমতি। আরো জোরে ঠেলে আসে হুরমতির চোখের ধারা। দুঃখের নয় এ কান্না। ঝলসানো কপালটার জ্বালাপোড়ায় ছটফটানি কান্নাও নয়। এ যেন ওর অন্তহীন কোন আনন্দের নিঃস্রবণ।

আক্রোশে ফুসতে ফুসতে বাড়ি ফিরছিল রমজান। ওই ছোট লোক লেকু, সেদিন ও কামলা খেটে গেছে ওর বাড়িতে। সেই লেকুর এত দুঃসাহস? বলে কিনা, এক বাজারে দুই ভাও? আবার তেড়ে আসে? আসতই আর এক পা, তা হলে বাছাধনকে মক্কা দেখিয়ে ছেড়ে দিত রমজান। আর ওই কুলাঙ্গার সেকান্দর? সে আবার ওই চাষা ছোট লোকটার কথায় সায় দিয়ে বলে—এক হাকিমের দুই বিচার কেন?
রমজানের রাগটা শেষ পর্যন্ত লেকুকে ছেড়ে সেকান্দরের উপরই গিয়ে পড়ল। সেকান্দর-রমজান চাচাত জ্যাঠাত ভাই। ওদের বাবারা ছিলেন সহদোর ভ্রাতা। একই রক্তের পয়দায়েশ ওরা। একই বাড়িতে থাকে। বাবা জ্যাঠা দুটো সমান হিস্সায় বাড়িটাকে ভাগ করে সেই যে আমের চারা দিয়ে সীমানা পুঁতেছিলেন সেই আমের গাছ এখনো মানুষের মাথা ছাড়ায় নি। অথচ এর মাঝেই সেকান্দর শত্রুতা শুরু করল রমজানের?
কথায় বলে, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। নইলে সেকান্দর যায় ওই ছোট লোকের কথায় ধুয়ো তুলতে? ছোট অতএব ছোট ভাইয়ের মতই ওকে স্নেহ দিয়েছে, সাহায্য দিয়েছে রমজান। কত, না হয় চার বছর আগের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করে সেকান্দর গেল ফেনী কলেজে আই, এ, পড়তে। রমজানই তো এক থোকে ভর্তির টাকাগুলো তুলে দিয়েছিল ওর হাতে! সে কথাটাও কি বেমালুম ভুলে বসে আছে সেকান্দার? অকৃতজ্ঞ আর বলে কাকে।
না হয় একটু চরিত্র দোষ আছে ওর। সাধু পুরুষ বলে রমজান দাবী৹

করেনা কোনদিন। আর ওই হুরমতি। সব ঘাটেই যে পানি খায়, যেখানে নগদ কড়ি সেখানেই যার ধর্না সে মেয়ের সাথে একটু না হয় আশনাই করল রমজান। এমন কি অপরাধের হল সেটা? 'যারবাটা' যে রমজানেরই সেটা নিশ্চয় হলফ করে বলতে পারবে না এ গাঁয়ের কোন মানুষ। আসল কথা যার হাতেই আছে দুটো নগদ পয়সা সে-ই হুরমতির দরজায় টোকা মেরেছে। দোষ শুধু রমজানের? আর সত্যি যদি সেকান্দরের বুকের পাঁটা থাকত তবে সে মিঞার নামটা করে দেখলেই পারত একবার? মজাটা তখুনি টের পেত বাছাধন।

দুনিয়াতে কোন শালার উপকার করব না, মনে মনে কসম খায় রমজান।

কিন্তু লেকু? লেকু ব্যাটাকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিতে হবে। নইলে ইজ্জত থাকবে না রমজানের।

দেবে নাকি ওর ঘরটায় আগুন ধরিয়ে? শালার আবার ভারি পেয়ারের বৌ আম্বরি। এই মুহূর্ত, শুধু একটা দিয়াশলাইর কাঠি, রমজান ছারখার করে দিতে পারে শালার পেয়ারের বেহেশত!

না। ওতে তেমন কিছু ক্ষতি করা যাবে না। ছন বেচে বেটা নগদ পয়সা পেয়েছে এ বছর। চটপট বানিয়ে নেবে নতুন ঘর। তার চেয়ে·· এমন একটা প্রতিশোধ নিতে হবে যাতে শালার আগামী তের গুষ্টি মনে রাখবে—রমজান বাপের বেটা বটে। হ্যাঁ···তাই·· হাটবারে। অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি আঁধারে। যখন ফিরবে হাট থেকে সেই সময়, পিতলের পাত বসানো সুন্দরী কাঠের সেই লাঠিটা, তারই দুঘা বসিয়ে দেবে মাথায়। তারপর গুনে গুনে কয়েকটা বাড়ি হাঁটুতে, কনুইতে। বাছাধনকে আর হাঁটতে হবে না, কাজ করতে হবে না কোনদিন। সারা জন্মের মতো নুলো হয়ে বাড়িতে বসে বসে থুঁতনি চিবোবে। এই হল গিয়ে বাপের বেটা রমজান। সেই বার্মা মুল্লুকে, ওর কোমরে লুকানো ছুরিটা যে কী ত্রাস ছিল, ভুলে গেছে লেকু? আর হ্যাঁ, এখানেও নিজের হাতেই সারতে হবে কামটা, ভাড়াটে লোকদের বিশ্বাস নেই। থানা পুলিশের চাপে ফাঁস করে দিতে কতক্ষণ।

থানা পুলিশের কথাটা মনে আসতে একলা পথে খামোখাই চমকে উঠল রমজান। কেন যেন ভয় হল ওর, উচ্চস্বরেই বুঝি চিন্তা করছিল ও, আর মনের দুরভিসন্ধিটা কারা যেন জেনে ফেলল। সামনে· পিছে ডানে বাঁয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনে রমজান। না, মাঠে বা রাস্তায় একটি ছায়াও নেই।

অপরাহ্নের গ্রামটা রাতের মতই নিস্তব্ধ নির্জন। হঠাৎ পাওয়া ভয়টা যেন পিছু পিছু অনুসরণ করে চলেছে রমজানকে। থানা পুলিশকে ওর বড ভয়। এমনিতেই দুটো খুনের মামলা ঝুলে রয়েছে মাথার উপর। হোকনা বিদেশে, তবু খুন তো, মনের উপর সম্ভাব্য বিচারের যে ভীতিটা চেপে রয়েছে অদৃশ্য ভূতের মতো সে ভয় থেকে তো এখনো মুক্ত হতে পারেনি রমজান।

তার চেয়ে · ছোট লোকের বউটাকে ভাগিয়ে আনলে কেমন হয়? শালার তেজ থাকবে কোথায় তখন। বউটা যদি বাধা দেয়, চেঁচামেচি করে? মুখে গামছা পুরে পাঁজা কোলে করে সোজা নিয়ে আসবে মিঞাদের সুপুরি বাগিচায়। বাগিচা তো নয়, জঙ্গল, দিন দুপুরেও ত্রিসীমানায় মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। ব্যবস্থাটাও সেখানে মন্দ না। পাকা ভিটের উপর ছোট্ট একটা ছনের ঘর। চৌকি বিছানা সবই চমৎকার। মিঞার যখন সখ চাপে এক আধ রাত্রি কাটায় সে বাগিচায়। সেখানেই রাতটা আর দিনটা রাখবে আম্বরিকে। মিঞা যদি খোশদিলে থাকেন তাকে দিয়েই না হয় বিসমিল্লা পড়াবে। তারপর সোয়াদ মিটিয়ে লেকুর সামনেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবে, বলবে—নে শালা, বুঝে নে তোর বউ, জনমটা তার সার্থক করে দিলাম।

ভাবতে ভাবতে সেই সম্ভাব্য রাত আর দিনের আতপ্ত উত্তেজনাটা যেন এখুনি অনুভব করে রমজান, গাটা গরম হয়ে ওঠে। আর বিশদ বিবরণগুলোও আকার নিয়ে ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে।

কিন্তু···বড় বদসুরত আম্বরিটা। হাঁড় গিলগিলে চেহারা। একরত্তি চেকনাই নেই গায়ে। বুড়ির মত বঁটে এসেছে গালের চাম। এককালে সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী ছিল মেয়েটি, বার্মা যাওয়ার আগে দেখে গেছিল রমজান। কিন্তু মেয়েটার সব রসকষ চুষে নিয়েছে শালা লেকু।

আম্বরির রোগা পটকা সুরতটা মনে করতেই আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে রমজানের শরীরের গরমটা। কল্পিত পরিকল্পনার জালটিও ছিঁড়ে যায়। না, ওই হাড্‌ডিসার মাগিটাকে নিয়ে শোয়া আর খরখরে একটা তক্তা বুকে জড়িয়ে শোয়া একই কথা। রমজান কামাতুর। কথাটা এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। তাই বলে বাজারে তাজা তাজা মাছ থাকতে শুটকী মাছের দিকে নজর পড়বে ওর, এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না ওকে।

হঠাৎ কি যেন চোখে পড়ল রমজানের। বিড়ালের চোখের মতো পিট পিট

করে জ্বলে উঠল ওর চোখ জোড়া। লেকুর ছাগল খাসিটা মিঞাদের সেই বাগিচার পেছনে 'ফুটি' ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে। ঘাসের এক একটি কচি পাতা মুখে পুরছে আর কেমন ভীতু ভীতু চোখে এদিক ওদিক দেখছে। প্রতিশোধ নেবার এমন একটা স্বযোগ অযাচিতে এসে যাবে ভাবতে পারেনি রমজান। হোক না অকিঞ্চিৎকর, তবু এতেই আপাততঃ রমজানের গায়ের জ্বালাটা মিটবে।

পেছন থেকে গিয়ে খাসির গলায় গামছাটা আলগোছে পেঁচিয়ে দিল। তার পর কষে চেপে ধরল। একটু ভ্যাঁ করে ডাকবারও ফুরসুত পেল না পশুটা। গামছাবদ্ধ পশুটাকে বাগিচায় তুলে আনল রমজান।

ছুরি দা সব মজুদ থাকে ফেলু মিঞার এই স্বল্প ব্যবহৃত ঘরটায়। জবাই করতে, চামড়া ছিলতে, গোশত কাটতে কতটুকুই বা সময় লাগল ওর। এরি মাঝে একবার চোখ তুলে দেখল সৈয়দ বাড়ির মেয়ে দুটো দৌড়ে চলেছে ক্ষেতের আল ধরে। বিস্মিত হল রমজান। আরো বিস্মিত হল যখন দেখল ওরা গিয়ে উঠল ছুরমতির ঘরে।

আর্ধেকটা গোশত বেচবার জন্য হাটে পাঠিয়ে দিল রমজান। বাকী আর্ধেকটা নিয়ে এল বাড়ি। প্রতিশোধের স্পৃহাটা অল্পতেই তুষ্ট হল। বিপদ এসেছিল লেকুর জানের উপর। সামান্য মালের উপর দিয়েই সে বিপদটা কেটে গেল। খাসিটা ওর এত বড় উপকারে এসেছে বলে লেকুর উচিত আল্লার দরবারে শোকরগুজার করা। রাত্রে হাড্ডি চিবুতে চিবুতে এই কথাগুলোই ভাবে রমজান।

অনেক কিছু বলবে বলেই তো শেষের সারি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল লেকু। অথচ দাঁড়িয়েই কি যে হয়ে গেল। পা কাঁপল, জিবটাও যেন জড়িয়ে এল। কয়েকটা লবজো বলেই বসে পড়তে হল। নিজের উপরই সে রেগে গেছিল, রেগে গুম হয়ে বসেছিল। প্রতিবাদের কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। ষণ্ডা কালুটা যখন চিমটেটা হাতে নিয়ে মূর্তিমান আজ-রাইলের মত এসেছিল তখন ওর শরীরের শিরাগুলো যেন অকস্মাৎ পাকানো দড়ির মতো টান ধরেছিল, চামড়া ফেটে গায়ের যত রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে

চেয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন করে যে ওর আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেছিল, ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হারামখোর রমজানের উপর এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। কিন্তু রাগের রেশটা এখনো ওর রগে রগে লঙ্কার গুঁড়োর মতো জ্বালা ছড়াচ্ছে।

লেকু জানে হুরমতির ব্যাপারটা কি। রমজান ওকে সাঙ্গা করতে চেয়েছিল। হুরমতি বলেছিল—আবার যদি ক'ও তবে জিবটা কেটে রেখে দেব। তাই এই নির্যাতন। অবশ্য আরো হেতু যে নেই তা অস্বীকার করে না লেকু। তবে সে সব মিঞা আর 'সায়েব সুয়ো'দের ব্যাপার, মনে মনেও ঘাঁটতে ভয় পায় লেকু। ইদানীং 'সাবডিবিশন' শহরটায় ঘন ঘন পাড়ি দিচ্ছিল হুরমতি আর তাতে যে ফেলু মিঞার চক্ষু টাটিয়েছে এটা কোন কেয়াসের ব্যাপার নয়। এতে রমজানেরও হল সুবিধে, ফেলু মিঞার সমর্থনে এমন করে দাদ তুলতে পারল।

হুরমতিটা যে কি! পঁই পঁই করে সাবধানী দিয়েছি লেকু; খবরদার ওই বদমাশটার হাতে ধরা দিবি না। বার্মা মুল্লুকে খুন করে পালিয়ে এসেছে, বেটা খুনী। হুরমতি কান দিলনা ওর নিষেধে। এখন? অমন চাঁদ মুখখানা দিলতো জন্মের মত বদখত করে? আর এত যে যন্ত্রণা? উঃ। দগদগে, সেই ঘাটা লেকু কিছুতেই তাড়াতে পারে না মনের চোখ থেকে।

আর নয়। লেকু আর কোন সম্পর্ক রাখবেনা হুরমতির সাথে। কোনদিন না। মরুক গে হুরমতি। অমন পাপিষ্ঠার মরাই ভাল। নিজের বউ আছে মেয়ে আছে লেকুর। ওদের দিকে বেশি করে মন দেবে ও। আসলে হুরমতির উপর ওর রাগটা চৈত্রমাসের বৃষ্টি ফোঁটার মতো মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই মিলিয়ে যায়। যখন বাচ্চা হল হুরমতির কেউ এল না ওই কসবির 'যারবা' সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে। লেকুই পাঠিয়েছিল আম্বরিকে। সেই থেকে আম্বরি রাতের বেলাটা হুরমতির ঘরেই শোয়, ওর রান্নাটাও সেরে দেয় নিজেদের হাড়িতে।

উঠোনে পা রেখে লেকুর চটা মেজাজটা আরো চটে গেল—মাঝ-উঠোনে ঝাঁটাটা হাঁ করে রয়েছে ওর আসার পথের দিকে।

আম্বরি আম্বরি, চেঁচায় লেকু। কোন সাড়া না পেয়ে আরো চেঁচায়। ঘরের পেছনে এসে আবার ডাকে হুরমতির ঘরটির দিকে মুখ করে! হুরমতি আর লেকুদের ঘরের মাঝখানে ব্যবধান ছোট্ট একটি ডোবা, এ ঘরের কথা ও ঘরে বসে শোনা যায়। অথচ সাড়া নেই আম্বরির। কতদিন বলেছে আম্বরিকে,

ঝাঁটাটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখবি না, আসতে যেতে চোখে পড়লে আমার মেজাজটা বিগড়ে যায়। তবু আম্বরি যেন ইচ্ছে করেই ঝাঁটাটা হয় উঠোনে নয় তো দাওয়ায় ফেলে রাখবে, লেকুর চোখে পড়বেই।

ও আম্বরি। আম্বরি। স্বরটাকে একেবারে সপ্তমে তুলে দিল লেকু। এবারের ডাকটা আম্বরির কানে যায়। জবাব না দিয়েই ত্রস্তে দৌড়ে আসে ও। হাতের নাগালে আসতে না আসতেই শক্ত হাতে ওর চুলের মুঠিটা ধরে নেয় লেকু। হিড় হিড় করে টেনে আনে উঠোনে। উপুড় হয়ে সেই হাঁ-করে থাকা ঝাঁটাটাই কুড়িয়ে নেয়। সপাং সপাং ঝাঁটার বাড়ি চালিয়ে যায় ওর পিঠে উন্মাদের মতো। খসে পড়ে আম্বরির গায়ের কাপড়। স্পষ্ট দেখা যায় কড়া পড়েছে পিঠের চামড়ায়, কত যে মারের দাগ সেখানে।

দিক বিদিক জ্ঞান নেই লেকুর। হিস-সিং হিস-সিং আর্তনাদ তুলছে ঝাঁটার বাড়ি আর নারকেল শলাগুলো দাগ কেটে বসে যাচ্ছে আম্বরির উদলা পিঠে। ওর পিঠের এক ইঞ্চি চামড়াও বোধ হয় আজ আস্ত রাখবে না লেকু; থেঁতলে দেবে সারা পিঠ। যেমন ক্ষেপেছে।

এক সময় ঝাঁটার গোছাটা খুলে গিয়ে শলাগুলো এদিক ওদিক ছিঁটকে পড়ে। তারপর এক লাথিতে আম্বরির পলকা শরীরটাকে প্রায় তিন হাত দূরে ছিঁটকে ফেলে দেয় লেকু। সেখানেই একটা পাতলা কাঠির মতো অনড় পড়ে থাকে আম্বরি। হয়ত অপেক্ষা করে কখন রাগ পড়বে লেকুর।

হারামজাদী মাগি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলবি। কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। মিঞা বাড়ির বিবি আর কি! ঝড় বর্ষা মেহেন্নত করে মরব আমি আর তিনি বিবি পালঙ্কে পায়ের উপর পা তুলে খাবেন। দাসী লাগবে। বান্দী লাগবে……কেনরে হারামজাদী! ঝাঁটাটাও সরিয়ে রাখতে পারিস না? তবে আমার ভাত গিলিস কোন্ আক্কেলে……। বর্ষণটা একটানা চলে না। মাঝে মাঝে থামে লেকু। প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে দৌড়ে যায় আম্বরির দিকে, আবার দুপা পিছিয়ে আসে। রাগলে কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না লেকু।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল একটুও নড়ছে না আম্বরি। মরে গেল না তো? ঝুঁকে পড়ে হাতের পিঠটা আম্বরির নাকের মুখে ধরল লেকু। না, গরম নিঃশ্বাস হাতের পিঠে স্পষ্ট অনুভব করছে ও। উঠে এল দাওয়ায়। গুম হয়ে বসে রইল। এটাই ওর রাগ পড়ার লক্ষণ।

আম্বরি কাঠির মত দেহটাকে যেন বিনা চেষ্টায় তুলে নিল, সুড় সুড় করে

চলে গেল হুরমতির ঘরের দিকে। হুরমতির ছেঁকা দেখে এসে লেকু যে আজ কারবালার তাণ্ডব শুরু করবে সেটা আম্বরি আগেই আঁচ করতে পেরেছিল। ঝাঁটাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

তকদীরটাকেই দোষী করে আম্বরি। তকদীরটাই এমনি, নইলে সেও যাচ্ছিল মিঞা বাড়ির দিকে, জুমার পর যে কাণ্ডটা ঘটবে সেটা দেখতে। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিয়েই মনটা খুঁত খুঁত করে, শুকনো আম পাতায় ভরে গেছে উঠোনটা। পোড়া মন ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটাকে উঠোনো ফেলেই দৌড় দিয়েছিল টেঙুল বাড়ির দিকে। টেঙুলদের পাটি পাতার জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে লেংড়ি মুরগিটার চীৎকার, হয়ত শিয়াল তাড়া করেছে। আম্বরি পৌঁছে দেখে শিয়াল নয়, লেংড়িকে তাড়া করেছে টেঙুল-বউ। লেংড়ি তিন গণ্ডা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তার খুদ খেয়েছে, এই অপরাধ। সঙ্গে সঙ্গে টেঙুল-বউ আদ্য শ্রাদ্ধ করল লেকু এবং লেকুর বউ খানকি মাগিটার।

ত্রাস বিক্ষিপ্ত বাচ্চাগুলোকে এক যায়গায় করে অনেক সান্ত্বনা দিয়েও লেংড়ির চীৎকার থামাতে পারেনি আম্বরি। ভীষণ উত্তেজিত লেংড়ি, চেঁচিয়েই চলেছে। অগত্যা লেংড়ি আর বাচ্চাদের ওদের পরিচিত উঠোনে পৌঁছে দিয়ে আবার দৌড় মেরেছিল আম্বরি টেঙুল বাড়ির দিকে। টেঙুল-বউর জন্মটা আসলে শুয়রের জন্ম আর তার মা বাপ তাকে বিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নাকি খাওয়ায় নি। মুখরা টেঙুল বউর ধারালো জিবের প্রত্যুত্তরে এই জবাবটাই আম্বরিকে নানা ভাবে ফুলিয়ে বাড়িয়ে শোনাতে হয়। স্বরটাকে কখনো উচ্চতানে কখনো মধ্যতানে নানা খাদে নানা টানে এই নিত্যকার কীর্তন গাইতে গিয়ে বেলা যায় বেড়ে। উঠোনে আর ফেরা হয় না ওর। ঘরের পেছন দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হুরমতির ঘরেই পৌঁছুতে হয় ওকে। এর মাঝে ঝাঁটার কথাটা কেমন করে মনে থাকে! পোড়া মন, পোড়া কপাল, যে কপালে লেখা আছে খসমের হাতের মার, পায়ের লাথি, নইলে কি আর মনে থাকত না? কপালের উপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে যেন একটু হাল্কা হয় আম্বরি, গায়ের ব্যথাটাও একটু কম মনে হয়।

দাওয়ায় সেই যে গুম হয়ে বসেছে লেকু। বসেই আছে। আফসোস হয় ওর। ওর জন্যই তো খেটে খেটে বউটি আজ কঙ্কালসার। আম্বরি না থাকলে ও কি পারতো ঘর বাঁধতে, আট গণ্ডা জমি কিনতে? না পারত সে সব ধরে রাখতে। এই শরীর নিয়েও কাজ কি কম করে আম্বরি? ওর জন্য কোনদিন একটা গাছ ফেড়ে দিয়েছে লেকু? দেয়নি। আম্বরি নিজেই

বন বাদড় ঘুরে খড়, শুকনো ডালপাতা হাবিজাবি জোগাড় করে সারা বছর উনুনটা জ্বালিয়ে রাখে। ভাতের সাথে কচুর লতিটা, ঢেঁকি শাকটার ব্যবস্থা করে। মাছও ধরতে জানে আম্বরি। ফুরসুত পেলেই ওই ডোবাটায় নতুবা সৈয়দের মজা দীঘিতে প্যাঁক হাতড়িয়ে মাছ তুলে আনে। গুণের শেষ নেই আম্বরির।

একপাল হাঁস মুরগী পালে আম্বরি। আণ্ডা বেচে। বাচ্চা ফোটায়। একটু বড় হলেই হাঁস-মুরগীর বাচ্চাগুলো বেচে নিয়ে দুটো পয়সা ঘরে তোলে! ছাগল পালে। তালতলির রামদয়ালের হাঁপানির ব্যামো। প্রতি বছর ছাগল বিয়োলেই দুধটা রামদয়ালের জন্য বাঁধা, দামটাও নগদ।

আম্বরিকে বাদ দিলে কী থাকে লেকুর? অমন করে ওকে মারাটা সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। রাগটা কোথায় উবে গেছে লেকুর, ইচ্ছে করে আম্বরিকে ডেকে একটু আদর করতে। আম্বরির সন্ধানেই এদিক ওদিক তাকায় লেকু। তিন-জনের সংসার লেকুর। সে, বৌ আর চার বছরের মেয়ে ভুনি। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে চৌদ্দ গণ্ডা, জমি, আট গণ্ডা নিজের কেনা, ছয় গণ্ডা বাপের বন্ধকী দেওয়া জমি। পরে কর্জ শোধ করে সেই জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল লেকু। আর সেই ভিটিটা। ভিটির চার পাশে কিছু ডাঙ্গা। ডাঙ্গায় কয়েক গণ্ডা সুপুরি গাছ, গোটা চার আম গাছ একটা জাম গাছ। ডাঙ্গার ঢালুতে পাটি পাতা। আম্বরি লক্ষী। ওই টুকুন তো ডাঙ্গা। সেই ডাঙ্গা থেকেও গতরের খাটনী দিয়ে কত কিছু আদায় করে নেয় আম্বরি। পাটি পাতা হাটে পাঠায়। আসন বানায়, পাটি বোনে, বঠ্নী বানায়। তালতলির হাটে এ সব জিনিসের দাম আছে। আম্বরির যত্নে গাছের একটি সুপুরিও নষ্ট হয় না। নিজে পান খেতো আম্বরি। কাউয়ের কোয়ার মত লাল টকটকে আর রসে ভরে রাখত ঠোঁট জোড়া। কিন্তু পান ও ছেড়ে দিয়েছে, সুপুরি বেচার আয়টাও বাড়বে, পান কেনার ফজুল খরচাটাও কমবে। তবু আম্বরির আয় আর খেতের আয়ে কদ্দিন চলে: বড় জোর মাস পাঁচ। বাকী সাত মাসের খোরাকের জন্য নানা ফিকির লেকুর। কোন বছর উত্তরে চলে যায়, বাঁশ আর ছন নিয়ে আসে। ছন আর বাঁশ বিক্রী সেরে আবার যায় সেই উত্তরের পাহাড়ে। নিয়ে আসে কুমড়ো বেগুন এমনি সব তরকারী। বিক্রী করে তালতলি আর বড় হাটে। কোন বছর চলে যায় ধান কাটতে বাখরগঞ্জ অথবা আসামে! সে বছর পাহাড়ে যায়না।

প্রথম প্রথম জোয়ানকী বয়সের দেদার খাটুনী ঢেলে খাই খরচা চালিয়েও

কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল লেকু। অবশ্য স্বীকার করবে লেকু, অন্ততঃ এই ঠাণ্ডা মেজাজের মুহূর্তে, লক্ষীমন্ত আম্বরির হাতে না থাকলে জমতো না সেই টাকা। ওই জমানো টাকা দিয়েই তো আট গণ্ডা জমি কিনেছে লেকু আর সুদে আসলে বাপের ঋণটা শোধ দিয়ে বন্দকী ছয় গণ্ডা জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল রামদয়ালের কাছ থেকে। তারপর ঘরটা পড়ে গেছিল সেই গেল বছরে আগের বছর যে তুফান হল সেই তুফানে। লেকু তো অন্ধকার দেখেছিল চোখে, আম্বরি ওর পায়ের রূপোর খাড়ু আর কোমরের রূপোর শিকলিটা খুলে বলেছিল, বসে বসে ঝিমোলে তো আর চলবেনা। যাও এগুলো রামদয়াল খুড়োর কাছে বন্ধক দিয়ে নিয়ে আস যা পাও। তাই করেছিল লেকু। ঘর উঠেছিল। কিন্তু, আম্বরি এখনো ফিরে পায়নি ওর অলংকারগুলো। তারজন্য এতটুকু অভিযোগ নেই আম্বরির। এত যে মার খায়, রেগেমেগেও কোনদিন এতটুকু একটা খোঁটা দেয়না। আম্বরি লেকুর লক্ষী। আম্বরি ওর খোদার নেয়ামত। দুই বাজুর বন্ধনে ডুবে-যাওয়া মাথাটাকে তুলে আবার এদিক ওদিক তাকায় লেকু। আম্বরির দেখা নেই। আহ্ ওকে এখন একবার কাছে পেলে ওর ঝাঁঝরা পিঠটায় একটু হাত বুলিয়ে দিত লেকু। মেয়েটাও নেই। কোথায় গেল ওরা সব? হুরমতির ঘরে হয়ত।

হুরমতির কথাটা মনে পড়তেই রমজানের মুখটাও ভেসে ওঠে লেকুর চোখের সুমুখে। একদলা বিষ যেন আচমকা গলা দিয়ে নেমে যায় আর ওর সারা শরীরটাকে বিষময় করে তোলে। লেকুর জীবনটাকে অশান্তির আগুনে ছারখার করার জন্যই যেন রমজানের জন্ম। আম্বরিকে ঘরে এনে বছর দুই বাদেই লেকু চলে গেছিল রঙ্গম অর্থাৎ রেঙ্গুন শহরে। বুড়ো বাপ তখনো বেঁচে। নাম করা কামলা ছিল বাপজান। ঘরের বেড়া মাছের চাঁই ডুলা পলো এসব কাজে দুচার গ্রামে জুড়ি ছিল না তার। যতদিন বেঁচে ছিল বাপজান ছেলে-বউ আম্বরিকে এতটুকু কষ্ট করতে দেয়নি। আম্বরিকে সেই বাপের হাওলায় রেখে নিশ্চিন্তে আয় করতে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল লেকু।

রমজান ছিল রেঙ্গুন ডকের কুলি-সর্দার। একটা নিয়মিত বখরা দেবে রমজানকে সেই কড়ারে কুলির কামটা তাড়াতাড়িই পেয়ে গেল লেকু। বছর খানিক সে বন্দোবস্তের এতটুকু এদিক সেদিক করেনি লেকু।

কিন্তু নটীর নগরীর রঙ্গমে যে এত ফাঁদ সে কি জানত লেকু? মোহিনী রঙ্গম

চুম্বকের মতো টেনে নিল ওকে। ফুল-বসনা রঙ্গমীর চটুল কটাক্ষ ওর মগজে ধরাল নেশা, দেহে তুলল আগুনের হিল্লোল। টাকার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই নিয়ে রমজানের সাথে বাধল মনোমালিন্য, মতান্তর। হাতাহাতি।
গতর খাটাই আমি, তুই কেন ভাগ বসাবি? সোজা কথা লেকুর।
সব কুলির সাথেই এমনি একটা ফাও রোজগারের ব্যবস্থা রমজানের। তেড়িমেড়ি যে কেউ করেনা তা নয়। তার দাওয়াইটাও রমজানের হাতে। বথরা নেই কামও নেই, ব্যস, রাস্তা দেখ। তবু বাঁধা ব্যবস্থাটা হুট করে নাকচ করে দেয়না রমজান। নিজেও ধৈর্য ধরে, দামদস্তুর করে। উল্টো পক্ষকেও একটা সুযোগ দেয় নিজের স্বার্থ টা তলিয়ে দেখবার।
তুই হলি গিয়ে আমার দেশী ভাই। খেসি কুটুম্বিতা না থাকুক তোর বাপ আমার বাপজানকে তো ভাই বলেই ডাকত। নে, যা দিয়ে আসছিলি তার অর্ধেক দিবি, টাকায় দুই আনা। রাজী তো? ধমকের পথে না গিয়ে আপোসের লাইন ধরে রমজান।
এক পয়সাও না, কামাই করি আমি, তুই কেন তার হিস্যা চাস? একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে লেকু খটমট করে তাকিয়েছিল ওর দিকে।
তখন আর কথা বাড়ায়নি রমজান। জবাবটা দিয়েছিল পরদিন। হাজিরা খাতায় লেকুর নামটা কাটা পড়েছিল। আফসোস করেছিল রমজান— দুনিয়াতে আপন মনে করে কোন ব্যাটার উপকার করতে নেই।
তাই বলে রমজান কেমন করে ভাত মারবে লেকুর। অমন গোবদা গোবদা যার পায়ের গোছা, হাত আর মুখ আর বুকের পাটাটা যার কুলোর মতো চওড়া, খাটতে পারে যে মোষের মত, তার আবার রঙ্গম শহরে ভাতের অভাব? আর এক সর্দার তাকে লুফে নিয়েছিল। ওতে রমজানের আক্রোশটা কেবল বেড়েই গেছিল। তলে তলে ফুলতে থাকে রমজান। ফুলতে ফুলতে একদিন ক্ষেপে গেছিল। ছোরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল লেকুকে খুন করবে বলে।
এই ক্ষিপ্ত হওয়ার পরোক্ষ কারণ লেকু, প্রত্যক্ষ কারণ ছিল রমজানের নিজের কুলিরা। লেকুর দেখা-দেখি অন্য কুলিরাও সাহস পেয়েছিল, অস্বীকার করে-ছিল বথরা দিতে। অবস্থা দেখে অন্য সর্দাররাও টোপ ফেলেছিল, কিছু কম দর হেঁকেছিল। সেই কম দরেই ওরা চলে আসে রমজানের দল ছেড়ে। শেষে এমন হল রমজানের সর্দারিটাই বুঝি যায় যায়, ফাও রোজ-গার তো দূরের কথা।

তোকে আমি খুন করব। তোর রক্ত খেয়ে তবে আমার বিরাম।
বেশ, দেখা যাবে কে কার রক্ত খায়। লেকুও মুখ তোড়ে জবাব দিয়েছিল আর সর্বক্ষণের জন্য একটা ধারালো ছোরা গুঁজে রাখতো কোমরের ভাঁজে।
কিন্তু ওরা কেউ কারো রক্ত খেতে পারেনি। রমজানকে ফেরার হতে হয়েছিল জোড়া খুনের অভিযোগে। আর লেকুকে বাপজানের মৃত্যু-খবর পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল গ্রামে।
এত বছর পেরিয়ে গেছে তবু আক্রোশে ভাঁটা পড়েনি রমজানের, এখনো বুঝি দাদ তুলবার ফিকির খুঁজে বেড়ায়। আর লেকু? সেও কি ক্ষমা করতে পেরেছে উৎপীড়ক রমজানকে?
ও আম্বরি। আম্বরি! বাজুতে গোঁজা মাথাটা একটু তুলে কেমন মোলায়েম করে ডাকে লেকু। এটা ওর আদরের ডাক, আম্বরি জানে। আর এ ডাকে কখনো সাড়া না দিয়ে পারেনা আম্বরি।
কেন আমি কম যাই কিসে? হেলু ওস্তাগরের বেটি আমি। হামিদ বেপারীর পোলার সাথে আমার সাঙ্গাটা ভাঙলো কে? হামিদ বেপারীর পোলা, দুই দুইটা বলদ তার, একটা গাই গরু, তিন কানি জমিন, একখানা গোটা হাল। গোলা আছে হামিদ বেপারীর, সেই গোলাভর্তি ধান। আমার বাপকে পঞ্চাশ টাকা ঘুস দিয়ে এমন সোনার সম্বন্ধটা ভেংগে দিল কে? কে? কোথেকে হঠাৎ ছুটে এসে লেকুর সুমুখে দুহাতের দশটি আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে চিল্লিয়ে চলে আম্বরি।
কি হল আম্বরির? লেকুর অমন আদরের ডাকে এই জবাব? কিছু-ক্ষণের জন্য থ মেরে যায় লেকু। কেননা আম্বরির এমন উগ্রচণ্ডী রূপ কখনো দেখেনি ও। অসহ্য হলে মনে মনে গজর গজর করেছে আম্বরি। সেও কদাচিৎ। কিন্তু এমন করে সহস্র অভিযোগে ও তো কোনোদিন ফেটে পড়েনি? তবে কি লেকুর মারের মাত্রাটা আজ বেশি হয়ে গেছে?
লেকুর কোন জবাব নেই আম্বরির অভিযোগের। একটি অভিযোগও মিথ্যে নয়। ও শুধু পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আম্বরির দিকে। এত নালিশ, এত রাগ এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল আম্বরি?
হাল আছে একখানা? আছে একটা গাই গরু? তবে অত রোয়াব কেন? কেন আসতে যেতে পায়ের লাথি, ঝাঁটার বাড়ি! আ-হা-রে! কি আমার বিবির সুখরে! গেলবার সেই ঈদের চাঁদে দিয়েছে একখানা শাড়ি, সে

তো ছিঁড়ে 'তেনা-তেনা', তালি লাগাবারও যায়গা নেই। ঝাঁটার বাড়ির মতোই খেংরা আওয়াজ আম্বরির।

মারের মুখে চুপ থাকে আম্বরি, কি এক আনুগত্যে বিছিয়ে দেয় পিঠখানি, দাঁতে দাঁতে চেপে গ্রহণ করে স্বামীর নিষ্ঠুর নির্যাতন। শুধু দু হাতের দুর্বল আড়াল তুলে কোন রকমে রক্ষা করে যায় মুখ আর তল-পেটটা। সেই আম্বরির আজ এ কী মূর্তি।

কেন এমন হয়? বলা নেই কওয়া নেই কেন যে চড চড় করে চড়ে যায় লেকুর মেজাজটা! আর জানোয়ারের মত হাত পা চালিয়ে যায় ওই চিমসে যাওয়া দুর্বলা মেয়েটার কডাপডা গায়ে? এসব কথা যে লেকু একেবারেই ভাবে না তা নয়। যখন বুকের কাছে টেনে নেয় আম্বরিকে তখন ভারি দুঃখ হয়, কেমন অনুতাপও হয় লেকুর, ভালো লাগেনা। সোহাগ ছেডে দিয়ে কেন অমন নিষ্ঠুরের মতো ঠেঙ্গায় আম্বরিকে সে কথা-টাই ভাবে। আজও বাজুর কেঁচকিতে মাথা রেখে সে কথাই ভাবছে লেকু। অথচ লেকু তো এমন ছিলনা! এই বছর তিনেক আগেও আম্বরিকে ঠেংগা-নোর কথাটা ভাবতেই পারত না ও। সেই যে তুফান এল, ঘরটা উড়ে গেল তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে লেকু। সেবার তো আম্বরির খাড়ু শিকলী বন্দকীয় টাকা নিয়ে কোন রকমে চাল তুলল মাথার উপর। তারপরের বছর, অর্থাৎ গেল বছরের আগের বছর এল বান। বানের পানিতে ভেসে গেল চৌদ্দ গণ্ডা জমি আর বার গণ্ডা বর্গা চষা জমির ফসল। তারপর বউ-মেয়ে-ঘর সামলাতে গিয়ে এই দুটো বছর ওর ভাঁটিতে যাওয়া হয়নি। ফলে উপোষ চলেছিল গেল বছরের প্রায় আটটি মাস। কি হবে? কি করবে? লেকু তো প্রায় অন্ধকার দেখছিল চোখে। সব বিপদের ভরসা আম্বরি, সে-ই পথ দেখাল। গলার হাঁসুলী আর এক জোড়া চুড়ি ওর হাতে দিয়ে বলল, তুফানের বছর যে কথা বলেছিল সেই একই কথা—রামদয়াল জ্যাঠার কাছ থেকে যা পাও নিয়ে চলে যাও পাহাড়ে। সেদিন আম্বরি যদি ওর গায়ে দাএর দুটো কোপ বসিয়ে দিত তা হলেই বুঝি ভাল হত। কিছুতেই নিতে চায়নি লেকু। রঙ্গম থেকে আসার সময় লেকু সখ করে কিনে এনেছিল ওই হাঁসুলী আর চুড়ি। কী খুসিই না হয়েছিল আম্বরি। সারাক্ষণ গলায় জড়িয়ে রাখত হাঁসুলীটা। সেই হাঁসুলী বিক্রী করতে হবে? এর চেয়ে দুখা দা-এর কোপ বসিয়ে দেয়না কেন আম্বরি?

তবু বন্ধক রেখে টাকা আনতে হয়েছিল ওকে। পাহাড়ে গিয়ে ছনও কিনে

এনেছিল। কিন্তু শত্রু যে ওর পায়ে পায়ে। আধেকেরও বেশী ছন গেল চুরি। আম্বরির হাঁসুলী বন্দকের টাকাটা গেল রমজান চোরের পেটে। আবার শুরু হল উপোস।

এবার? এবার কি হবে? এবারও আম্বরিই টেনে তুলল ওকে, বলল যাওনা পাহাড়ে। ধর গিয়ে মহাজনদের। এতদিনের কারবার তোমার সাথে। এক কিস্তি কি আর বাকী দেবেনা?

ওই টুকুন তো আম্বরি কেমন করে এত বুদ্ধি খেলে তার মাথায়। তাজ্জব বনেছিল বার্মা ফেরত, বিদেশ-দেখা লেকু। আরো তাজ্জবের কথা, পুরনো মহাজন খুশি হয়েই বাকী দিয়েছে ওকে। আর এবারের বিক্রীর দরটাও পেয়েছে আশাতীত ভাল। ধার শোধ করে গেল বছরের লোকসানটাও অনেকদূর পুষিয়ে নিয়েছে লেকু।

কিন্তু সেই যে ফসল গেল, অলংকার গেল পুঁজি গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে লেকুর মেজাজটাও গেল বিগড়ে। ফসলের বিক্ষোভ, চুরির আক্রোশ, ক্ষিধের যন্ত্রণা সবই সে মিটিয়ে চলেছে আম্বরির পিঠে নীল-কালো দাগ তুলে তুলে। দু হাতে এখনো তার দানোর বল, সব লোকসান, সব ক্ষতিই হয়ত পুষিয়ে নেবে লেকু। কিন্তু বিগড়ানো মেজাজটার কি সারাই হবে কোনদিন?

বাজুর কেঁচকিতে মাথাটা যে ডুবিয়ে রেখেছে লেকু, ডুবিয়েই রাখে। আর ভাবে, শুধু ভেবে চলে। এমন করে তো কোনদিন ভাবেনি লেকু?

গায়ের গোশত তো সবই গেছে, এখন হাড্ডিগুলো পঁচলেই বাঁচি। সারাদিন যত মরার খাটনী, গতরটার কি সুখ আছে এক পল? এখন আবার তাঁর বেইশ্যার সেবা, সেও আমাকেই করতে হবে। হাঁসগুলো এখনো ফিরলনা, খাসিটার নেই দেখা, ছাগীটা বাঁধা রয়েছে আমতলায়, একটু দেখলে কী হয়! তা, উনি তো মিঞা সেজেছেন। চাকর না থাক বান্দী তো একটা আছেই ঘরে। বান্দী বলে বান্দী, বেইশ্যার পা টিপিয়েও ছাড়ল। হায় রে কপাল।

ওঃ এ জন্যই এত রাগ আম্বরির?

এই এই হারামজাদী! চুপ কর। হঠাৎ মাথা ঝাঁকারি দিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে লেকু। মস্ত যোয়ান দেহটার ভারে শক্ত উঠোনটা যেন কাঁপে, আর ঠন ঠন বেজে ওঠে।

কিন্তু একি হল লেকুর! আম্বরির পিঠের উপর তুলেও হাতটা কেমন করে সামলে নিল ও। কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সংযত করে নিল ভেতরের দানবটাকে! অত বড় দেহের মুষল ফুঁসে ওঠা শক্তি আর প্রচণ্ড ক্রোধটা

নিষ্ক্রমনের পথ না পেয়ে কী বিকৃতি ফেলেছে ওর মুখে। রগ আর গলার শিরাগুলো পাকানো দাড়ির মতো কেমন ফুলে কঁকিয়ে শুধু মোচড় খেয়ে চলেছে। হঠাৎ শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে দেয় লেকু। কুঁচ কালো মুখ বেয়ে ছুটে যায় অশ্রুর ধারা। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে লেকু, ঘরে যার ভাত নেই সে কি মানুষরে আম্বরি! সে যে অমানুষ, জানোয়ার। নইলে তোর মতো লক্ষ্মী বউকে এমন করে ঠেঙ্গায়!

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় লেকু।

আস্‌সালাতো খাইরুম মিনান্ নওম্

'আস্‌সালাতো খাইরুম মিনান্ নওম্

পুব আকাশে ঈষৎ সাদা পোঁচ। একটু বাদেই সূর্য উঠবে। মোয়াজ্জিনের মিহি কণ্ঠে ভোরের আহবান, নিদ্রার চেয়ে উপাসনা উত্তম। ডাক দিচ্ছে মোয়াজ্জিন, ওঠ উপাসনায় সামিল হও। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ছে চড়ুই শালিকের প্রভাত কাকলি। সারারাতের রুদ্ধ যত গান এই মুহূর্তেই যেন ওদের কণ্ঠে এসে ঝংকার তুলেছে। ওদের গান আর মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে, শীতের কুহকি সকালে যেন সুরের এক ইন্দ্রজাল। সে সুর গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনে জাগরণের সাড়া।

এমনি করেই সকাল হয় বাকুলিয়া গ্রামে।

এক শো বছর আগেও, এমনি করেই নাকি সকাল আসত এই গ্রামে। মিঞা বাড়ির মসজিদ থেকে ভেসে আসত আজানের মিষ্টি করুণ রাগিণী। আজান শুনবার আগেই, নীড়জাগা প্রথম পাখিটির আনন্দ কুজনে, ঘুম ভাংতো কুল-বধূর, ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলত পাশের মানুষটিকে, সেই এক শো বছর আগে। তার আগের ইতিহাস কিংবদন্তি।

কেউ বলে সৈয়দদেরই পূর্বপুরুষ এ অঞ্চলে এসেছিল ইসলাম প্রচারে। এখন যে মিঞা বাড়ি সে বাড়িতে ছিল এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবার। গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি তরুণ এক মুজতাহিদ। তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাড়ির কর্তা। তরুণ সাধককে সাদর আমন্ত্রণে ডেকে এনেছিলেন বৈঠকখানায়। গোটা পরিবার ইসলাম কবুল করেছিলেন। তারপর কোন এক শুভলগ্নে বাড়ির কর্তা আপন কন্যাকে সমর্পণ করেছিলেন সুদর্শন পীরের খেদমতে।

যাযাবর মুজতাহিদ আটক পড়েছিল দুটি পেলব বাহুর বন্ধনে। সেই বছরই তৈরী হয়েছিল মিঞা বাড়ির ওই মসজিদ আর গ্রামের অপর প্রান্তে পত্তন হয়েছিল সৈয়দ বাড়ির।

অন্যরা বলে আর এক কাহিনী। একদা অঞ্চলটি ছিল বিরানা। বসতি ছিল অনেক দূরে, উত্তরে। সেই উত্তরের নমো কুঁয়োররা উঁচু জাত ব্রাহ্মনদের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে একদিন বসতি ছেড়েছিল। মুসলমান হয়ে চলে এসেছিল এই বিরানা অঞ্চলে, পত্তন করেছিল বাকুলিয়ার। এ নাকি বল্লাল সেনেরও আগের কথা।

লিখিত ইতিহাস আর কিংবদন্তি মিলে যে সত্য সে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা কেউ করেনি। বাকুলিয়ার মানুষের সে আগ্রহ নেই। তারা শুধু জানে ওই মসজিদের দালানটি এক শো বছরের পুরনো। এটা জানা সহজ কেন না মসজিদের প্রবেশ পথেই আরবী বাংলা সনের পাশাপাশি লেখা রয়েছে ১৮৩৫ ইং। অবশ্য মিঞারা বলেন মসজিদের পত্তন আরো দুশো কি তিন শো বছর আগের, তখন ঘরটা ছিল কাঁচা। আর একটি কথা তারা জানে, সেই যে শুনেছে 'দাদা পিজার' দিনে, বাকুলিয়ার ভাগ্য আবর্তিত হত মিঞা আর সৈয়দ বাড়িকে কেন্দ্র করে; আজ সে সব কথা প্রাচীন পুঁথির মতোই বাসি হয়ে গেছে। মিঞারা আজ কোমর ভাঙ্গা সিংহ, হয়ত গুরুত্ব আছে তাদের এই বাকুলিয়ার সমাজে কিন্তু শক্তি নেই, রোয়াব নেই, শুধু আছে হৃতবিত্ত খানদানীর খেদ আর হায় আফশোস, অক্ষমের ক্রোধ। আগ্রহ না থাকলেও কিংবদন্তির আড়ালে লুকনো কোন সত্য যখন ঝিলিক মেরে ওঠে তখন উৎকর্ণ হয়, কৌতূহলী জটলা পাকায় বাকুলিয়ার মানুষ। ওই মসজিদেরই পয়লা কাতারের পয়লা কি দোসরা আসনটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা ঘটেছিল। সেও বছর তিরিশ আগের কথা। মরহুম বড় মিঞার তখন শেষ সময়।

দিনটা ছিল শুক্রবার, জুমার নামায শুরু হয়ে গেছে। ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে একজনের মতো যায়গা শূন্য। ওটা বড় মিঞার আসন। অসুস্থতার দরুণ সব সময় তাঁর পক্ষে জামাতে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু যায়গাটুকু খালি থাকে, তিনি যদি এসে পড়েন ওখানেই বসবেন, এটাই নিয়ম।

তিনি না এলে দু চার মিনিট অপেক্ষা করবেন ইমাম সাহেব, নিয়ত বাঁধবার আগে শেষ বারের মতো জেনে নেবেন বড় মিঞা জামাতে আসছেন না, তখন দু পাশের লোক সরে এসে ওই খালি যায়গাটুকু ভরে দেবে, শুরু হয়ে যাবে জামাত।

কিন্তু সেদিন এই নিয়মটার ব্যতিক্রম হয়ে গেল। বুড়ো সৈয়দ সাহেবেরও আসতে দেরী হয়ে গেছিল। খেয়ালে হোক বেখেয়ালে হোক এসেই টুপ করে বসে পড়লেন ওই খালি যায়গায়। ওদিকে একটু পরেই বড় মিঞা এসে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাঁর যায়গা নেই। কিন্তু বেশীক্ষণ না, পরমুহূর্তেই কে একজন পাশে সরে গিয়ে যায়গা করে দিল, বড় মিঞা নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। এখানেই শেষ হত ব্যাপারটা। হোলনা। কেননা বড় মিঞার বড় ছেলে এই অমার্জনীয় বেয়াদবীর প্রতিবাদ করে বসল সেই মুহূর্তেই। বিস্মিত অপমানিত বুড়ো সৈয়দ নীরবে সরে যান পাশে, বুঝি যায়গা করে দেন বড়ো মিঞার জন্য। কিন্তু জবাব দিলেন বুড়ো সৈয়দের সাহেবজাদা : খোদার ঘরেও কি আসন সংরক্ষণ? সে তো না-জায়েয।

হয়ত তাই। তাই বলে শরাফতের খানদানের নেকবক্তের কোন মর্যাদা থাকবেনা? গরম হয়ে ওঠে বড়ো মিঞার বড় ছেলে।

সে মর্যাদা আর যেখানেই থাকুক, খোদার ঘরে নয়। জ্ঞানলব্ধ গাম্ভীর্যের সাথে কিছু উষ্ণতা ঢালে সৈয়দ পুত্র।

বেধে গেল তুলকালাম বহস। হাদিস-ফেকাহ্-উসুল-তফছিরের জটিল তর্কের ঝড় উঠল। কিতাব এল বোখারী শরীফ, মুসলেম শরীফ, তিরমিজি শরীফ আবু দাউদ, আরো কতো।

সেদিনের মতো কোন রকমে নামায সারা হল। তারপর মসজিদ ছেড়ে বাইরে এল তর্কটা। বাইরে এসেই অন্য রূপ নিল, দু বাড়ির খানদানী মর্যাদার দ্বন্দে নয়া গি ট লাগল।

বাকুলিয়ার মানুষ তাজ্জব হয়ে শুনল, প্রশ্ন আর হাদিস তফসিরের নয়, আল্লার ঘরে সকলের সমান অধিকার নয়। প্রশ্ন বড় মুসলমান কে?

সৈয়দরা অথবা মিঞারা? বাকুলিয়ার মুখ্যুসুখ্যুরা দেখল কোন্ লুপ্ত গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা, অবলুপ্ত ইতিহাসের বিবর্ণ অক্ষরগুলো ঝলসে উঠেছে। দলিল ছুঁড়ে দিয়ে সৈয়দরা বলল, এই দেখ তোমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের পূর্বপুরুষদের পায়ের ধূলো মুখের কলেমা নিয়ে মুসলমান হয়েছে।

মিঞারাই বা কম যাবে কেন? বলল, ওসব ভুয়ো, আসলে তোমরা যে ভেসে এসেছিলে, নেহাৎ আমাদের অনুগ্রহে এখানে বাস করছ। এই দেখ আমাদের পূর্বপুরুষরা ওই বসতবাটি বানিয়ে দিয়েছে তোমাদের পূর্বপুরুষদের, ওই ওই জোত, ওই ওই জমি আর তালুক খুশি হয়ে তোমাদের দান করেছে।

এই বাঘে-মহিষের লড়াইতে 'মুখ্যুস্থথ্য'রাও দল বেছে নিল, ফারাক হয়ে দু দল হল। কিন্তু, মুখ্যুস্থখ্যু'দের জন্য আরো যে অনেক 'মাদারির খেল' জমা ছিল। হঠাৎ ওরা শুনল আপোষ হয়ে গেছে। দেখল মিঞা বাড়ির মেয়ে বধূ হয়ে চলে এল সৈয়দ বাড়ি। দু-পুরুষ ধরে সেই তিন পুরুষ আগের আত্মীয়তায় যে চিড় ধরেছিল, নয়া কুটুম্বিতার বন্ধনে নিকটতর হল দুই খানদানের সেই প্রাচীন আত্মীয়তা।

মজলিসের সুমুখে আজও যখন জটলা বসে বাকুলিয়ার বুড়োরা সে বছরের গল্প শোনায়, কতো রং ফলিয়ে, আরবী ফার্সী উর্দু কিতাবগুলোর বিচিত্র বর্ণনা জুড়ে।

মিঞা বাড়ির মিনার থেকে প্রভাত বন্দনার সেই মন্দ্র মধুর সুরটি ভেসে আসবার আগেই ভোর হয়ে যায় সৈয়দ বাড়িতে। শেষ রাত্রে উঠে জিকির করেন মুন্সিজী। জিকির শেষে দরুদ পড়েন সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে।

আজও তেমনি রাত থাকতেই ভোর হয়েছে সৈয়দ বাড়িতে। জিকির শেষ করে মুন্সিজী গোটা বাড়ি টহল দিয়ে চলেছেন।

বালাগাল্ উলা বেকামালিহী
কাসাফুদ্দোজা বেজামাহিলী
হাসানাতজামী ওয়া খেসালিহী
ছল্লে আলাইহে ওয়া আ-লিহী।

দহ্‌লিজের টিনে অন্দর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে গম গম করে মুন্সিজীর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ। প্রথমে দহলিজ, তারপর বাইর বাড়ি তারপর ভিতর বাড়ি। আবার উল্টো পথে বাইর বাড়ি।

খড়মের খট খট আওয়াজ। পরিষ্কার মিষ্টি সুরের লহরী। শেষ রাত্রির নৈঃশব্দে অনির্ব্বচনীয় এক ধ্বনির মায়াজাল বিস্তার করে চলেন মুন্সিজী। সে সুরে আর যারই ঘুম ভাঙ্গুক, মালুর ঘুম ভাঙ্গেনা। চোখের পাতাগুলো যেন আরো জড়িয়ে আসে, ঘুমটা যেন আরো মিষ্টি মনে হয়। মনে হয় ঘুমের গানটি চলুক আরো কিছুক্ষণ। মালু-ওঠ, বাচচু মিঞা কেমু মিঞা—ওঠেন, ভোর হল, নামাযের সময় হল। ধ্বনির লহরে অকস্মাৎ যেন ছন্দপতন। দালানের কাছটিতে এসে চেঁচিয়ে ওঠেন মুন্সিজী। মালু তার আপন সন্তান, বাচ্চু কেমু সৈয়দ বাড়ির ছেলে। তাই পদপ্রয়োগে মুন্সিজীর এই পক্ষপাতিত্ব। বাচ্চু কেমুর কি মনে হয় মালু জানেনা। কিন্তু, মালুর কাছে ওই চিৎকারটা বিরক্তিকর। কাঁথাটাকে টেনে মুখখানা ঢেকে নেয় মালু,

অস্বীকার করে ওই নিষ্ঠুর হাঁক। কান পেতে থাকে আবার কখন ভেসে আসবে ঘুমের মিষ্টি আমেজের মতো সেই মিষ্টি সুরটি। অপেক্ষা করতে করতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে আবার। ঘুমের মাঝেও যেন শোনে—সামসুদ্দোজা বদরুদ্দোজা…আর হঠাৎ ওই গানের সুরে আবৃত্তিটা থামিয়ে হাঁক দেন মুন্সিজী —মালু, মালু। এবার কাঁথাটাকে কানের দুপাশে একেবারে সেঁটে নেয় মালু।

বড় আপা, ও বড় আপা, দেখ সুরুজ উঠে গেল।

কাঁথাটাকে একটু ফাঁক করে দেখল মালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে রাবু, আড়মোড়া ভাবছে।

কি রে বড় আপা, তোর কি নামায পড়ার ইচ্ছে নেই? একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে রাবু।

ক্যাট ক্যাট করিসনা তো? ঘুমুতে দে। খেঁকিয়ে উঠল আরিফা।

বেশ, ঘুমা। আমি কিন্তু রোজ রোজ জ্যাঠিআম্মার কাছে মিছে কথা বলতে পারব না তোর জন্য।

কে বলছে তোকে মিছে বলতে। বলিস নামায পড়িনি আমি, পড়বোও না। হল তো? রেগে যায় আরিফা।

বেশ, পিঠে যখন দুমদাম পড়বে আমায় দুষতে পারবিনে।

আরিফা রাগটা আর ধরে রাখতে পারে না। মাথার তলা থেকে বালিশটা তুলে ছুঁড়ে মারে রাবুর দিকে। খুব বাড় বেড়েছে তোর, ভারি নামাযি হয়েছিস।

বালিশ ছাড়াই দু হাত লম্বালম্বি বাড়িয়ে তারই ফাঁকে মাথাটা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ে আরিফা।

রাবু আপাটা যে কি? এই শীতেও কেমন করে যে লেপের মায়া ছেড়ে রাত থাকতেই উঠে পড়ে। ভাবে মালু আর সজাগ থাকতে চেষ্টা করে। এখুনি তো রাবুর ফরমান আসবে—ওজুর পানি এনে দে।

গানের মতো মিষ্টি আবৃত্তি থেমে গেছে। খড়মের শব্দটাও আর কানে আসছে না। বাইরের পুকুর থেকে ভেসে আসছে ওজু আর গলা ঝাড়ার শব্দ—খাঁক খাঁক, ঝপ ঝপ। আযানের শেষ কলিটাও বাতাসে ঝংকার রেখে মিলিয়ে গেল: হাইয়ালাস্-সালা হাইয়ালাল্-ফালা আল্লা-হু-আকবর… কাল যে মস্ত বড় একটা গোনাহ্ করেছিস খেয়াল আছে?

রাবুর গলা। উৎকর্ণ হয় মালু। ছোট্ট বুকটা টিপ টিপ করে। গোনাহ্কে ওর বড় ভয়। গোনাহ্গারকে নাকি জ্বলে ও পুড়ে ছটফট করতে হয়

দোজখের আগুনে। সে আগুন যে সে আগুন নয়। সে আগুন সাংঘাতিক। দুনিয়ার কেউ দেখেনি তেমন আগুন। লক্ষ বছর কোটি বছর সে আগুনে পুড়তে হবে, যতদিন না শাস্তি মওকুব করে দেন আল্লাতালা। আব্বার কাছে আম্মার কাছে এ সব কথা শুনেছে মালু। ওর ছোট্ট বুকের টিপ টিপানিটা বেড়ে যায়, কী এমন গোনার কাজ করল রাবু আপারা।

গোনাহ্? গোনাহ্ কখন করলাম। গোনাহ্‌র কথা শুনে আরিফা চোখ রগড়ায়। উঠে বসে। ব্যাপারটা সত্যি বুঝে নেয়া দরকার।

ওই যে পর্দা ভাঙলি কাল? আম্মা না হয় না-ই জানল কিন্তু, খোদা তো দেখেছে? খোদা মাফ করবে কেন? ব্যাপারটা ভেঙ্গে বলে রাবু।

ধ্যাৎ, কেউ তো দেখেনি আমাদের। আরিফার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

না দেখল। আমরা তো দিনের বেলায় প্রকাশ্যেই বেরিয়েছি, নিষেধ অমান্য করে। সেটা পাপ হল না?

আরিফার ঘুমের নেশাটা এতক্ষণে ছুটে গেছে। চোখ বড় বড় করে শুধায়, কী বলতে চাস তুই।

আমি বলি, চল, নামাযটা পড়ে ফেলি। এক রাকাত নামাযে এক হাজার গোনাহ্ মাফ হয়, জানিস্ তো?

গম্ভীর হয়ে ভাবতে শুরু করে আরিফা। রাবুর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় বুঝি।

মেঝেতে কাঁথার নীচে এই শীতেও বুঝি ঘামিয়ে ওঠে মালু। কেমন অস্থির লাগে ওর। বড় আপাটা যে কী! সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না অথবা বুঝতে চায় না। সাপকে তার এত ভয় অথচ গোনাহ্ সম্পর্কে কেমন নির্বিকার। এক রাকাত নামাযে এক হাজার গোনাহ্ মাফ; রাবু আপার কথাটা যে একটুও বানানো নয়, এটা কি বুঝতে পারছে না বড় আপা? কাঁথাটা ছুড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মালু, বলে, ওজুর পানি দিই, বড় আপা?

রাবু আরিফা, দু জনেই বুঝি চমকে ওঠে। ওমাঃ মালু আমাদের কেমন সুবোধ ছেলে দেখ, না ডাকতেই উঠে পড়েছে আজ! কেমন সুধা ঝরে রাবু আপার কণ্ঠে।

মালুর কচি মুখটি আকর্ণ হাসির কৃতার্থতা ফুটিয়ে চেয়ে থাকে রাবুর দিকে। রাবু আপার মুখের মতোই মিষ্টি তার কথাগুলো। আব্বার কেরাত আর ওই সকাল বেলায় সুর করে পড়া দরুদের মতোই মধুমাখা রাবু আপার কথা।

কান পেতে শুনে যেতে ইচ্ছে করে মালুর। ধাঁ করে বেরিয়ে যায় মালু। ঝাঁ করে ফিরে আসে দু বদনা পানি হাতে।

কিছুদিন হল সাপ ঢুকেছিল রাবুদের ঘরে। নীরবে এসে নীরবেই চলে গেছিল সাপটা। ওদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। তবু ঠক ঠক করে কেঁপেছিল আরিফা আর ভয়ের চোটে গলা ফাটিয়ে মালুকেই ডেকেছিল রাবু। সেই থেকে রাবুদের ঘরেই মালুর শোবার ব্যবস্থা। মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে কাঁথা জড়িয়ে ঘুমোয়। সকালে নিজেই গুটিয়ে রাখে বিছানাটা। এবার দেখা যাবে কেমন বীর পুরুষ ; ওর গালে ছোট্ট একটা টোকা মেরে বলেছিল রাবু।

হুঁ! সাপকে যেন ভয় করি আর কি! হাতের লাঠিতে একটা ঝাঁকুনি তুলে উত্তর দিয়েছিল মালু।

সাপ সম্পর্কে মালু অকুতোভয়। মামুলী সাপগুলোকে ও অবলীলাক্রমে লেজে ধরে নেয়, মাথার উপর দু চক্কর ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারে শূন্যের দিকে। শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ভিরমি খায় সাপের বাচ্চা, আর সে-ই ক-দ্দুর গিয়ে পড়ে যায়, অনেকক্ষণ নিথর পড়ে থাকে। গোখুরেকে নিয়ে অবশ্য একটু সাবধান হতে হয়। মাথাটা তাক করে লাঠি ছুঁড়তে হয়। ফসকে গেলে বিপদ। কিন্তু মালুর লক্ষ্য যে অব্যর্থ, এ বাড়িতেই দু দুটো গোখুরে সাপ মেরে সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে মালু। রাবুর ঘরে শোবার বন্দোবস্তটা ওর সেই সাহসিকতারই পুরস্কার। বুকের উপর হাত না রেখেও বুঝতে পারে মালু খুসির চোটে রাতারাতি ওর সিনাটা ফুলে কেঁপে কত চওড়া হয়ে গেছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমটা যেন পালিয়ে যায় মালুর। নিয়ত বেঁধে বুকের উপর হাত রাখল রাবু আর বড় আপা। রুকুতে গেল। তারপর সেজদায় পড়ল। দুবার সেজদা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাতাস পেয়ে গাছের পাতাগুলো যেমন ঘন ঘন নড়ে তেমনি দ্রুত নড়ছে ওদের ঠোঁট। কোন্ সুরা পড়ছে বুঝবার উপায় নেই। কেননা, শুধু ঠোঁট দুটোই নড়ছে, কোন শব্দ নেই। আবার সেজদায় পড়ল ওরা। তারপর সেজদা থেকে ওঠে দু হাত তুলে মুনাজাত সারল। আবার দাঁড়িয়ে নিয়ত বাঁধল।

আকাশের দিকে অতক্ষণ হাত তুলে আল্লার কাছে কি চাইল রাবু আপারা। গোনাহ্‌র জন্য মাফ চাইল? সত্যি কি গোনাহ্ করেছে ওরা? আর তাই যদি হয়, যদি দোজখেই যায় রাবু আপা, তা হলে? ইস্! অমন টক-টকে আর আরামের শরীর রাবু আপার, কেমন করে সইবে দোজখের আগুন?

আল্লাহ্‌, শাস্তি দিও না রাবু আপাকে ; মাফ করে দাও রাবু আপাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে মালু। পানিতে ভরে যায় ওর দুটো চোখ। রাবু আর আরিফার মাঝে রাবুর প্রতিই বুঝি মালুর পক্ষপাতিত্ব। তাই প্রার্থনা থেকে আরিফার নামটা যে একেবারেই বাদ পড়ে গেল সেটা খেয়ালেই পড়ল না ওর।

কিরে, ফোঁস ফোঁস করছিস কেন ? কি হল ? সালাম ফিরিয়ে শুধায় রাবু।

তাড়াতাড়ি কাঁথা টেনে মুখ লুকোয় মালু। প্রার্থনার কান্নায় কখন ভারি হয়ে এসেছিল ওর নাকটা। দু আঙ্গুলে টিপে নাকের পানিটা বের করতে গিয়ে ধরা পড়েছে রাবুর কাছে। বড় লজ্জা !

আচ্ছা, রাবু আপা, পুরুষদের জামাতে ইমাম আছে, তোমাদের নেই কেন ? তুমি বা বড় আপা ইমাম সাজতে পার না ? কাঁথার তলা থেকে মুখটা বের করে হঠাৎ শুধায় মালু। প্রশ্নটা এইমাত্র জেগেছে ওর মনে।

রাবু ততক্ষণে কর গুনে গুনে দরুদ পড়ছে। জবাব না দিয়ে শুধু ভ্রূ কুঁচকে তাকায় একবার।

সতি রাবু আপা, বল না মেয়ে ইমাম কি হয় না ? কৌতূহল চেপেছে মালুর। জবাব না পেলে কৌতূহলটা মিটাবে কেমন করে ? কিন্তু, রাবুর দরুদটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না মালু। নামায শেষ করে মা এসে পড়েছেন ঘরে : মালু, এখনো শুয়ে ?

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মালু। খিড়কির পুকুরে গিয়ে দু আঙ্গুল পাঁক তুলে দাঁতগুলো সাফ করে নেয়। ভিজে হাতটা মুখের উপর বার দুই বুলিয়ে ফিরে আসে। মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে নেয় সার্টটা। ছুট দেয় বাইর বাড়ির দিকে। মক্তবের সময় হয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতেই মার হাত থেকে তুলে নেয় পিঠেগুলো। ভরে নেয় প্যাণ্টের পকেটে। চুলটা একটু আঙ্গুল চালিয়ে ঠিক করে দিতে যায় মা। দাঁড়ায় না মালু। আব্বা মুন্সিজীর ছড়িটাকে ওর ভীষণ ডর। নামায নিয়ে এখনো তেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেননি আব্বা। তাই ভোরে না উঠলেও দু একটা ধমকের উপর দিয়েই কেটে যায় তাঁর অপ্রসন্নতা। কিন্তু মক্তবে দেরী করলে রক্ষে নেই। বেহুঁশের মতো ছড়ি চালিয়ে যাবে মালুর পিঠে।

সৈয়দ বাড়ির কাঁচারীর পাশেই মক্তব ঘর। মিঞা আর সৈয়দ বাড়ির ইজের-হ্যাফ প্যাণ্ট পরা ছেলেমেয়ে ছাড়াও গ্রামের উদলা গায়ের ছেলে মেয়েরা সূর্য উঠতে না উঠতেই মক্তবে এসে জড় হয়। ছোটরা আসে খালি হাতে। একটু বড়োদের হাতে থাকে 'আমপারা'। যারা মালুর বয়সী বা আর একটু

বড় ওরা আসে মাথায় টুপী, বগলে রেহাল আর কিতাব নিয়ে। আলিফ যবর আ, বে যবর বা, তে যবর তা, ঘরের চারিদিকে চাটাইয়ের উপর গোল হয়ে বসে সামনে পিছনে দুলে দুলে পড়ে যায় বাচ্চারা। একটু বড়রা মুন্সিজীর গলায় গলা মিলিয়ে টান ধরে—আ-উ যু বিল্লা হে মিনাশ শায়তোয়ানির রাজিম।

সৈয়দ বাড়ির বাচ্চা কেনুদের সাথেই বসে মালু। ওরা বসে মুন্সিজীর ডান দিকে। অন্যরা মুন্সিজীর বাঁ দিকে। দু দিক থেকে গোল হয়ে সারিটা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে সীমান্তের প্রহরী মুন্সিজীর আলমিরা। আল-মিরাটা মুন্সিজীর কোরান-কিতাবগুলো ধারণ করে আর রক্ষা করে আশরাফ আতরাবের সীমানা।

কচি কচি গলার কত আওয়াজ বিচিত্র উচ্চারণ, কল কল করে মক্তবঘর। ছোট্ট দুয়ার দিয়ে কচি কচি কণ্ঠের সেই ঐক্যতান ছড়িয়ে পড়ে শীতের কুয়াশা ঢাকা গ্রামের ঘরে ঘরে কি এক আহ্বানের মতো। সামনে পিছে দুলে দুলে আবৃত্তি করে চলেছে কিশোর কিশোরী, উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে ওদের কচি কণ্ঠ। সেই ধ্বনির তরঙ্গে দোল খেয়ে খেয়ে হয়ত অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখছে ওদের কুটিরবাসী আব্বা আম্মারা।

মালুর চলছে কোরান শরীফের দ্বিতীয় সিপারা। রেহালের উপর কোরনটা খুলে রেখে সেও সবার সাথে দোল খায়, ঠোঁট নাড়ে। এত কণ্ঠের মাঝে ওর কণ্ঠটা যে হারিয়ে যায় সেটা জানে মালু। তাই শুধু ঠোঁট নাড়ে। একটি চোখ লক্ষ্য করে মুন্সিজীকে আর একটি চোখ পড়ে থাকে উন্মুক্ত দহলিজে যেখানে চলছে ঘাস-রং ফিঙেটির উড়তি ঘুরতির বিচিত্র খেলা। আর ওর মনটা কোথায় কোথায় যেন ছুটে চলেছে। মসজিদের সুমুখে সেই পঞ্চায়েতের মেল, মুখে নল পুরে কেলু মিঞার গুড় গুড় আলবোলা টানা, দুরমতির সেই ঝলসে যাওয়া কপাল। আহ্ কী কষ্ট দুরমতির। রাবুর সেযদা, পিঠটা বেঁকিয়ে রুকু থেকে যখন সেযদায় নামে রাবু অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে······ এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে কত যায়গার, কত কিছুর মাঝে, কত মানুষের সাথে ছুটে চলে মালুর মনটা। ডানে বাঁয়ে লেখা সেই বাঁকা অক্ষরগুলো আর চোখে পড়েনা ওর।

হঠাৎ কান খাড়া করে মালু। রাস্তার ওপারে যে ট্যাগুল বাড়ি আর তার উল্টোদিকে রমজানের বাড়ি, তারই মাঝামাঝি কোন যায়গা থেকে ভেসে আসছে আম্বরির গলা। কানের নীচে হাতের তালু রেখে ভালো করে শুনে

নিল মালু, হ্যাঁ আম্বরির গলাই বটে। কেন যেন ক্রুদ্ধ হয়েছে আর কার উদ্দেশ্যে কহর দিয়ে চলেছে অনর্গল : নিজের মেয়ের গোশ্‌ত খা, পোলার গোশ্‌ত খা, মেয়ের হাড্ডি পোলার হাড্ডি চিবিয়ে চিবিয়ে খা, দাঁত ভাং······ আমার খাশি তো নয়, খেয়েছিস নিজের 'মাইয়া' নিজের পোলা······আয়-হায় রে আমার কি চেকনাইওয়ালা খাসিটারে। বাইন্যারা 'পাঁচ টেঁয়া' দিতে চেয়েছিল, বেচলামনা, সেই খাসিটা কোন্ হারামখোরের পেটে গেল-রে। তারপর শোনা যায় আম্বরির বিলম্বিত বিলাপ।

কি হল আম্বরির ? উসখুস করে মালু।

মুন্সিজী ছড়িটা উপরের দিকে তুলে ধরেছেন। এটা পড়া বন্ধ করার ইঙ্গিত। মন্ত্রপূতের মত স্তব্ধ হয়ে যায় সেই কচি কণ্ঠের ধ্বনি কল্লোল। ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়া নিতে শুরু করেছেন মুন্সিজী।

ধ্বক করে ওঠে মালুর বুকটা। কিছুইতো পড়া হয়নি। মনে মনে একটু পড়ে নিতে চেষ্টা করে মালু।

আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে আম্বরির অভিশাপগুলো : যে খেয়েছে আমার খাসি মুখের জিহ্বা, গায়ের গোশ্‌ত তার খসে খসে পড়বে। নির্ব্বংশ হবে সে। সাতকুলে কেউ থাকবেনা। মরলে কবর দেবার লোক থাকবে না। মরা লাশ শিয়ালে কুত্তায় টেনে টেনে খাবে।

তাই তো, হঠাৎ মনে পড়ে গেল মালুর। ওই আম্বরির খাসিটাকেই তো গলা বেঁধে মিঞাদের বাগিচায় টেনে উঠিয়েছিল রমজান। অস্থির হয়ে ওঠে মালু, এটা জানাতেই হবে আম্বরিকে।

ভূত নেমে যায় মালুর গা থেকে। সৈয়দ গিন্নী ডেকে পাঠিয়েছেন মুন্সিজীকে। অতএব পড়া দেবার সেই নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়ে গেল মালু, আরো অনেকে। সমবেত গানের মতো সুর করে করে সেই ছুটির আগের দরুদটা শুরু করে দেয় ওরা !

ছল্লেল্লা হো আলা সৈয়দেনা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আ-লেহী ওয়া আস্‌হাবেহী ওয়াসাল্লাম।

দরুদ শেষে গল গল করে বেরিয়ে যায় ওরা। কোরানশরিফ আর রেহালটা গুটিয়ে আলমিরার লাগোয়া তাকে রেখেই ছুট দেয় মালু।

গ্রামের কিষাণ কিষাণী। শিক্ষার আলোকে দৃষ্টি ওদের প্রখর হয়নি, জ্ঞানের চর্চায় বুদ্ধি ওদের শানিত হয়নি। সে অভাবটি পূরণ করার জন্যই হয়ত ওদের রয়েছে সরল বুদ্ধির একটি সহজাত অনুভব ক্ষমতা যা দিয়ে ওরা আঁচ করে সম্ভাব্য বিপদ, আবহাওয়ার গতি। কুকুরের যেমন ঘ্রাণশক্তি, মাটি শুঁকে শুঁকে খুঁজে নেয় অনেক দূরের শিকার, বিড়ালের যেমন দৃষ্টি, অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে, তেমনি কৃষকদের এই সহজাত অনুভব ক্ষমতা। হাওয়ার গতিতে ওরা বুঝে নেয় আসন্ন দুর্যোগের সংকেত, আকাশের চেহারায় ওরা খুঁজে পায় খরার চিহ্ন, চারা গাছটির রং দেখে ওরা করে ফসলের ভবিষ্যদ্বাণী। সব ক্ষেত্রেই ওদের এই বিচার শক্তি হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু, অনেক পুরুষে সঞ্চাত অভিজ্ঞতাটা দিয়েই ওরা বুঝেছে ওদের এই সহজ সরল প্রবৃত্তির ইঙ্গিত মোটামুটি সঠিক পথেই চালিয়ে নেয় ওদের।

মারতে গিয়েও আম্বরিকে মারতে না পেরে সেই যে বেরিয়ে এসেছিল লেকু কিছুক্ষণ বসেছিল রাস্তার ধারে। খুঁটি বাঁধা ছাগিটা ঘরে ফেরার জন্য যখন অস্থির চেঁচামেচি শুরু করে তখন বুঝি হুঁশ হয় লেকুর। বাচ্চা শুদ্ধ ছাগিটাকে বাড়ি নিয়ে আসে ও।

ঢেলা ঢেলা মাটি দিয়ে তৈরী খোয়াড়ের দরজাটা বন্ধ ছিল, হাঁস মুরগী-গুলো ঢুকতে পারছিল না। প্যাঁক প্যাঁক, কঁক্ কঁক্ চীৎকারে, বাড়ি মাথায় তুলেছিল ওরা। ওদের খোয়াড়ে বন্ধ করতে গিয়েই লেকুর মনে পড়েছিল খাসিটার কথা। বাড়ির আশেপাশে, সৈয়দদের মান্দার বাড়ি, ট্যাণ্ডল বাড়ি মাঝিবাড়ি কোথাও খাসিটার খোঁজ না পেয়ে রমজানের উপরই সন্দেহ হয়েছিল লেকুর। তারপর গাঙের কিনারটা ঘুরে এসেও যখন সন্ধান পাওয়া গেলনা তখন দৃঢ় হয়েছিল লেকুর সন্দেহটা।

রমজান, নিশ্চয় রমজান ডাকাতের কাণ্ড। ওর ঘর দোরটা ভাল করে দেখে এস তুমি। খবরটা শুনে আম্বরিও চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সারা রাত ঘুমুতে পারেনি আম্বরি। রাতভর শুধু এপাশ ওপাশ করেছে আর খাসিটার শোকে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়েছে। আর গোটা পয়লা প্রহর ধরে শুধু অভিসম্পাত ছুঁড়ে গেছে কোন হারামখোর চোর বাঁটপাড়ের উদ্দেশ্যে। সকালে উঠেই রমজানদের বাড়ির সীমানাটায় দাঁড়িয়ে সেই অভিশাপগুলোকে আরও চোখো আরও স্পষ্ট করে শুনিয়ে চলেছিল।

রাতের বেলায় এবং সকালেও অনেকক্ষণ শুনি না শুনি করে চুপ মেরে ছিল রমজানের স্ত্রী তাজুর মা। কিন্তু বেলা বাড়তে সেও জিবে ধার দেয়। খানকির 'বেডি' খানকি, ফকীরার মাগি! তোর মেয়ের মাথা খা তুই। তুই শুয়র খা। তুই হারাম খা। তারপর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে চলে তাজুর মা—সাত কানি তাদের জমি, মিঞা বাড়ির নায়েবি, পুকুরে অঢেল মাছ, কিসের অভাব তাদের? তারা কেন যাবে ভিখারীর স্ত্রী ভিখারিনীর খাসি চুরি করতে? অমন কত খাসি তাদের ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়ায়!

স্ত্রীদের এই মুখের লড়াইয়ে দুদিকের পুরুষরাই চুপ। বিগত যৌবনা মেয়েটির মাধুর্যহীন অনাকর্ষনীয় কণ্ঠস্বরের চীৎকারে কি এক পৈশাচিক পুলক পায় রমজান। গোটা শরীর দুলিয়ে হাসে ও।

মনে মনে প্রতিকারহীন অন্যায়ের প্রতিশোধ খোঁজে লেকু। নির্বিষ সাপের আস্ফালনের মতো মনে মনে ফোঁশে, গরজে, তড়পায়।

লেকুর কানের উপর মুখটা নিয়ে ফিস ফিস করে সেই গত কালকের কিস-সাটাই বুঝি বলল মালু। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে সকালের নাশ-তার পিঠেগুলো বের করে। একটি ভুনির হাতে গুঁজে দেয়। আর একটি মুখে পুরে দৌড দেয়। শুধু মেলা দৌড়াদৌড়ি আজ, তালতলিতে নাকি কবির লড়াই হবে, রাধাকৃষ্ণের পালা হবে, যাত্রা হবে। যাত্রায় নাকি পুরুষ মানুষ মেয়ে সাজে। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। নিজ চোখে না দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেনা মালু! পথে রাহুকে দেখে যেতে হবে, কি মজা হয়, ও যদি সঙ্গে যায়!

ওদের বাড়ির পেছনটায় সেই ডোবা মতো ছোট্ট পুকুরটার ঘাটে বসে আছে রাহু। হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পানিটা নাড়ছে আর কি যেন দেখছে। একটা মোটা সোটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল মালু। রাহুর সামনে গিয়েই টুপ করে পড়ল ঢিলটা। কয়েক ছিঁটা পানি উড়ে পড়ল রাহুর গায়ে। চমকে উঠে, বুকে আর আশপাশে থুতু ছিঁটায় রাহু। এদিক ওদিক তাকায় ভীতু ভীতু চোখে। কোথাও কিচ্ছু নেই, তবে কি ভূতের ঢিল? ভূত নাকি এমনি করে ঢিল ছোঁড়ে। রাহু তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটা টেনে দেয় মাথার উপর। যেন বাতাস থেকে টুপ করে রাহুর পাশটিতেই ঝরে পড়ে মালু। বলে, এত ভীতু তুই?

এবারও কেমন যেন গায়ে কাঁটা দেয় রাহুর। জিন-পরীর সাথে খাতির আছে নাকি মালুর? মুখটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নেয় রাহু।

হড় হড় করে বলে গেল মালু। একটু বাড়িয়ে বলল, এলাহি কাণ্ড হতে চলেছে তালতলি, মহা ধুমধাম, রাস্থ কি দেখতে যাবেনা ?

না। এমন ভাবে বলল রাস্থ, সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যায় মালু।

কেন রে ? রাস্থর মুখটা ভাল করে দেখবার জন্য একটু ঝুঁকে আসে মালু, কিন্তু ওর মুখটা দেখা যায় না। চোখে পড়ে ডোবার কালচে পানিতে প্রতিবিম্ব পড়েছে ওদের দুজনের, সেখানে রাস্থর মুখটা কেমন ভার ভার। বেজার হয়েছিস ? শুধাল মালু।

ইস্ বয়ে গেছে আমার ওনার উপর বেজার হতে। ফোঁস করে বলল রাস্থ, আর মুখটা সোজা ঘুরিয়ে আনল মালুর দিকে।

কেমন হকচকিয়ে যায় মালু। তাজ্জব হয়ে তাকায় রাস্থর মুখের দিকে। স্বরটাই শুধু বাঁকা হয়নি রাস্থর, মুখের আদলটাও কেমন বদলে গেছে ওর। কখন ? এতদিন তো চোখে পড়েনি মালুর ?

একটুকরো ভাঙ্গা পিঠে এখনো বুঝি পড়ে রয়েছে পকেটে। সেটা বের করে রাস্থর হাতে গুঁজে দেয় মালু, নে খা। খালি খালি বেজার হয়েছিস তুই।

এতক্ষণে বুঝি হাসি আসে রাস্থর মুখে। সেই টুকরো পিঠেটাকেই ভেংগে দুটুকরো করে ও। একটা টুকরো গালে পুরে বাকীটা দেয় মালুকে।

একা একা বসেছিলি কেন ? শুধায় মালু।

মাছ ধরব।

তবে নামছিস না কেন ? ওর চুলের গোছার ভেতর দিয়ে আচমকা হাতটা চালিয়ে দেয় মালু, ঘাড়টা ধরে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। পড়তে পড়তে সামলে নেয় রাস্থ, একটা পা ওর পানিতে পড়ে যায়। আঁতকে পা-টা তুলে নেয় রাস্থ। চেঁচিয়ে ওঠে, জোঁক জোঁক।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালুও পা-টা নামিয়ে দেয় পানিতে। ঝুঁকে পড়ে অনেক-ক্ষণ ধরে জোঁকের সন্ধান খোঁজে। কোথায় জোঁক। জোঁক নেই।

ঘাটটার শেষ ধাপ একটি নারকেল গাছের গুঁড়ি, তিরতিরে পানি তার গায়ে। সেদিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল রাস্থ, ওই যে, ওখানে।

খুঁটাটাকে জোরে জোরে নাড়া দিল মালু। নারকেল গুঁড়িটা একটু হেলে কেঁপে গেল। পা-টাকে সজোরে পানির উপর আছড়িয়ে আনল মালু। আবর্ত উঠল পানির গায়ে, ছলাৎ ছলাৎ লাফিয়ে উঠল পানি। এখন ঘুটুনী পেয়ে জোঁক বসে থাকতে পারে না, থাকলে নিশ্চয় বেরিয়ে আসত। পানিটা আবার স্থির হয়।

জোঁকের নাম নিশানা নেই।

আয় নাম, জোঁক নেই, ডাক দেয় মালু।

সভয়ে এক ধাপ পিছিয়ে যায় রাসু, বলে: নেই মানে, নিজ চোখে দেখলাম যে? ভাইজানের স্কুলের সময় হয়ে এল, মাছ না নিলে তাঁর খাওয়া হবে কেমন করে? কিন্তু ওই জোঁকের জন্যই তো পানিতে নামতে পারছি না। সেই কখন থেকে বসে আছি।

পা-টাকে জোরে জোরে সামনে পেছনে চালিয়ে মালু আবার ঘুঁটিয়ে দেয় পানি। ঘোলা হয়ে যায় পানিটা। তন্ন তন্ন করে দেখে মালু।

না, জোঁক নেই, আয় নেমে আয়। রাসুর কব্জিটা মুঠোয় পুরে একটা জোর টান দিল মালু।

ঘাটের উঁচু খুঁটিটা আঁকড়ে থাকে রাসু, ও কিছুতেই নামবে না পানিতে। ওর ডর দেখে সত্যি রাগ হয় মালুর, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে, এতই যদি জোঁকের ভয় তবে মাছ ধরতে আসিস কেন?

অতর্কিত চড খেয়ে মুহূর্তের জন্য সরে যায় রাসু। চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়ে কান্না। দুহাতে চোখ কচলায় রাসু।

বুঝি হকচকিয়ে যায় মালু, হঠাৎ করে কেঁদে দেবে রাসু, ভাবতে পারেনি ও। তাড়াতাড়ি রাসুর হাত দুটো টেনে নামায়, ধরে রাখে নিজের হাতে। শুধায়, খুব লেগেছে নাকি রে?

ওর নরম গলাটা বুঝি আরো অসহ্য মনে হয় রাসুর। ফোঁস করে ওঠে ও আর মালুর হাতে আঁটকে থাকা ওর দুখানি হাতের মুঠো সজোরে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। টাল সামলাতে না পেরে ঝুপ করে পানিতে পড়ে যায় মালু।

পাঁকের উপর সন্তর্পণে পা-টা টেনে চলে মালু। পুকুরটার কিনার ঘেঁসে দাম গজিয়েছে। দামের নীচে নিশ্চয়ই মাছ আছে। কিনার ধরে আস্তে আস্তে এগোয় মালু। হঠাৎ পায়ের নীচে সির সির করে ওঠে। পা-টাকে নরম কাদার ভেতর সোজা গেড়ে দেয় মালু। পালাবার ফুরসুত পায়না মাছটা। তুলে দেখে মাঝারি গোছের একটা ট্যাকি। ছুঁড়ে দেয় পাড়ের দিকে।

কী যে লাফাতে পারে টাকিগুলো। শুকনো মাটি যেন ফোসকা ফেলে ওদের গায়ে, গাটা মাটিতে লাগতে না লাগতেই তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে চলবে। রীতিমত বেগ পেতে হয় রাসুর মাছটাকে জুত করে ধরে ডুলোয় পুরতে।

দামের নীচে হাত চালিয়েই বুঝতে পারে মালু অনেকগুলো খোড়ল সেখানে। পায়ের আগা দিয়ে প্রথম খোড়লের মুখটা একটু আলগাভাবে পরীক্ষা করে দেখল ও। ছোট্ট, সরু আর তেরছা খোড়লের মুখটা, হয় সাপের, নতুবা সিঙ্গী-মাগুরের। আস্তে করে নিঃশব্দে বসে পড়ে মালু, শুধু নাকটাকে ভাসিয়ে রাখে পানির উপর। না, সাপও নয়, সিঙ্গী-মাগুরও নয়, একজোড়া কই মাছ। স্পর্শ পেয়েই কানের আর পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া করে দৌড় মেরেছে মাছগুলো। আর সেই কাঁটার উপরই চেপে বসে যায় মালুর হাতের তালু। বিষিয়ে ওঠে হাত, তবু মুঠিটা ছাড়েনা মালু, তুলে আনে পানির উপর, ছুঁড়ে দেয় রাম্নর দিকে।

ভারি পোক্ত কই। পিঠ যেমন তেলতেলে কালো তেমনি সোনালী লাল পেট। খুসি হয়ে ওঠে রাম্ন, চেঁচিয়ে বলে এগুলো আমি কুটতে দিয়ে আসি। এই যাচ্ছি আর আসছি।

ডুলাটা নিয়ে রাম্ন দৌড়ে চলে যায় বাড়ির দিকে।

বাকী খোড়লগুলো পরিত্যক্ত, মাছ নেই সেখানে। এবার মালু মাঝ পুকুরের কাঁটা ঝোপটার দিকে এগিয়ে যায়। বড় মাছ যত সবই ওই ঝোঁপের তলায়। কিন্তু সেখানে পানি বড্ড বেশি। ঠাঁই পাবেনা মালু। আর ডুব দিয়ে বড় মাছ কি ধরতে পারবে ও, ওই তালতলির জেলেপাড়ার ছেলেদের মতো?

কিন্তু অতদুর যেতে হয়না ওকে। পায়ের নীচে আর একটা বড় গোছের টাঁকি সির সির করে বেরিয়ে যায়, ওর জোড়াটা নিশ্চয় আছে ধারে কাছে। খুঁজতে থাকে মালু। হঠাৎ একটা চিংড়ি ঠাস করে ওর পায়ে বাড়ি মেরেই এক লাফে সটকে পড়ে।

দাঁড়িয়ে যায় মালু। একটুও যাতে শব্দ না হয়, আলোড়ন না জাগে পানিতে, তেমনি সতর্কতায় ধীরে ধীরে পা-টা ঘুরিয়ে আনে কাদার উপর দিয়ে। আর দুহাত পানির উপর রেখে এক-পায়ে শক্ত হয়ে থাকে ওর শরীরটা। এমনি করে কাদার উপর পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুঝি অনেকক্ষণ চলে যায়। উঠেই আসছিল মালু, হঠাৎ পায়ের নীচে একটু খরখরে শক্ত মত কি যেন বাধল। হুঁ, বুঝতে পেরেছে মালু। টুপ করে ডুব দেয় ও, দু হাতে চেপে ধরে শক্ত বস্তুটাকে। তারপর দমটা ছেড়ে দেয়, আপনি আপনিই ভেসে ওঠে ওর শরীরটা। ইতিমধ্যে শক্ত বস্তুটা বের করে দিয়েছে ওর সাঁড়াসির মতো লম্বা ঠ্যাং যে ঠাংয়ের তীক্ষ্ণ নখ অংকুশের মতো বিঁধে গেছে মালুর হাতের চামড়ায়। উহ্ কী অসহ্য কামড়, গায়ের গোশ্‌ত বুঝি তুলে নিয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ কামড়টা ছেড়ে দিয়ে মাছটা লেজ আর মাথা এক করে ঝপাং ঝপাং ঝাপটা মারতে থাকে। পানি কেটে সেই লেজের ঝাপট কোন কাঁটা পরা হাতের চড়ের মতোই ঠাস ঠাস করে এসে বাজছে মালুর হাতের পিঠে। বুঝি একেবারে ঝাঁঝঁরা করে দিল ওর হাতের চাম। পানির উপর তুলে মালু তো অবাক, ইয়া বড় চিংড়ি। এত বড় চিংড়ি অনেকদিন দেখেনি ও। পানির ভেতর সব মাছেরই জোর থাকে, তাই বলে এত বড় মাছ, কল্পনাও করতে পারেনি ও। ও মা, কতবড়, কতবড় চিংড়ি, খুশিতে পায়ের উপর যেন নেচে ওঠে রাম্নু। ছুঁড়বিনা, ছুঁড়বিনা—উঠে আয়, রাম্নু চেঁচায়।

দু হাতে ঠ্যাং শুদ্ধ চিংড়িটাকে যেঁতে ধরে উঠে আসে মালু। ঠিকই বলেছে রাম্নু, অতবড় চিংড়িটাকে ছুঁড়ে পাড় অবধি হয়ত পাঠাতে পারতনা মালু। ডুলার মাঝে ধরেনা চিংড়িটা। তিন গিঁটের প্রায় দেড় হাত লম্বা ঠ্যাং, সে ঠ্যাংয়ের মুখে শলার মত তীক্ষ্ণ লম্বা নখ, সাহস পায়না রাম্নু, ওটাকে হাতে ধরতে। শক্ত মত একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেয় মালু, ঢেলার বাড়ি মেরে মাছটার নখের আগাগুলো ভোঁতা করে দেয়, বলে, যা, নিয়ে যা।

দৌড়ে চলে যায় রাম্নু।

ও রকম সুন্দর আর দুর্লভ চিংড়িটা ধরতে পেরেও কেন যেন খুশির খোঁজ পায়না মালু। কেমন যেন হয়ে গেছে রাম্নুটা। মক্তবে যায়না, সেও বুঝি মাসের উপর হয়ে গেল। এদিকে আবার শাড়ি ধরেছে। কি বিশ্রী দেখায় ওকে শাড়িতে। না পারে সামলাতে, না পারে গুছিয়ে পরতে। তার উপর যেতে চায়না তালতলিতে। এই তো সেদিন ভট্চার্যি বাবুদের বাড়িতে কি একটা পুজো ছিল। ওরা দুজনই গিয়েছিল। পেট পুরে পেসাদ খেয়েছিল। আর আজ বলে কিনা যাবেনা? কি হল রাম্নুর? ভেবে কোন কিনারা পায় না মালু।

একটা কলা গাছের আড়ালে আসে মালু। এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে খুলে ফেলে ভেজা হাফ প্যান্টটা। ভালো করে চিপে নিংড়িয়ে পানিটা ঝরিয়ে দেয়, আবার পরে নেয় প্যান্টটা। গেঞ্জিটা চিপে বিছিয়ে রাখে পিঠের উপর। তার পর আগের যায়গাটিতে এসে বসে পড়ে। ভেজা প্যান্টের কুঞ্চনগুলো টেনে টেনে ঠিক করে আর ভাবে এত মোটা কাপড় প্যান্টের, তালতলি যেতে যেতে শুকালে হয়। কাঁধের উপর স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ফেরায় মালু। দুষ্টু হাসি রাম্নুর মুখে।

তুই রেগেছিস? শুধাল রাম্নু।

যাহ্, মুখটা ঈষৎ বেঁকিয়ে বুঝি আগের ভাবনাটায় মন দেয় মালু। হাসিটাও কেমন বদলে গেছে রাসুর। এইমাত্র যে হাসল, সে কি রাসু?
মক্তবে যাসনা কেন? ওর দিকে না তাকিয়েই শুধাল মালু।
বুঝি গম্ভীর হয়ে যায় রাসু। কি যেন ভাবে। আপনিই যেন নত হয়ে আসে ওর মুখখানি, কেমন ধীর টানে বলল, বড় হয়েছি না?
সহসা সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল মালুর কাছে। রাবুদের মতো রাসুরও পর্দার সময় হয়েছে। তাই মক্তবে যায়না। শাড়ি ধরেছে। তালতলি যাবেনা! অকস্মাৎ মনে হয় মালুর, অনেক দূরে সরে গেছে রাসু, পর হয়ে গেছে রাসু। আজ তবু চেনা যায় ওকে, আসছে কাল হয়ত চেনাই যাবেনা। কিন্তু মালু? সেও তো বড় হচ্ছে। কই, ওর তো এমনি করে বদলে যাওয়ার কথাটা মনে হয়না? মালু তাকায় রাসুর দিকে, সত্যি বড় হয়ে গেছে রাসু, শাড়ি পরে অনেক বড় দেখাচ্ছে ওকে।
তা হলে তো বিয়ে হবে এবার! ফস করে মালুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা।
রাঙ্গা হয়ে ওঠে রাসুর মুখ। চুপ করে মালুর পিঠে একটা কিল মেরে উঠে যায়, দৌড় দেয় বাড়ির দিকে। দৌড়তে দৌড়তে একটু থামে, পেছন ফিরে বলে: কাল আসিস, ওই কুল গাছটার তলায়। চুপি চুপি আসবি, কেউ যেন না দেখে।
রাসুর সাথে দেখা করতে হবে গোপনে? সব যেন গুলিয়ে যায় মালুর। গেঞ্জিটা কাঁধে চড়িয়ে উঠে পড়ে মালু। মিঞাদের মসজিদের সুমুখ দিয়ে দখিন ক্ষেতে পড়ে। দখিন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল কেমন ঝাপসা সব কিছু, ও যেন স্পষ্ট দেখছেনা কিছুই। কখন পানিতে ভরে গেছে ওর চোখজোড়া।
কান্নাটা মালুর কাছে অতি সহজ আর মামুলি। মায়ের মার খেয়ে অহোরাত্র গলা ফাটিয়ে কাঁদতে হয় ওকে। কিন্তু, আজকের কান্নাটা যে কেন, নিজেই বুঝতে পারেনা মালু। আরও অদ্ভুত, আজকের কান্নায় দুঃখ নেই। কি যেন কথা, যা ও বলতে পারেনা, বুঝতেও পারেনা স্পষ্ট করে, সে সব কথাই যেন চোখের পানি হয়ে ঝরে পড়ছে। আর কেমন আরাম পাচ্ছে মালু।

বাকুলিয়া আর তালতলি। পাশাপাশি দুটো গ্রাম।

দু গ্রামকে ফারাক করে রেখেছে বিস্তীর্ণ এক শস্যক্ষেত। পাশ তার পোয়া মাইল। লম্বায় মাইলেরও ওপর। বাকুলিয়ার দক্ষিণে, তাই ক্ষেতটার নাম দখিন ক্ষেত। আর তালতলির মানুষরা বলে উত্তুরের ক্ষেত।

বাকুলিয়ার প্রবেশ পথে সৈয়দ বাড়ির সদর ফাটক আর বেরুবার পথে মিঞা বাড়ির মসজিদ। দুটো খানদানী বাড়ি দুই প্রহরীর মতো গোটা গ্রামটিকে যেন হাতের বেষ্টনে ধরে রেখেছে। মিঞা বাড়ির মসজিদের লাগ বড় পুকুরটার সীমানা থেকে শুরু হয়েছে দখিনের ক্ষেত। ক্ষেতের ওপারে তালতলির দত্তদীঘির দীর্ঘ তাল বীথি, তালতলির প্রবেশ তোরণ।

সোনার চেয়েও দামী পূর্ববঙ্গের মাটি। কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা ফলে এ মাটিতে। পুস্তক কিতাবের লেখা নয়, দখিন ক্ষেতে যারা লাঙ্গল চালায় তারাই জানে কত উর্বর সোনা-ফলা এ মাটি। বছরে ধানী ফসল ওঠে দুটো, চৈতী ফসল ওঠে এন্তার। কখনো খালি পড়ে থাকেনা এ জমি। কখনো ধান, কখনো বা সরিষা মুগ কলাই খেসারি, গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ আর সবুজ বুকে নিয়ে সন্তানবতী নারীর পুষ্ট বক্ষের মত ভরে থাকে দখিনের ক্ষেত।

দখিন ক্ষেতের বুক চিরে চলে গেছে বড় খাল, তালতলিকে বেড় দিয়ে বারগনিয়া চাটখিলের দিকে। তারপর সুলতানপুর, উদরাজপুর গ্রামগুলোকে চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে পড়েছে মেঘনায়। এই বড় খালটায় এসে মিশেছে তালতলি বাকুলিয়ার গাঙ, ছোট ছোট খাল আর অজস্র নালা। বিরাট বটের অসংখ্য শিকড় যেমন একেঁবেকেঁ মাটির ভেতর ছড়িয়ে যায়, মাটির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ধরে রাখে বিশাল মহীরুহকে, রস সিঞ্চন করে প্রতিনিয়ত, তেমনি ওই গাঙ আর ছোট ছোট খালগুলো তালতলি বাকুলিয়াকে ধরে রেখেছে অসংখ্য বাহুর আলিঙ্গনে। রসে ভরে যায় তালতলি বাকুলিয়ার মাটি, বৃষ্টি বন্যার পানি আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দু গ্রামের স্বাস্থ্যশ্রী। আর বর্ষার মরসুমে, শীতের শুরুতে মাছ দেয় অঢেল। পুকুর পাড়ের গাব গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ফেলু মিঞা। দৃষ্টি তার প্রসারিত দখিনের ক্ষেতে। পুকুরটির পূব পাড় থেকে একটা সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে গিয়ে উঠেছে তালতলির তালবীথি ছায়া পথে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলু

মিঞা ধীরে ধীরে নেমে আসে রাস্তাটায়। হাত জোড়া পেছনে কোমরের উপর কেঁচির মতো আড়াআড়ি রেখে আনত মুখে হেঁটে চলে।

কিছুদূর এগিয়ে ফেলু মিঞা উদাস চোখে তাকায় সামনের দিকে যেখানে একটি রূপোর সুতোর মতো চিক চিক করছে বড়খাল। ওই খালের এপার ওপার একদা সবটাই ছিল মিঞাদের সম্পত্তি। তালতলি চাটখিল সুলতানপুর এ সব গ্রাম ছিল মিঞাদেরই জমিদারীর অংশ। কিন্তু, কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায় সে ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলু মিঞা। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পুনর্বার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিলনা তাদের দুর্ভাগা পূর্বপুরুষদের হাতে। ছিলনা তেজারতী কারবারে নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি। তাই ত্রিপুরার মহারাজার অধীন কয়েকটা পত্তনী আর বন্দোবস্ত নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই অভাগা পূর্বপুরুষদের। পরে সেই পত্তনী বন্দোবস্ত-গুলোও একের পর এক হাতছাড়া হয়েছে।

খালের ধারটিতে পৌঁছে ফেলু মিঞা একবার পেছন ফিরে তাকায়, তাদের পুকুরের সেই গাব গাছটিকে ছোট একটা ঝোপের মত দেখায় এখান থেকে। এই তো সেদিনও আব্বাজান বড়ো মিঞার আমলে খালের এ পারের ভুঁইগুলো ছিল তাদেরই তালুকভুক্ত, কিছু ছিল খাস দখলি। এক নাগাড়ে দশ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগিরি করে গেছেন আব্বাজান বড় মিঞা। কি তাঁর প্রতাপ! কত তার রব-রোয়াব! জমিদার না হয়েও ক্ষমতা রাখতেন জমিদারের মতো। আর আজ? দখিন ক্ষেতের ষোল আনার দু আনাও মিঞাদের হাতে আছে কিনা সঠিক করে বলতে পারেনা ফেলু মিঞা।

তালুক পত্তনী, ও সব দিয়ে কি হবে? ছেলেরা বিদ্বান হোক, মানুষ হোক, বলতেন বড় মিঞা। আর একটার পর একটা তালুক বেচে গিয়েছেন ছেলেদের শহুরে জীবন ধারার অন্তহীন চাহিদা মেটাতে।

সাঁকোর উপর পা রেখে আর একবার পেছনের দিকে তাকায় ফেলু মিঞা। আলঘেরা ক্ষেতের পর ক্ষেত। এসব খালের এপার ওপার সবটাই, সবটাই কত পুরুষের সম্পত্তি মিঞাদের! ওই তো ডান দিকে তিন নম্বর তালুকের সীমানা, যে তালুকটা আব্বাজান বড় মিঞা বেচে গিয়েছিলেন রামদয়ালকে। বাঁয়ে সাত নম্বর। ওটা তামাদী হয়েছিল। রামদয়ালই নীলাম ডেকেছিল। আর সুমুখেরটা মৌজা সুলতানপুরের চৌদ্দ নম্বর তৌজি, ধড়িবাজ রামদয়াল

লাহা ষ্টেটের নায়েবকে ঘুস দিয়ে আট হাজার টাকার সম্পত্তিটা। স্রেফ দুহাজারেই গাপ করেছে। সাদাসিধে আর সাফদিলের মানুষ আব্বাজান বড় মিঞা, টেরই পেলেন না কেমন করে রাতারাতি বেহাত হয়ে গেল সম্পত্তিটা। স-ব, গোটা দখিন ক্ষেতটাই এখন ওই মালাউনের বাচ্চা রামদয়ালের পেটে। অনুপস্থিত সেই রামদয়ালের উদ্দেশ্যেই যেন একবার কটমটিয়ে তাকাল ফেলু মিঞা।

সঙ্গে সঙ্গেই রাগটা ঘুরে গিয়ে পড়ল শহরবাসী নাফরমান ভাইগুলোর উপর। তিন তিনটি ভাই তালুক বেচা পয়সায় মানুষ হল, অথচ একটি পয়সা যদি দেয় দেশের বাড়িতে। যদি একটু সাহায্য করত ওরা, বেশি না তিরিশটি করে তিন ভাই মিলে যদি মাস মাস নব্বইটি টাকা পাঠাত দেশে, তাহলে ...তা হলে দেখিয়ে দিত সে যে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা। বুদ্ধি আর টাকার খেলে ঘোল খাইয়ে ছাড়ত ওই রামদয়ালকে। অন্ততঃ তিন নম্বর আর সাতনম্বর তালুকটা যে উদ্ধার করতে পারত রামদয়ালের খপ্পর থেকে এতে এতটুকু সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার।

এসে পড়েছে তালতলি। দত্তদীঘির পাড়ের মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে। তালদীঘির ওপার থেকে উঁকি দিচ্ছে রামদয়ালের দোতলা দালান। ওই দালানটার উপর নজর পড়তেই যেন বিছুটির বিষে সারা গাটা জ্বলে গেল ফেলু মিঞার। আর ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে অভিসম্পাত, ধিক্কার-অপদার্থ পূর্ব পুরুষদের প্রতি। যদি থাকত তাদের এতটুকু দূরদৃষ্টি, এই হাল হত মিঞা বাড়ির? মরহুম আব্বাজান বড় মিঞা, (আত্মার তাঁর মাগ-ফেরাত হোক) তাঁকেও ক্ষমা করতে পারেনা ফেলু মিঞা। সব গিয়েটিয়ে সায়-সম্মানে বাঁচার মত যাও ছিল সে সবও বেচে বিলিয়ে একেবারে ফতুর করে রেখে গেছেন মিঞা বাড়িটাকে। আঃ, আব্বাজান।

সেই আট বছর বয়সে দেখা ছবিটা এখনো ভেসে ওঠে মিঞার চোখের সুমুখে। শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র কেশ, সৌম্য-দর্শন সুপুরুষ, সে বছরই কনিষ্ঠ সন্তান ফেলু মিঞার মাথায় আশীর্বাদের হাতটা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বাকুলিয়ার বড় মিঞা। শেষ বয়সে কী যে ভীমরতি ধরেছিল আব্বাজানের, ওই শালা মালাউনদের পাল্লায় পড়ে গেলেন খেলাফতে স্বদেশীতে, জেলখাটলেন দুই দুইবার। জেলেই তো ভাংলো শরীরটা। আর ওই সুদখোর রামদয়ালটা, সেই ফাঁকেই তো বেহাত করে নিল মোটা মোটা সম্পত্তিগুলো। আর বড় মিঞার সেই অপরিনামদর্শিতার ফলটা ভুগতে হচ্ছে আজ ফেলু মিঞাকে, মিঞার মত বাঁচার সামর্থ্য নেই তার।

কী বোকামীই না করে গেছেন আব্বাজান! সাহেব বানিয়ে গেছেন ছেলে-গুলোকে। সাহেব না হাতী, ইংরেজের নফরদারী। একজন করেন ডেপুটী-গিরী, একজন কলেজের মাষ্টার, সেজো জন বিলেতী কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। স্থ-স, মুনিবের পা-ই যদি চাটবি, ইংরেজের নফরদারীই যদি করবি তবে কেন মিঞার ঘরে জন্মেছিস?

আর গোলামী করে করে কেমন ছোট হয়ে গেছে ওদের নজরটা। বছর পাঁচ আগের কথা। ফেলু মিঞা গেছিল বড় ভাই ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোলকাতার বাড়িতে। অনেক কাকুতি মিনতি করে, অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চেয়ে ছিল, বেশি না, মোটে হাজার দুই টাকা। শুনে তো আঁতকেই উঠেছিল বড় ভাই। বলেছিল, কোথায় পাব অত টাকা?

কি করবি, তুই টাকা দিয়ে?

আগরতলার মহারাজা কিছু জমিদারী সত্বের বন্দোবস্ত দিচ্ছে। তা লাগবে তো অনেক টাকা। কিন্তু তার আগেই যে কিছু টাকা ঢালতে হবে মহারাজার কাছারিতে। নায়েব মশায়ের সাথে সে সব বন্দোবস্ত না করেই কি শহর অবধি ছুটে এসেছে ফেলু মিঞা? সব বন্দোবস্ত পাকা। শুধু হাজার আটেক টাকা কাছারির ডালিডুলি, নজরানার খরচা হবে। সত্বটা লেখা হয়ে যাবে ফেলু মিঞার নামে, অথবা ওদের চার ভাইয়ের নামে। ব্যস। বাকী টাকা সে পঞ্চাশ হাজারই হোক আর লাখই হোক, সে জন্য পরোয়া করেনা ফেলু মিঞা। একবার জমিদারী সত্বটা পেয়ে গেলেই কিস্তি কিস্তি টাকা দেবে, কিছু এধার ওধার করবে। কত ঘুঁটির খেল, কত ফাঁকফুঁক এ সব কাজে, সে কি আর জানেনা ফেলু মিঞা?

তা আট হাজার টাকার সবটাই তো আর ভাইদের কাছে চাইছেনা ফেলু মিঞা! বড় মিঞা দু হাজার, মেজো মিঞা এক, সেজো মিঞা এক—মোট চার হাজার। বাকী চার হাজার ফেলু মিঞাই চালিয়ে নেবে। একি খুব বেশি চাওয়া হচ্ছে মিঞা বাড়ির ইজ্জত-হুরমতের নিশান, বরদার বড় মিঞার বংশধরদের কাছে?

সব শুনে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়েছিল মিঞা বাড়ির বড় মিঞা, হালে ইংরেজ কাছারির হাকিম। হাসি থামিয়ে বলেছিল: ওসব ফাজলামো রেখে জমিজমা কিছু বিক্রী করে চলে আয় কোলকাতায়। একটা দোকান করে দেব তোকে। সেই দোকান নাড়াচাড়া করতে করতে চাই কি একদিন মস্তবড় ব্যবসায়ী বনে যাবি।

শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল ফেলু মিঞা, এই কি মিঞা বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তানের কথা? শেষ পর্যন্ত মিঞাবাড়ির ছেলে দোকানদার হবে? ছিঃ ছিঃ। কোত্থেকে একটা রাগের হলকা এসে যেন ঝলসে দিয়েছিল ফেলু মিঞার গোটা শরীরটা। মুখ তুলে বড় ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে বিণীত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল ফেলু মিঞা: ভাই সাহেব। বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনার কথা শুনে মিঞা বংশের স্বর্গীয় আত্মারা পর্যন্ত দুঃখ বেদনায় লজ্জায় মুখ ঢাকছে। থাক, আমি আর কথা বাড়াবনা। নফরদারীর মর্য্যাদা নিয়ে শহরে সুখে স্বচ্ছন্দেই বসবাস করুন আপনারা, বাড়ির লুপ্ত গৌরব এই ফেলু মিঞা একাই পুনরুদ্ধার করবে। যদি বেঁচে থাকেন ইনশাল্লাহ দেখবেন।

কথাগুলো মনে পড়ায় অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চের কম্পন অনুভব করল ফেলু মিঞা। মনে হয় মাথার চুলগুলো তার দাঁড়িয়ে পড়েছে আর এক ঝলক গরম রক্ত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তীব্র বেগে দৌড়ে গেল।

স্কুলের নয়টা ধাপ পেরিয়ে দশমটাতে পৌঁছাতে পারেনি ফেলু মিঞা।

তবু সেদিন কেমন করে ওই কথাগুলো গুছিয়ে গাছিয়ে বলেছিল ভাবতে গেলে আজও তাজ্জব বনে যায় ফেলু মিঞা। অবশ্য বড় ভাই ঠাট্টা করে সেদিনও বলেছিল, আজও বলেন, আমাদের ফেলু চটে গেলে কেমন চোস্ত্ বাংলা বলে দেখেছিস? এর সাথেই ফোঁড়ন কেটেছিলেন মেজো মিঞা, হুঁ, ঠিক যেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। নো, নো, বিদ্যাসাগরের আনহজ্ঞ এডিশন, ক্যাশিয়ার ভাই গলা বাড়িয়ে যোগ করেছিলেন। তারপর ফেলু মিঞার বুকের তাজা ঘায়ে বস্তা বস্তা লবণ ছিঁটিয়ে তিন ভাই হো হো করে হেসেছিল!

পাঁচ বছর আগে কত বড় মুখ করে কথাগুলো বলে এসেছিল ও। এই পাঁচ বছরে সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্পে কতদূর এগিয়েছে ফেলু মিঞা? শাঁ করে কোত্থেকে যেন তীরের মত ছুটে আসে প্রশ্নটা, এফোঁড় ওফোঁড় করে যেন দু ভাগে কেটে দিয়ে যায় ফেলু মিঞার বুকের ভেতরটা।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আশানুরূপ না হলেও কিছুদূর, অনেকদূর এগিয়েছে বই কি ফেলু মিঞা। আজকের এই দিনটি সেই অগ্রগতিরই এক ফলক-চিহ্ন হয়ে থাকবে। তাই তো মনে করছে, আশা করছে ফেলু মিঞা। বাকী খোদার মর্জি। মনে মনে সেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে মাথা নত করল ফেলু মিঞা আর দত্তদীঘির উঁচু পাড়ে পা রাখবার আগে যেন পিছুটান খেয়েই মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিল দখিন ক্ষেতের দিকে। দখিনের ক্ষেত, এখন সেটা উত্তরের ক্ষেত, কাঁচা পাকা শস্যে অথবা উদলা বুকে সবুজ হলুদ আর মাটি রংয়ে চিত্রিত দেহটি এলিয়ে

দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। কি এক নিগূঢ় হাতছানি সেখানে, যেন ডাকছে ফেলু মিঞাকে, বলছে তার যাদুভরা কণ্ঠে—আমার এ সম্ভার, সবই তোমার, সবই তোমার। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলু মিঞার বুক চিরে কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসে। দত্তদের বৈঠকখানার দিকে দ্রুত পা চালায় ফেলু মিঞা।

আরে আসেন আসেন। মিঞার বেটার পায়ের ধূলো আমার বাড়ি? কী সৌভাগ্য! দু কদম এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে রামদয়াল।

প্রতি আদাব দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে ফেলু মিঞা। কিন্তু ভেতরটা তার জলতেই থাকে, মিঞারা কোনদিন ভুলেও পা ফেলেনি দত্তবাড়ি আর আজ ফেলু মিঞা যেচে এসেছে। ফেলু মিঞা সেই খোঁটাটাই খুঁজে পেল রাম-দয়ালের অভ্যর্থনায়।

রমজান আগেই এসেছিল ফেলু মিঞার আগমন বার্তা নিয়ে। তাই ডাবের পানি, চা বিস্কুট প্রস্তুত রেখে অপেক্ষা করছিল রামদয়াল।

ডাবের পানিটা নিঃশেষ করে আলবোলার নলটা টেনে নেয় ফেলু মিঞা। এ তার নিজস্ব আলবোলা। একমাত্র আত্মীয় বাড়ি ছাড়া যখন যেখানে যায় হুঁকোটাও সঙ্গে যায় ফেলু মিঞার। কখনো বা তার আগেই এসে পড়ে হুঁকোটা। এটা মিঞা আভিজাত্যের প্রাচীন রেওয়াজ।

'মুসলমান ডাবায়' নিজের জন্য তামাক সাজাতে সাজাতে কথাটা পাড়ে রমজান —দয়াল মশায় তালুক তো আপনার অনেক, একখানা আমাদের দিন।

ভনিতা ব্যাখ্যা পূর্বাহ্ণেই সারা। ভাবার যা সে আগেই ভেবে নিয়েছে রামদয়াল, বলল: সাত নম্বর তো? দশ হাজার।

আলবোলার নলটা বুঝি মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ফেলু মিঞার। নিজের কানটাকেই যেন বিশ্বাস হয়না তার। তিন হাজার টাকায় যে তালুক নিলাম ধরেছে রামদয়াল, পনেরো বছর ভোগ করেও তার দাম হাঁকছে দশ হাজার?

বহুত বেশি চাচ্ছেন, কিছু কমিয়ে দিন। ডাবাটা মুখের কাছে এনে বলল রমজান।

একটু যেন ভাবল রামদয়াল। বুঝি ভেবেচিন্তেই বলল: ফেলু মিঞার সামনেই বললেন আপনি। না করতে পারি? আচ্ছা নয় হাজারই দিন।

আকাশপাতাল ভাবনা সুঁই চালায় ফেলু মিঞার মগজে। ধান বেচে, চাকলা রোশনাবাদের যে তিনটি তালুক এখনো হাত ছাড়া হয়নি সেখানকার প্রজাদের

এক রকম জোর জুলুম করে বাকী বকেয়া আদায় করে হাজার সাতেক টাকা জোগাড় করেছে ফেলু মিঞা। অভ্যস্ত আরামগুলোকে হারাম করে রূহ্‌টাকে নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করেই টাকাটা জমিয়েছে ফেলু মিঞা। এর বেশি এক আধলাও আর সংগ্রহ করা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। রামদয়ালের সাথে দর দস্তুর করতে ফেলু মিঞার মর্যাদায় বাধল, সংক্ষেপে বলল, ভেবে দেখি।

উঠি উঠি করেও এক কথায় দু কথায় আলাপ জমে যায়। তালুক পত্তনিতে কি আর সে সুখ আছে? বাড়ি বাড়ি ট্যা ট্যা করুন, তাগিদ দিতে দিতে মাথাটা ঝালাপালা করুন, পায়ে ফোস্কা ফেলুন, তবু কি পাবেন খাজনা? ওই যে আপনাদের গ্রামের রসুন আলির পোলা ফজর আলি, কত করে বললাম, দে বাবা, চার বছরের বাকী অন্ততঃ দু বছরেরটা উসুল দিয়ে রাখ, তা কি বলে শুনবেন? বলে, ঘ্যানর ঘ্যানর, করবেন না দয়াল মশায়। হাকিম আছে আদালত আছে, নালিশ করুন গিয়ে। থেমে একটা বিড়ি ধরায় রামদয়াল। বলল আবার—থুক মারেন তালুকের কপালে। তালুক না গলার ফাঁস।

সেই দিন কি আর আছে দয়াল মশায়? হুঁ, জমিদারী তালুকদারী, সে এক সময় মিঞারা চালিয়েছে বটে দেখেছি। পেয়াদা পাঠিয়েছে, বেঁধে এনেছে। চোখ একবার তুলেছে, কি চাবকিয়ে শেষ করেছে। ছোট লোকের জাত, পিঠ যে তাদের হামেশাই সুড় সুড় করে চাবুকের জন্য। সে তো আপনারা বুঝবেনও না, শাসনটাও ছেড়ে দিয়েছেন আজকাল। রামদয়ালের কথাটাকে আর একটু টেনে বলল রমজান।

ফেলু মিঞা সাহেব, তার চেয়ে এক কাজ করুন আপনি। কিছু জমি কিনে নিন, ট্রাক্টার এনে ভাল করে চাষ করুন। ধান পাট গেওয়ারী সব ফসলেরই দর আছে আজকাল। আর যা অবস্থা তাতে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ একটা লাগবেই। তা হলে তো কথাই নেই, ধান চাল মানেই কাঁচা সোনা, টাকা রাখবার যায়গা পাবেননা তখন। পরামর্শ দেয় রামদয়াল। হিসেবী লোক রামদয়াল! তালুক জোত তার কম নয়। কিন্তু মহাজনী তেজারতিটাই আসল পেশা, পূর্বপুরুষদের পেশাও বটে। তা ছাড়া দত্তের বাজারে অর্ধেক শরীক, দোকান, মহকুমা সহরে ধান চাল মশলার পাইকারী কারবার। ওতেই টাকা ঢালে রামদয়াল। ওতেই মুনাফা অঢেল, নগদানগদি। ইতিমধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের হিসাবটাও করে ফেলেছে রামদয়াল।

মুখটা লাল হয়ে ওঠে ফেলু মিঞার। রামদয়াল ওকে চাষ করতে বলছে?

বেটা সুদখোর মালাউন, মিঞার ছেলেকে চাষা বানাতে চায়? হারামখোরিতে পয়সা বানিয়ে এত স্পর্ধা হয়েছে ব্যাটার?

আর একটু তামাক টানতে ইচ্ছে করে ফেলু মিঞার। সামনের দরজা দিয়ে একটা ছেলেকে যেতে দেখে বলে, এই—এই ছেলেটা। নাম কি না ওর! দে তো একটু তামাক সাজিয়ে।

আনমনে চলছিল মালু। হাত দুটো গোঁজা হাফ প্যাণ্টের পকেটে। রমজানের উপর মনটা তার কোনদিনই প্রসন্ন নয়। দুরমতিকে ছেঁকা দেয়ার পর থেকে ফেলু মিঞার উপরও মালু বিরক্ত। আড় চোখে একবার দেখল মালু। বুঝল তাকেই তামাক সাজতে ডেকেছে ফেলু মিঞা। মিনিট খানিক বুঝি নীরবে তাকিয়ে রইল। তার পর বলল—আমি কি চাকর নাকি?

শুনলেন তো, শুনলেন তো 'বান্দির পুতের' কথা? তিন লাফে বেরিয়ে আসে রমজান।

থতমত খেয়ে যায় মালু। হাত দুটো এখনো প্যাণ্টের পকেটে আটক। পকেট ভর্তি মিস্তির বাড়ির আমলকি। কতটা হবে তাই পকেটে হাত রেখে গোপনে গুনে গুনে দেখছিল ও। রমজান প্রায় এসে পড়েছে, এখুনি বুঝি ধরে ফেলবে ওকে। মালু দেখল দৌড়ে পালাবার উপায় নেই। কোন দিকে দেখবারও অবসর নেই। তর তর করে উঠে গেল ও সুমুখের সুপুরি গাছটায়। বেআদব পোলা, আছাড় মেরে তোর নাড়িভুঁড়ি বের করব একদিন। নীচে থেকে দাঁতমুখ খিঁচোয় রমজান। আর খামোখাই তড়পায়, হাত পা ছোঁড়ে। চিকণ আর পিছল সুপুরি গাছটা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে মালু। বুক ঘেঁসে ঘেঁসে উপরে ওঠে। বুকটা বুঝি ছড়ে যায়, একটু জ্বালাও টের পাচ্ছে মালু। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করলে চলবে না। একটু বেখেয়াল হয়েছে কি ধড়াম করে পড়বে ওই ইট আর ঝামার টুকরো ছড়ানো মাটিতে; নতুবা গাছের পিছল দেহটার উপর দিয়ে ছচ্ছড় করে গিয়ে পড়বে একেবারে রমজানের মুঠোয়, এখনো তো দাঁড়িয়ে আছে রমজান সাক্ষাৎ আজরাইলের মতো।

মালুর ছোট্ট শরীরের দৃঢ় আকর্ষণে আর বাতাসে দোল খায় চিকণ সুপুরি গাছটা। মালু চেয়ে দেখল আগার দিকটা বড় আম গাছটার ডাল থেকে মোটে দু হাত দূরে। কিন্তু এত সরু সুপুরি গাছের আগাটা মালুর ভার সইতে পারবে তো? আস্তে আস্তে সেই সরু আগাটায় উঠে এল মালু। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টাল খেল মালু, আর সুপুরি গাছের সরু আগাটা বেঁকে এল আম গাছটার দিকে। খপ করে ধরে ফেলল মালু আম গাছের

ডালটা, শরীরটাকে একেবারে হাল্কা করে উল্টো লাফে চড়ে বসল ডালের ওপর। আম ডালে বসে হাঁপাতে থাকে মালু। গা-টা ওর কাঁপছে। আর একটু হলেই হাতটা তার ফসকে গেছিল আর কি। আর ফসকালে…? একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল মালু।

দাঁত মুখের খিঁচুনিটা বন্ধ করে উপরের দিকে চেয়ে আছে রমজান। চোখ তার ছানাবড়া। ছেলেটার দুঃসাহসিকতায় তারও বুকটা বুঝি ঢিপ ঢিপ করছে।

হারামজাদা বান্দির 'পুত'। গালিটা ছুঁড়ে ব্যর্থ ক্রোধের জ্বালাটা লাঘব করে রমজান। পা বাড়ায় রামদয়ালের বৈঠকখানার দিকে।

ঠিক আন্দাজ করে পর পর দু মুখ থুতু নীচের দিকে ফেলে দেয় মালু। দু মুখ থুতুই 'থক' করে রমজানের ঘাড়-খোলা কামিজ আর চুলের মধ্যবর্তী যায়গাটুকুতে পড়ে লেপে যায়।

ছি ছি ছি তড়িতাহতের মতো বৈঠকখানার দিকে দৌড়ে যায় রমজান। রামদয়াল হাসে।

ফেলু মিঞা সিগারেট ধরায়।

শা…লা…কর্ণওয়ালিস…নাফরমান ইংরেজের বাচ্চা…ব্যাটা মালাউন, বলে কিনা চাষ করুন? উত্তরের ক্ষেতে পা রেখে দাঁতে দাঁত চেপে অনেকটা স্বগতোক্তিতে বলে ফেলু মিঞা।

কর্ণওয়ালিসের নামটা মুনিবের কাছেই দু চারবার শুনেছে রমজান। অন্য কোথাও কখনো শোনেনি। তবে নামটা যে কোন ইংরেজের সেটা মুনিবের কথা থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছে ও। কিন্তু সেই কর্ণওয়ালিসের সাথে মুনিবের যে ঠিক কোথায় এবং কি ধরনের সংঘর্ষ সেটা আজও অজ্ঞের রমজানের কাছে। মালাউন বলতে কাকে বোঝায় ফেলু মিঞা সেটা রমজান জানে। তাই মুনিবের শেষের কথাটাই আমল করে রমজান। গলাটাকে বেশ উঁচিয়ে বলে: হারামখোরী করে তিন পুরুষ ধরে খালি টাকাই জমিয়েছে। টাকার গরমে কি আর মানুষকে মানুষ কয়?

কি রকম চশমখোর! আরে নিলাম ধরলি তিন হাজারে, এখন কোন্ শয়মের মাথা খেয়ে দশ হাজার চেয়ে বসলি? মুনিবের চিন্তাগুলোরই প্রতিধ্বনি করে রমজান। পুরুষ পরম্পরায় মিঞাদের সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে এ বিদ্যাটি বুঝি পুরোপুরিই রপ্ত রমজানের।

এই বাংলা দেশটা, তামাম হিন্দুস্তানটা কাদের ছিল জান? স্বরটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ করে আর মুখটা রমজানের দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলু মিঞা। প্রশ্নটা শুধু আকস্মিক নয়, কিছুটা দুর্বোধ্যও। তা ছাড়া এ ধরনের ব্যাপার একটুও খেলে না রমজানের মাথায়। তবু ভড়কে না গিয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধিটা খাটিয়ে বলল, তা আর জানি না?

সেই যে আকবর বাদশা, তামাক হিন্দুস্তানের বাদশা ছিলেন। আর ওই যে নবাব আলিবর্দী, তিনি ছিলেন সুবে বাংলার হর্তাকর্তা মালিক। তাঁদেরই বংশধর আমরা, এই দেশ তো আমাদের। নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিয়ে চলে ফেলু মিঞা। কিন্তু ওই শুয়োরখোর ইংরেজ? কেড়ে নিল আমাদের বাদশাহী তখ্ত। বাদশার জাত, আমরা এখন ভিখিরীর জাত। পোয়া বারো, ওই মালাউনদের, জমিজিরাত সবই লুটেপুটে খাচ্ছে ওই ব্যাটারা।

তা ঠিকই বলেছেন স্যার, সায় দেয় রমজান। স্যার শব্দ টা বার্মা মুল্লুক থেকে শিখে এসেছে ও। আর লক্ষ্য করেছে ওই সম্ভাষণটি শুনলে কেমন খুসি হয় মুনিব ফেলু মিঞা। তাই সুযোগ পেলেই ওটা ব্যবহার করে রমজান।

কিন্তু, বাদশার জাত, বাদশারই জাত। টাকা বলেই কি আর খানদান পাওয়া যায়? কি বল রমজান?

ছোট্ট একটা 'জি' বলে চুপ মেরে থাকে রমজান। এসব ভাবালুতার আগা-মাথা খুঁজে পায়না ও। মুনিবের দু কদম পিছে পিছে চলেছে ও। আর ভাবছে ওই সাত নম্বর তালুকটারই কথা। তালুকটা বেচেই দিতে চায় রামদয়াল। ওতে নাকি লোকসান যাচ্ছে। তাই রমজানের বরাবর ফেলু মিঞার প্রস্তাবটা আসতেই লুফে নিয়েছিল রামদয়াল। দামটা ইচ্ছে করেই একটু বেশি হেঁকেছিল, কারণ জাতমহাজন রামদয়াল জানে মিঞার যখন রোখ চেপেছে তখন তালুক সে কিনবেই। দশ হাজার হেঁকেছে অন্ততঃ আট হাজার বের করবেই। সেই সাথে রমজানকেও টিপে দিয়েছে রামদয়াল, যদি আট হাজার খসাতে পারে তবে পাঁচ শো রমজানের। পান চিনি খাবে রমজান। যদি এর বেশী হয় তবে বেশি টুকুর বখরাও আধাআধি। দুটো কদম তাড়াতাড়ি ফেলে মুনিবের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় রমজান। কিন্তু, মুখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে যায়, ঠোঁটের কাছে ঠেলে ওঠা কথাটা উল্টো দিকেই ফিরে যায়।

কি ভাবছে ফেলু মিঞা অমন রক্ত-টকটক মুখে?

তালুকটা আসলে বেচবার ইচ্ছে নেই রামদয়ালের। তাই অমন অসম্ভব

দাম হেঁকেছে। মাঝখানে ফেলু মিঞাকে নিজের কাছারিতে বসিয়ে শুধু একটু মজা দেখে নিল। এ সম্পর্কে একটুও সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার মনে।
আহ্ বুকের সেই আগুনটা আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। অপমানে ক্ষোভে রাগে ফেটে যেতে চায় গোশতের শরীরটা। সে জন্যই বুঝি স্কুলের স্বর শেখা ইতিহাসের জ্ঞান থেকে বার বার ভেসে ওঠে দুটো নাম-আকবর বাদশা আর নবাব আলিবর্দী। এই নাম দুটোর সাথেই জড়িত যত গৌরব। তারপর সিরাজুদ্দৌলা, বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ। এই কলঙ্কের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মিঞা আভিজাত্যের বিলুপ্ত অধ্যায়। তার ওপর শালা কর্ণওয়ালিস, শেষের শূলটা তো ওই শূয়ারখোরটাই মেরে গেছে। তাই তো আজ 'বাইন্যা' রামদয়ালের কাছারিতে যেচে আসতে হয় ফেলু মিঞাকে, ফিরে যেতে হয় ব্যর্থ মনোরথে। জ্বালা। জ্বালা। এ এক অসম্ভব জ্বালা। ভেতরের শিরাগুলো কেমন টাটিয়ে ওঠে আর ফেলু মিঞার মনে হয় শরীরের সমস্ত চামড়া যেন ঝলসে গেল। এমনিই হয়, মিঞাদের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতটা যখন চিন্তা করে ফেলু মিঞা তখন এমনি এক জ্বালায় দাউ দাউ করে বুকটা, কোত্থেকে কোন্ হারানো দিগন্তের বহ্নি শিখারা এসে ছেঁকে ধরে ওকে। সেই শিখার মাথায় চড়ে, লুন্ঠিত মর্যাদা, লুপ্ত অতীত, অতৃপ্ত আকাঙ্খা আর এখনো অপূর্ণ সেই সংকল্পটি ধেই ধেই করে কি এক আগুনের নাচন জুড়ে দেয় ফেলু মিঞাকে ঘিরে। কখন যে এমন অবস্থা হবে আগে ভাগে একটুও টের পায়না ফেলু মিঞা।
হয়ত বা রাত্রে ঘুমুতে গেছে অথবা দিবানিদ্রার উদ্দেশ্যে হাতপা-গুলো একটু ছড়িয়ে দিয়েছে অমনি ওঁৎপাতা জন্তুর মতো চিন্তাগুলো একটার পর একটা লাফিয়ে পড়ে ঘিরে ধরে ফেলু মিঞাকে। অন্য সময় কোন্ কানি-ঘুপচিতে যেন লুকিয়ে থাকে এসব চিন্তা। মাঝে মাঝে শুধু থাবাটা বাড়িয়ে দেয় একটুখানি, আর কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফেলু মিঞা। কিন্তু অবসর সময়টাতে ওদের দৌরাত্ম্যের আর সীমা থাকে না। নিদারুণ তীক্ষ্ণতা, অসহ্য বিষ ওই জন্তুর মতো থাবা-মেলা চিন্তাগুলোর। দাদুর নাকি একটা হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল চারটে। হাতিটা মরে যায়। দাদুর জীবিত কালে হাতি আর কেনা হয়নি। কতদিন ভেবেছে ফেলু মিঞা—হাতি হল আভিজাত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ, হাতি কিনতেই হবে। কোনদিন কি কিনতে পারবে ফেলু মিঞা? আল্লা কি সে তৌফিক দিবেন তাকে?
সেই দাদুর আমলের যোল বেহারার পালকিটা, খুঁটো আর দরজা ভেঙ্গে

কবে থেকে পড়ে আছে দেউড়ি ঘরে। না আছে সেই বেহারা, না চড়বার লোক। ফেলু মিঞার আছে সেই আব্বাজান বড় মিঞার আমলের একটি মাত্র ঘোড়া। বুড়ো হাড় জিরজিরে ঘোড়াটা। চড়বে কি, ওটাকে দেখলেই যে মায়া হয়! পাছে লোকে দেখে হাসাহাসি করে তাই চাকরটাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ফেলু মিঞা—দিনের বেলায় আস্তাবল থেকে কখনো বের করবি না ঘোড়াটাকে। নেহাৎ মরহুম আব্বাজানের ঘোড়া নইলে কবে এক গুলি খরচ করে ওটাকে চোখের সুমুখ থেকে সরিয়ে দিত ফেলু মিঞা। কবে, কবে একটা তেজী বলিষ্ঠ-স্বাস্থ্য সুন্দর চকচকে ঘোড়া কিনতে পারবে ফেলু মিঞা? কত দিনের সাধ তার!

এ গাঁ সে গাঁ, দুচারজন থুথ্‌থুড়ে বুড়ো, তাদের মুখে শুনেছে ফেলু মিঞা, একটা 'পুইন্যা' হত বটে মিঞাবাড়ি। সে কি পুইন্যা, রীতিমত ভোজ—জিয়াফত। জিয়াফত লেগে থাকত দুটো দিন। পিঁপড়ের সারির মতো দূরদূরান্ত থেকে প্রজারা আসত। কত নজরানা, কত উপঢৌকন। রূপার টাকা, কাগজের টাকা আলাদা আলাদা জমা। জমে জমে স্তূপ হয়ে রীতিমত পাহাড়ের মত উঁচিয়ে উঠত। শুধু কি টাকা! চাল ডাল ফল গরু ভেড়া ছাগল, মনে হত চার পাঁচটা হাট উঠে এসেছে মিঞা বাড়ির কাচারি মাঠে। যারা সম্ভ্রান্ত প্রজা ওরা আসত ঘোড়া অথবা পাল্কিতে চড়ে। নজরানা দিত গিনি সোনা অথবা সেই বাদশাহী আমলের আশরফি। সে এক দিন ছিল বটে। আর আজ? আজও বছর বছর পুইন্যা হয়, কিন্তু, সে শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরে। জঁমক নেই, 'লয়-লস্কর' নেই, প্রজা নেই; পুইন্যা কেমন করে জমবে! অথচ ওই রামদয়ালের কাছারিটা পুইন্যায় সময় কেমন গম গম করে, কত ধুমধাম, কত হৈ হৈ।

এ সব ভাবতে ভাবতে ফেলু মিঞা দেখে মনের পর্দায় মিঞা-আভিজাত্যের যে নিঁখুত ছবিটি এঁকে রেখেছে, সেই ছবিটি কখন জীবন্ত অবয়ব নিয়েছে। একটা ছবি নয়, অসংখ্য ছবি—তারা জীবন্ত হয়ে ওর চোখের সুমুখে চলে বেড়াচ্ছে। নহবতখানায় সানাইয়ালা বাঁশিওয়ালা ঘুঙুরওয়ালা। কি এক ললিত রাগিনীর মূর্চ্ছনায় ধিমি ধিমি সুরের জাল বিস্তার করে চলেছে ওরা। হাতিশালায় হাতি। ঘোড়াশালায় ঘোড়া। মেজবান খানায় মেহমানের ভীড়। লোক-লস্করে গম গম করছে মিঞা বাড়ি। কত কণ্ঠ কত হাসি। হাসি হাসি মুখ প্রজাদের, মিঞার অনুগ্রহ পেয়ে হাত তুলে দোয়া করছে; আল্লার দরবারে দীর্ঘায়ু কামনা করছে ফেলু মিঞার। আহা সে দিন কি কখনো আসবে না?

এই তো ছবি মিঞা বাড়ির। এ ছবিটা সেই কবে থেকে মনে মনে নাড়া-চাড়া করছে ফেলু মিঞা। কত রং লেগেছে, কত বিচিত্র বর্ণে মুড়ে নিয়েছে নিত্যকার আঁকা সেই ছবিকে।

এমনি ভাবতে ভাবতে আনন্দ উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো তার চিন চিন করে বেজেছে। কান পেতে শুনেছে ফেলু মিঞা ধমনীর উষ্ণ রাজ্যে সে এক স্পন্দন, সে এক রুদ্র নাচন। চোখ তার জ্বলে উঠেছে, শরীরটা উঠেছে তেঁতে। অস্থির হয়েছে ফেলু মিঞা। ঘুমের আয়োজন হয়েছে লণ্ডভণ্ড। আর হঠাৎ, হঠাৎ তার মনে হয়েছে কোত্থেকে ছুটে আসছে সেই সব বহ্নিশিখা যা ওকে ঝলসে পুড়িয়ে একাকার করে দিয়ে যায়। স্বপ্ন, অতীত, বর্তমান, অপূর্ণ সাধ আর সংকল্পের শিখারা···ধেই ধেই নাচন দাউ দাউ অগ্নি তাণ্ডব···আপন জগতের বন্দী ফেলু মিঞা।

সাঁকোটায় উঠতে গিয়ে ফেলু মিঞা কি হোঁচট খেল? দু হাতের বেড় দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরে নেয় রমজান। সাঁকোটা পেরিয়ে জলদি জলদি পা ফেলে ওরা। বেলাটা হেলে পড়েছে।

সাঁকোটার মেরামত দরকার, অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ফেলু মিঞা।

একটা কথা। যা এতক্ষণ বলার জন্য সাহসটা সংগ্রহ করতে পারছে না রমজান সেই বরাভয়টা চেয়ে বসল মুনিবের কাছে।

বল। বল।

বলছিলাম কি: মান বেশী, না টাকা বেশী।

মর্মে গিয়ে বিঁধল কথাটা। এতক্ষণ ধরে এ কথাটাই তো ভাবছে ফেলু মিঞা মান বড়, না টাকা বড়। মনে মনে একটু হিসেব করে দেখে ফেলু মিঞা। স্ত্রীর হালিমার বিছে হারটা আর এক জোড়া বাজুবন্দ, এতে হাজার খানিক টাকা হয়ে যাবে। কিন্তু, বাকী আরেক হাজার?

আমার তো মনে হয় ব্যাটা আট হাজার তক নামবে, বুঝি মুনিবের চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলে রমজান।

কি? চকচকিয়ে ওঠে ফেলু মিঞার চোখ মুখ। তবে তুমি যাও। কালকের মধ্যেই পাকা দলিল করে ফেল। আমি রাজি। ভবিষ্যতের রঙ্গিন কল্পনাটা কি এক অপরূপার মূর্তি ধরে আর একবার নেচে যায় ফেলু মিঞার চোখের উপর দিয়ে। সারা দিনে এই প্রথম একটু হাসল ফেলু মিঞা।

কিন্তু রমজানের ঝুলিতে আরো অনেক বুদ্ধি। অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে বুদ্ধির জাল। বলল রমজান: লেকু, বসির, ট্যাণ্ডল, সেকান্দর মাষ্টার তাজু

ব্যাপারী, হামিদ শেখ, কারিবাড়ি, খতিববাড়ি, আরো অনেক—কেউ চার বছর, কেউ তার চেয়েও বেশি খাজনা বাকী ফেলেছে। ওদের ক্রোক দিন উঠে যাক, গাছ গাছড়া ভিঁটিভুঁটি সমান করে ফেলি। অন্ততঃ দশ কানি জমি তো হবেই। ধান তোলা যাবে দু খন্দ, রবি ফসলও নেহাৎ কম হবে না।

কী বলতে চাও তুমি! রমজান বুঝি সেই চাষের কথাটাই তুলছে আবার। তীক্ষ্ণ আর কর্কশ হল ফেলু মিঞা।

একটুও না দমে বলে চলে রমজান: কানি প্রতি যদি দুই খন্দে পঞ্চাশ মণ ধানও ধরি তা হলে বছরে হল গিয়ে পাঁচ শো মণ। মণকারা দু টাকা করে ছেড়ে দিন ধানগুলো। কত হল? পুরো এক হাজার টাকা। কম কথা? বছরে যদি হাজার টাকা জমে তা হলে সাত নম্বর তো থোড়ি বাত, ওই তিন তো? নম্বর, চৌদ্দ নম্বর আর মিস্ত্রিরদের জোতগুলো কিনতে কয় বছর লাগে বলুন আপনার অন্য জমি, অন্য সব তহসিলের আয়ের কথাটা বাদ দিয়েই বলছি।

অজস্র শিখায় জ্বলছে যে দাবাগ্নি সেটা বুঝি আর একটু উসকে দিল রমজান। সহসা উত্তর জোগায় না ফেলু মিঞার মুখে।

এ তো গেল এই বছরের হিসেব। যুদ্ধ কি লাগবে না ভাবছেন? নির্ঘাত লাগবে। তা হলে? তা হলে দু টাকার ধান হবে তিরিশ টাকা। তখন ওই দশকানি জমির পাঁচশো মণ ধান দিয়ে হেলেফেলেও পনেরোটি হাজার টাকা ছেঁকে তুলবেন আপনি। এর একটি কথাও যদি মিথ্যে হয় তবে বলছি স্যার, আপনার এই না-কাবেল গোলাম রমজানের কানটা কেটে রেখে দেবেন আপনি। আপনাদের দোয়ায় বিদেশ ঘুরে কিছু তো শিখেছি স্যার!

চেয়ে থাকে ফেলু মিঞা রমজানের খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি মুখটার দিকে। এত বুদ্ধি রাখে রমজান? কড়া গণ্ডা হিসেব, নিখুঁত পরিকল্পনা। তার চেয়েও আশ্চর্য, রামদয়ালের কথাগুলোই রমজানের মুখ দিয়ে কেমন আকর্ষণীয় আর লোভনীয় হয়ে ঘিরে ধরে ফেলু মিঞাকে।

তবু খোঁচা লাগে, নীতিবোধে নয়, সম্মানকামী আভিজাত্যবোধে। প্রজা মানে তো শুধু বছর বছর খাজনা আদায় করা নয়! প্রজা মানে ইজ্জত। প্রজা মানে সম্ভ্রম। আসতে যেতে সালামটা, কারণে অকারণে একটু হাঁক-ডাক। এসব বাদ দিয়ে, প্রজাকে নাকচ করে বড় মানষীর কথা, আভি-জাত্যের কথা কি ভাবা যায়? দ্রোনে দ্রোনে জমির মালিক, হাজার জন-মজুর খাটিয়ে চাষ, সে বলদ দিয়েই হোক আর কলের লাঙ্গলেই হোক, টাকা লাখই আসুক আর কোটিই আসুক হাতে, তবু তো চাষ করা? লোকে

চাষা-ই বলবে; বলবেনা মিঞার বেটা মিঞা। টাকার পাহাড়ের উপর বসে থাক, হাজার জনমজুরের উপর সর্দারী কর, সে এক জিনিস। আর মিঞাগিরী? সে এক গৌরব। সে এক বড়মানুষি। আর কে না জানে খুদে মিঞা, জমিদার তালুকদার, ওদের যা কিছু রব-রোয়াব, প্রতিপত্তি সে তো ওই দশ বিশ ঘর প্রজারই দৌলতে!

কিন্তু···সরকারী খতিয়ানের আঁকাবাঁকা দাগগুলো ভেসে ওঠে ফেলু মিঞার চোখের সমুখে। কত বিচিত্র নাম লেখা সেখানে, চাকলা রওশানাবাদ, পরগনা সুলতানপুর আমিরাবাদ, কোথাও কত 'ডিসিমলের' মাপ, কত ঘর প্রজা, সবই যে মুখস্ত ফেলু মিঞার। আর ওই তিন নম্বর, সাত নম্বর, চৌদ্দ নম্বর তালুকগুলো, সে যে মিঞা আভিজাত্যে দুষ্ট কাঁটা, খচ খচ করে অনবরত বিঁধে চলেছে ফেলু মিঞাকে। না, যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে ও সব তালুক। আর? আর আগরতলার মহারাজার কাছ থেকে একটা সত্ব। সেই যে একটা ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছিল, নাফরমান নালায়েক ভাইগুলোর মদদ না পাওয়ায় সে তো ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি টাকা আসে হাতে তবে ম্যানেজারকে ভজিয়ে ভুজিয়ে আর একটা ব্যবস্থা ফেলু মিঞা করে ফেলতে পারবে বইকি।

প্রয়োজন টাকার। টাকা ছাড়া মিঞাগিরী চলেনা, চলবেনা। দাঁড়িয়ে পড়ল ফেলু মিঞা। এগিয়ে এসে রমজানকে পাশে দাঁড়াবার সময় দিল। বলল, ওদের সবাইকে খবর দাও আসতে। একটু থামল ফেলু মিঞা। বলল আবার, হ্যাঁ, আর জানিয়ে দাও খাজনা তাদের দিতেই হবে, নইলে ক্রোক।

কি এক লোভ—চিকচিকে হাসি ঝিলিক তুলে গেল খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি-মুখটায়। মনে মনে হিসেব কষে ফেলল রমজান, সাত নম্বরের জন্য পাঁচশ, তিন আর চৌদ্দ নম্বরের জন্য এক হাজার করে দু হাজার, একুনে আড়াই হাজার। ইস্, রুস্তমের সেই সর্দারী যাবার পর থেকে এত টাকা একসাথে দেখেনি রমজান।

ওরা পৌঁছে যায় বাকুলিয়া। পুকুর পাড়ে উঠে সেই গাব গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে পেছনে তাকায় ফেলু মিঞা। দখিনের ক্ষেতে শীত দুপুরের রোদ মাকড়শার মতো আপন মনে বুনে চলেছে সুক্ষ্ম কোন জরির জাল। ফেলু মিঞার চোখের ক্ষেতে ফুটে উঠেছে স্বপ্নের কোন কারুচিত্র।

কেমন করে যে দিনটা গড়িয়ে গেল টেরই পেলনা মালু। তালতলি এলে সময়টা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। বাকুলিয়ার মত সংকীর্ণ আর আঁকা-বাঁকা নয় তালতলির রাস্তাগুলো, সোজা আর প্রশস্ত। দুপাশে আমলকি জাম কামরাঙ্গা জামরুল, কত ফলের আর ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে কেয়ার জঙ্গল। অজস্র কাঠালী চাঁপার গাছ, সারা গ্রামটিতে ভুর ভুর গন্ধ ছড়ায়। অদ্ভুত মিষ্টি কাঁঠালী চাঁপার গন্ধটি, ওই দত্তদের মেয়ে রামদয়ালের ভাইঝি রানুদি, তার চুলেও এমনি একটা সুবাস। এই কাঠালী চাপা বেটেই বুঝি তেল বানায় রানু আর সেই তেল চুলে মাখে, কতদিন জিজ্ঞেস করবে ভেবেছে মালু, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি।

বড় বড় দালান তালতলিতে। বাকুলিয়ায় তো দালানই মোটে দুটো-সৈয়দ-দের আর মিঞাদের। কিন্তু তালতলির দালানের তুলনায় ওগুলো যেন কবুতরের খোপ। দালানগুলোর চেয়েও তালতলির ইয়া বড় বড় টিনের চৌচালাগুলো যেন আরো ভাল লাগে মালুর। ভাল লাগে তকতকে ঝকঝকে মাটির ভিঁটি। বাকুলিয়াটা বড় নোংরা, তালতলিতে এলেই এ কথাটা মনে পড়ে ওর। তাই তালতলির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, ফল কুড়োতে, ফুল কুড়োতে কেমন করে যেন সময়টা কেটে যায়। বাকুলিয়ার ফেরার কথাটা মনেই থাকেনা।

এসবেরও উপর তালতলির রানুদি আর ওই স্কুল। মালুর মনে তারা এঁকে রেখেছে ভয় বিস্ময় আর আনন্দ মেশানো এক আশ্চর্য ছবি। কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ ওকে টেনে নিয়ে যায় রানুদির কাছে, ওই স্কুল ঘরের দিকে। লম্বা স্কুল ঘরটির কাছাকাছি এসে কিন্তু বুকটা মালুর ঢিপ ঢিপ করে। কি এক সম্ভ্রম এবং ভয় ওকে আর কাছে যেতে দেয়না। রজনী ময়রার টুলের উপর বসে বসে দেখে মালু ঢং ঢং ঘণ্টা পড়ছে, ছেলেরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে। আবার ঘণ্টা পড়ছে, ছেলেরা হৈ হৈ করে ক্লাশে যাচ্ছে। তারপর কত ধরণে কত স্বরে পড়ার শব্দ আসে ভেসে। মালু ভাবে ওখানে যারা পড়ে কতনা ভাগ্যবান তারা। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে মালুর ভিতরে গিয়ে দেখুক কেমন করে ছেলেরা বসে, কথা বলে, অথবা পড়া করে। অমন যে মালু, সাপকে যার ভয় নেই, এখানে এলে কেমন যেন কেঁচো বনে যায় ও। সাহস পায়না ভেতরে যাবার। আব্বার মক্তবটার কথাও মনে পড়ে যায়। ওই

মক্তবটা সম্পর্কে যেমন ভীষণ বিতৃষ্ণা মালুর তেমনি গভীর এক শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ভরা কৌতূহলের আকর্ষণ তালতলির স্কুল সম্পর্কে।

রান্নুদি গো। তুমি বুঝি ওই চাঁপা ফুল বেটে চুলে মাখ। আজ একরকম চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে ফেলল মালু। কিন্তু অমন যে ভাল দিদি রান্নুদি সেও কেমন অদ্ভুত আচরণ করে বসে। মালুর হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। তারপর হাত ছেড়ে কানটা বার দুই টেনে মুচড়ে দেয়, বলে, দুষ্টু ছেলে, পালিয়ে এসেছিস বুঝি ?

দেখনা কাণ্ড রান্নুদির। কি জিজ্ঞেস করল মালু আর কী তার জবাব। আর মালুর কানটা যেন এজমালি সম্পত্তি, জাতিধর্ম বয়স নির্বিশেষে সকলের যেন অবাধ অধিকার সেখানে। প্রতিবাদে মালু গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

ওহ্ হো! জনাবের আবার অভিমান আছে দেখছি। সেই উঠোনভর লোকের সামনেই ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খায় রান্নু। কি যে আক্কেল রান্নুদির। লজ্জা হয় মালুর। বাকুলিয়ায় অমন করে কেউ চুমু খায়না ওকে, আম্মাও না, রাবুও না।

নে খা। শানকি ভর্তি খই আর সন্দেশ এনে দেয় রান্নু। মুহূর্তেই লজ্জাটা ভেঙ্গে যায়, রাগটা পড়ে যায় মালুর। বলল, রান্নুদি তুমি কি চাঁপা ফুল—

আহ্ ভীষণ ফাজিল হয়েছিস মালু। ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দেয় রান্নু। তারপর শুধায় সেই পুরনো কথা—আচ্ছা রাবু, আরিফা কেমন আছে রে ? বোরখা পরে ওরা সারাদিন ঘরেই বসে থাকে বুঝি ? পুকুরে স্নান করতে যায়না ?

উদ্ভট প্রশ্ন রান্নুর। কতদিন বলেছে মালু, রাবু আপারা বোরখা এখনো ছোঁয়নি। বিশ্বাসই করেনা রান্নু। তাই উত্তর না দিয়ে নির্বিকার মালু খই চিবিয়ে যায়।

রাবু নাকি নোলক পরেছে আর একেবারে চোখ ঢেকে ঘোমটা দিচ্ছে ? এবারও চুপ চাপ খই চিবিয়ে চলে মালু।

আচ্ছা মালু। কে বেশি সুন্দর রে, আমি না তোর রাবু আপা ?

খই চিবানোটা বন্ধ হয়ে যায় মালুর, এ প্রশ্নটা আগে কখনো ওঠেনি, ভেবেও দেখেনি মালু। আর যদি ভেবেও থাকতো, মালু কি বলতে পারবে : রান্নুদি তুমিই সুন্দর ? তা পারবেনা। কেননা, রান্নুদির চুলে যেমন চাঁপার গন্ধ তেমনি রাবু আপার গায়ে অদ্ভুত এক মিষ্টি সুবাস, যার নাম জানেনা মালু।

'রাবু আপার কথায় মধু, রাবু আপার তিরস্কার মিষ্টি, রাবু আপার স্পর্শ মিষ্টি। রাবু আপা কাঁচা হলুদের মতো টকটকে সুন্দর। কিন্তু রানুদি যে আরও সুন্দর। গান করে রানুদি, রাবু আপা গান করেনা। রানুদি ফুল দিয়ে খোঁপা বাঁধে, ফুলের চুড়ি পরে হাতে। রাবু আপার টেবিলে সাজান থাকে না ফুল। আর কি সুন্দর রানুদির আদরটা।

তুমিও সুন্দর, রাবু আপাও সুন্দর, শানকিটা মাটিতে রেখে বলল মালু।

ওরে বাবা, এযে একেবারে সেয়ানা ছেলের সেয়ানা উত্তর। খুব চালাক হচ্ছিস বুঝি আজকাল? মালুর চিবুকটা ধরে টিপে দেয় রানু।

খাওয়া শেষ হয়েছে মালুর। আস্তিনের খুঁটে মুখটা মুছে বলল, বই দাও, বই চেয়েছে রাবু আপা।

কি বই? শুধাল রানু।

তা তো বলেনি?

বোকারাম কোথাকার, এর পর থেকে বইয়ের নাম নিয়ে আসবি। নইলে পাবিনা। বুঝলি? বলতে বলতে আর এক ঘরে চলে গেল রানু। কয়েকটা বই এনে মালুর হাতে দিয়ে বলল আবার, হ্যাঁরে, রাবু কি আমার চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে?

জবাব না দিয়ে বইগুলো বগলে নিয়ে পা বাড়ায় মালু। যখনি দেখা হবে এই বাঁধা ধরা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবে রানু। শুনে শুনে মালুর বিরক্তি ধরে গেছে।

মালু একদিন বলেছিল লম্বা, আর একদিন বুঝি বলেছিল খাট। বলে কি বিপদেই না পড়েছিল। আজ আবার কোন্ কথা বলে নাজেহাল হবে রানুর হাতে? কেন, রানুদি একবার গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পারেনা?

কিরে, কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়? মালুর পথটা আগলে দাঁড়ায় রানু।

গিয়ে দেখে আসলেই তো পার। নইলে বল, আমি নিয়ে আসব রাবু আপাকে?

আসবে রাবু? আনতে পারবি?

বা—রে। পারবোনা কেন? কত যায়গায় নিয়ে যাই রাবু আপাকে?

কিন্তু, ওর আম্মা? আম্মা কি আসতে দেবে?

এ প্রশ্নের যে কি জবাব সেটা রানুকে ভাবতে দিয়ে বেরিয়ে আসে মালু।

এত চিঠি লেখালেখি, এত ভাব ওদের দুজনে। অথচ ওদের দেখা হয় না, ওরা দেখা করতে পারে না। রান্নু কোনদিন যায়নি বাকুলিয়ায়। রাবু সেই কবে একবার এসেছিল তালতলিতে থিয়েটার দেখতে। মনে আছে মালুর, রাবু আরিফা তখনো ফ্রক পরত। মেজ ভাই ওদের দুজনকে দুপাশে রেখে হাত ধরে হাঁটছিল। মালু ছিল পেছনে। ওই একবারই তো দেখা রাবুর সাথে রান্নুর। তাতেই কত ভাব। কিন্তু, ওরা দেখা করেন কেন? রান্নু কেন যায়না বাকুলিয়ায়? অথবা রাবু কেন আসেনা রান্নুদের বাড়ি। প্রশ্নটা শুধু আজ নয়, অনেকদিনই জেগেছে মালুর মনে।

কিন্তু এ কী বিপত্তি। কবিয়াল আর যাত্রার দলটার ধারে কাছেও কি ঘেঁসতে পারবে না মালু? সেই কখন থেকে চেষ্টা করছে ও। কিন্তু, একটা বদখত ভুঁড়িওয়ালা লোক বার বার ওর সব ফিকির বানচাল করে দিচ্ছে। একবার তো তাঁবুর ভেতর প্রায় ঢুকেই পড়েছিল মালু, এমনি সময় আস্ত একটা চেলা কাঠ এসে পড়ল ঠিক ওর কোমর ঘেঁসে। আর একটু হলে মালুর রাজাটা হয়ত আস্ত থাকত না এতক্ষণে। আর কি শ্যেন দৃষ্টি লোকটার। বার তিন চেষ্টা করেও সে দৃষ্টিটাকে ফাঁকি দিতে পারল না মালু। যেই একটু কাছে গেছে অমনি তেড়ে এসেছে লোকটা। হয়ত যাত্রা পার্টির দারোয়ান, নইলে অমন করে তেড়ে আসবে কেন?

তৃতীয় চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মিত্তির বাড়ির আমলকি গাছটায় উঠে কিছু আমলকী পেড়ে নিয়েছিল মালু। সে আমলকী চিবুতে চিবুতে আর পকেটেরগুলো গুণতে গুণতে বাজারের শেষ প্রান্তে ওই তাঁবুগুলোর দিকেই যাচ্ছিল মালু। এমন সময় ফেলু মিঞার দৃষ্টি পড়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। ইস্, কেমন ছড়ে গেছে বুকটা। এত থুতু লেপে দিয়েছে তবু এখনো জ্বালা করছে। সার্টের বোতামগুলো খুলে বুকটা আর একবার দেখে নিল মালু, অনেকটি যায়গা লাল হয়ে আছে এখনো।

তারপর রান্নুদের ওখানে গিয়ে আরো দেরী হয়ে গেল মালুর। না গিয়েই বা উপায় ছিল কি? পেট তো রীতিমত কুলহুয়াল্লা পড়ছিল সেই কখন থেকে। ভারি ভালো লাগছে মালুর। খই আর সন্দেশ ভরা পেটে এক গ্লাশ পানি পড়ে বেশ টিমটিমে হয়েছে পেটটা।

রজনী কাকা, তোমার চৌকির নীচে বইগুলো রেখে যাচ্ছি; কাউকে ধরতে দিওনা কিন্তু। বইগুলো রেখে ছুট দেয় মালু।

আঃ বাঁচা গেল। সেই ভুঁড়িওয়ালা লোকটা নেই। সাঁৎ করে মালু ঢুকে পড়ল

তাঁবুর ভেতর। কিন্তু নিদারুণ ভাবে হতাশ হল মালু। ওর এত সুন্দর কল্পনাটা মুহূর্তে কে যেন খান খান করে ভেঙে দিল। সেই ভট্‌চার্য্যি বাবুদের ছেলে বাদল বলছিল রূপোর জাজিম, সোনার পোশাক, হীরের তাজ, ঝিলিক দেওয়া রামের তরবারি, আরো কত কিছু আছে ওখানে। কিন্তু, কোথায় সে সব? মালু শুধু দেখল কতগুলো নোংরা দড়ির খাটিয়া, তারই উপর কতগুলো লোক বিশ্রী ঢঙে বসে কি সব আলাপ করছে। শুনে মালুর কানটা গরম হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পাশের তাঁবুটায় চলে এল ও।

এদিক ওদিক চোখ ফেলতেই দেখল মালু পরমাশ্চর্য এক পুরুষ মূর্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল ওর দিকে। হাত রাখল ওর কাঁধে, বলল, কোথা হতে আগমন তব, বৎস?

চোখ বড় বড় করে মালু দেখল, ইয়া জোয়ান এক পুরুষ, কী পুষ্ট পুষ্টু আর শক্ত তার বাহু। সে বাহুর ভারে মালু বুঝি বসে পড়বে মাটিতে।

বৎসে, কি নাম তব, কোথা তব নিবাস? জবাব না পেয়ে আবার শুধাল লোকটা। আশ্চর্য ঝংকার লোকটার কণ্ঠে। কথায় তার তরবারির ঝিলিক। এমন অলংকৃত কথা কখনো শোনেনি মালু। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ও।

কে হে বালক তুমি? চেননা মোরে? মোর নাম সুগ্রীব, রামের মিতা। মালুর পলকহীন চোখের জিজ্ঞাসাটা আন্দাজ করেই যেন বলল লোকটা।

সুগ্রীব? মালু কখনো শোনেনি এ নাম। তাই খানিকক্ষণ ওর মুখটাকে যেন চেনবার চেষ্টা করল মালু। বলল, ও তুমি রাম নও?

মুহূর্তে সুগ্রীবের মুখ চোখ কি এক হিংস্রতায় উগ্র হয়ে ওঠে। বলল সুগ্রীব—রাম? সে আবার বীর নাকি। সে তো আস্ত এক গবেট। সাধ্য কি রামের, বিনা সুগ্রীব যুদ্ধ জিতে? আমিই সেই সুগ্রীব। ডান হাতের তর্জনীটা তুলে বুক ঠোঁকে সুগ্রীব, মাসল ফোলায়। সে বীরত্ব ব্যঞ্জনায় তাক লেগে যায় মালুর। সত্যি, মহাবীর সুগ্রীব।

হঠাৎ মানুষের মতো গলাটা দরাজ করে হাসে সুগ্রীব, বলে—চল, দেখাই তোমারে রামের কারখানা। সঙ্গের আর একটা তাঁবুতে মালুকে নিয়ে আসে সুগ্রীব। কাগজের মুকুট, টিনের তলোয়ার আর কিছু জরি আঁকা পোশাক এদিক ওদিক ছড়ানো। কিন্তু, ওসবে মালুর কৌতূহল উবে গেছে, সুগ্রীবই ওকে মুগ্ধ করেছে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে সুগ্রীবের সেই দোসরা প্রশ্নটার জবাব দেয় মালু—আমার নাম মালু, আবদুল মালেক, গ্রাম বাকুলিয়া।

এ্যা, তুমি মুসলমান? নেড়ে? হঠাৎ যেন সাপের উপর পা পড়ে আঁৎকে উঠে সুগ্রীব। পিছিয়ে আসে দু পা।

শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আসে মালুর মুখখানি। কেমন ছোট মনে হয় নিজেকে। এই পরমাশ্চর্য পুরুষটির সামনে সে বুঝি মহা অন্যায় করে ফেলেছে।

সৌভাগ্য মালুর, সুগ্রীবের আতংকটা স্থায়ী হয় না বেশিক্ষণ। সামনে নিয়ে বলে সুগ্রীব, তা মুসলমান হলে কি হবে, চেহারা তোমার সুন্দর ; খাসা মানাবে সখির পার্টে।

আপনার বাড়ি কোথায়? সুগ্রীবের পুরো পরিচয়টা জানবার আশায় শুধাল মালু।

আমার বাড়ি বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে, কিষ্কিন্ধ্যার রাজপরিবারে আমার জন্ম। কথাগুলো বলতে বলতেই বাইসেপটা ফুলিয়ে তোলে সুগ্রীব। তারপর চওড়া বুকটাকে নিঃশ্বাসের টানে বেশ এক প্রস্থ ফুলিয়ে বলে—রাম? রামটা তো আস্ত ছাগল। শুধু তীর ছুঁড়ে কি লড়াই জেতা যায়? বিজয়ের জন্য চাই বুদ্ধি, কৌশল। সে বুদ্ধি সে কৌশল এই সুগ্রীবের। আমি না থাকলে হেরে ভূত হতনা রাম? আশ্চর্য! আশ্চর্য বীরত্ব ভঙিমা সুগ্রীবের। বিস্ময়ে আনন্দে চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় মালুর। কিন্তু বুঝতে পারে না মালু, রামের উপর কেন অত রাগ সুগ্রীবের।

আচ্ছা ভাই, রিহার্সালের ডাক পড়েছে। তোমাকে কিন্তু পার্ট নিতে হবে। মালুর চিবুকে একটি টোকা মেরে বীরের দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে যায় সুগ্রীব অন্য তাঁবুতে।

বাকুলিয়ার সৈয়দ বাড়িতে পালিত ছোট্ট সেই কিশোর। আচমকা বিচিত্র বিস্ময় আর পুলক ভরা এক দুনিয়া উন্মেচিত হয়ে গেল ওর বার বছর বয়সের অনিরুদ্ধ কৌতূহলের সুমুখে।

অকালে কোত্থেকে খাজনা দেব? কেমন অসহায় ভাবে বলল কসির। খাজনা দেবনা, ভিটি'ও ছাড়বনা, দেখি কি করতে পারে মিঞার 'পুত'। যে কসিরের অসহায়তারই প্রতিবাদে বলল লেকু।

চমকে ওঠে সেকান্দার মাষ্টার। বলে কি লেকু? ওরা খুঁজছে একটা ভদ্রস্থ রফা। কিন্তু লেকুর মতো গোয়ার্তুমী দেখালে তো যে কোন রফারই দফারফা।

ওই শুয়রের জাত রমজান, সব তারই শয়তানী। সে ব্যাটাই বুদ্ধি দিয়েছে

মিঞাকে। আমাদের 'গেরাম' ছাড়া করবে এই তার মতলব। ফুলে ফুলে ওঠে লেকুর ঘাড়ের পেশীগুলো।

ওরা কেউ ভাবেনি অমন আচমকা একটা নোটিশ দিয়ে বসবে ফেলু মিঞা। মাঘ ফাল্গুন কৃষকদের ঘরের কাজের সময়। এই দুটো মাসে সেরে ফেলতে হয় সারা বছরের বকেয়া কাজ। এ সময় আবহাওয়াটা থাকে ওদের অনুকূল, বৃষ্টি নেই, পাঁক নেই, শীতের নির্মল রোদ-ঝকঝক আবহাওয়া, কাজ করে শ্রান্ত হয়না ওরা। ফসল তোলা শেষ করেই হাজার গণ্ডা টুকিটাকি কাজে মন দেয়; মন্থর অবসরে হাত পা ছড়িয়ে ছন বাছে, ছোট বড় নানা আকারের গুচ্ছ বেঁধে বেঁধে তুলে দেয় চালের উপর, দেখতে দেখতে ঘরের উপর ওঠে নতুন ছাউনী। ভাঙ্গা বেড়াগুলো মেরামত করতে হয়, পাল্টাতে হয় বর্ষার উইয়ে খাওয়া পালা। ডোবাটার পাঁক তুলে আর একটু গভীর করে রাখতে হয় যাতে বর্ষার পানির সাথে মাছ পড়ে আবার পালিয়ে না যায়। এ সব কাজে টাকা লাগে। এমন সময় বকেয়া খাজনার নোটিশটা বাজের মতো পড়েছে ওদের মাথায়।

যাদের জমি আছে তাদের কথা আলাদা, তারা ধান বেচবে, পাট বেচবে, নগদ পয়সা তুলবে ঘরে।

কিন্তু বাকুলিয়া, শুধু বাকুলিয়া কেন, এ তল্লাটে কয়জন চাষীর হাতে জমি আছে? বাকুলিয়ার আশি ঘর প্রজার মাঝে পঞ্চাশ ঘরই সৈয়দ অথবা মিঞাদের প্রজা। বাকী তিরিশ ঘরের খাজনা পাওয়ার মালিক রামদয়াল। বাকুলিয়ার উত্তরে পশ্চিমে যে জমি, সে আর কতটুকু। তাও প্রায় আধা-আধি ভাগ সৈয়দ আর মিঞাদের ভেতর। দক্ষিণের ক্ষেত, বিশ পঁচিশ মৌজায় সেটাই তো সবচেয়ে বড় ক্ষেত, সে ক্ষেতের যদি দু আনা থাকে মিঞাদের তবে বার আনাই তালতলির দত্ত মিত্তিরদের। বাদবাকি দু আনার হাজার মালিক, হাতের তালুর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা। কৃষকরা নিজের মেহনতেই চাষ করে সে জমি! মিঞারা অথবা তালতলির বাবুরা মাঠে নাবে না। ওদের সব জমিই বর্গা খাটে। ওই দুই আনার যে হাজার মালিক তারাই অথবা যাদের নেই এক রত্তি জমি তারা, অর্দ্ধেক ফসলের বিনিময়ে চাষ করে দেয় সে জমি। একমাত্র রামদয়ালই আট জোড়া লাঙল আর দশ জন 'গাবুর' খাটিয়ে নিজেই চাষ করায় তার জমির কিছু অংশ।

সারা বাংলা দেশেই জমির অভাব। জমির অনুপাতে মানুষ নাকি অনেক বেশি। মানুষ তো কাজ চায়, খেটে খেতে চায়। এক টুকরো ক্ষেতের

পিছে কী আমানুষিক পরিশ্রম ঢেলে দেয় ওরা। তবু বছরে দুটো মাসের অন্ন জোটে কি? জমি যে নেই। কাজই বা কোথায়। তথ্য নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন সে সব পণ্ডিতরা বলেন—এক দিকে গারো পাহাড় অন্য দিকে ত্রিপুরা পর্বতের বেষ্টনী, আর ওই আরাকান পর্বতমালার সানুদেশ থেকে নাবতে নাবতে একেবারে মেঘনা আর বঙ্গোপসাগরের মোহনা অবধি—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতি অঞ্চল। পৃথিবীর আর কোথাও এত ছোট এলাকায় এত বেশি মানুষ বাস করে না। কথাটা যে কত নির্মম ভাবে সত্য বাকুলিয়ার লাঙল-ঠেলা-চাষীর মতো করে অন্যরা কি বুঝবে? ওদের ছেলেরাই যে অল্প বয়সে মায়ের আঁচলের মায়া কাটিয়ে ঘর ছাড়ে। অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। এক রত্তি যে ছেলে, লুঙ্গিটা পড়ে যেতে চায় কোমর ছেড়ে, সেও বিদেশে ছোটে কামাই করবে বলে। দু মুঠো ভাত দিতে অক্ষম মা বাবা ধরে রাখতে পারেনা কচি ছেলে-গুলোকে। যারা থেকে যায় গ্রামে তারাও বছরের অর্ধেকটা সময় কাটায় পাহাড়ে, আসামে অথবা ভাঁটি অঞ্চলে, শ্রমের বিনিময়ে টাকা অথবা শস্য নিয়ে ঘরে ফেরে।

বাকুলিয়ার সারেং বাড়ি, সব কয়টা জোয়ান জাহাজে জাহাজে ঘোরে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে। গোটা ট্যাণ্ডল বাড়িটাই তো রেঙ্গুনে, এক বৌগুলো আর ট্যাণ্ডলবুড়ো বাদে। কসির, ফজর আলী, ওদেরও ভাইরা কাকারা হয় রেঙ্গুনে নয়তো কোলকাতায়, বিদেশ না করলে যে ওদের ভাত জোটেনা।

মরসুমের শুরুতেই লেকু পাহাড় থেকে ছন এনেছিল। ইচ্ছে ছিল আর একটা খেপ দেবে। কিন্তু চার বছরের খাজনা যদি দিতে হয় তা হলে ও ছন আনবে কেমন করে? আবার পয়সার মুখ দেখবে সেই বর্ষার শেষাশেষি পূবের দেশে গিয়ে। তাই বুঝি এমন উত্তেজিত হয়েছে ও। কিন্তু মাষ্টার সাহেবের কাছে এসেছে ওরা পরামর্শের জন্য, সেখানে অমন গোঁয়ারের মত চটে যাওয়াটা তার মোটেই সমীচীন হয়নি। বুঝতে পেরে বুঝি লজ্জিত হয় লেকু, বলে, সবাই মিলে যা সাব্যস্ত হবে তাই তো করতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। তবে অসুবিধাটা যা সে তো বলবেই, সেকান্দর ওকে আশ্বস্ত করে।

গালে হাত দিয়ে ভাবে ওরা।

হাতে নেই টাকা, ঘরের হাঁড়িতে টান, তখন গালে হাত দিয়ে ভাবা ছাড়া

উপায় কি? কিন্তু ভাবলেই কি উপায় আসে? ওরা তাকিয়ে থাকে মাষ্টারের মুখের দিকে। মাষ্টার কি বলে?
দু সনের খাজনাটা দিতেই হবে। দিয়ে একটা সন মওকুব চাইতে হবে। আর বাকী, সে আগামী সন, কি কও? ভেবে চিন্তে বুঝি এই একটা উপায় ঠাওরায় সেকান্দর। সেই ভাল, দুটো সনের টাকার ব্যবস্থা কোন রকমে করা হোক। বাকী বছরের বকেয়া বাখরগঞ্জ বা আসাম থেকে ফিরে এসে। সেকান্দরের প্রস্তাবটায় সায় দিয়ে বলল ফজর আলি। মিঞাদের প্রজা না হলেও সে এসেছে দোস্ত লেকুর দাওয়াতে। লেকুর বিপদে আপদে ও মদদ দেয়। লেকুও দোস্তের নামে এক পা।
প্রস্তাবটিতে যুক্তি আছে, সবাই মনে মনে নেড়ে চেড়ে দেখছে বুঝি বা।
কি কও তোমরা, জিজ্ঞেস করে সেকান্দর।
এই সনে এক পয়সাও দিতে পারবো না! আমি। যদি পারি আগামী সনে সব জমাই এক সাথে উসুল করে দেব।
লেকুর কথায় সবার মুখেই যেন অসন্তোষ। কিন্তু ওরা বুঝছে না কেন লেকুর সমস্যাটা? দু সনের খাজনা দিতে হাতের টাকাটা যদি খরচাই হয়ে গেল তবে যে পাহাড়ে যাওয়াটা ওকে বাদ দিতে হবে। আর পাহাড় থেকে ছন আর বাঁশ এনে দুটো নগদ পয়সা যদি এই শীত থাকতে থাকতেই হাতে না তুলতে পারে তবে যে ওর কোন কামই হবে না। রাতে শিয়াল ঢোকে ঘরে, এমনি হয়েছে বেড়াগুলোর অবস্থা। নতুন বেড়া দিতে হবেনা? ঘরের সুমুখের চালটায় গেল বছর নতুন ছন দিয়েছে। পেছনের চালটা যদি এবার ছেয়ে না দেওয়া যায় তবে বর্ষায় আর রক্ষে আছে?
সবই তো বুঝলাম কিন্তু মিঞা যদি না শোনে? জিজ্ঞেস করে সেকান্দর।
শুনবে না কেন? আমরা তো আর ফাঁকি দিচ্ছি না। সামনের সনে যেমন করে হোক দেব, মুখের করার আমাদের। তর্ক করে লেকু।
এক সনেরও আদায় দিবি না, আর মিঞাকে বললেই মিঞা তোমার আর্জি রাখবেন? বলল কসির।
বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে গেলেও অন্ততঃ একটা বছরের খাজনা হাতে নিয়ে যেতে হবে। কসিরের কথাটাকেই অন্য ভাবে ঘুরিয়ে বলল ফজর আলি, লেকুর দোস্ত।
বেশ, তোমাদের ট্যাক ভর্তি, তোমরা দাও গে। আমার ট্যাক খালি, আমি দিতে পারব না। এবার সত্যি চটে যায় লেকু। ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠেছে,

স্বরটা চড়েছে। একমাত্র লেকুই বেঠিক, আর ওরা সবাই ঠিক, কী যে কথা বলার ঢং ওদের!

না দিলে চলবে কেন, ক্রোক করবে যে। শান্ত স্বরে আশু বিপদটার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেকান্দর!

করুক। রামদয়ালের অনেক খালি ভিটে পড়ে রয়েছে, তারই একটাতে গিয়ে উঠে পড়ব। মিঞার প্রজা অথবা রাম দয়ালের প্রজা, কথা তো একই। চাষাভূষোর আর কি 'ভবিষ্য'! যেন আগে থেকেই সব ঠিক করা, এমনি ভাবেই বলে গেল লেকু।

বাপদাদার ভিটে। একেবারে ছেড়ে দিবি? লেকুর দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন বলে ফজর আলি।

মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় লেকু। অমন যে চটাং চটাং কথা ছুঁড়ছিল সে সব কথা কে যেন নিমেষের মাঝেই কেড়ে নিল ওর মুখ থেকে।

বাপদাদার কথা এলেই কেমন যেন হয়ে যায় এ গাঁয়ের লাঙল-ঠেলা মানুষ-গুলো। বাপদাদা ধর্মকর্ম করতো তাই ওরাও ধর্মকর্ম করে, মসজিদে যায়, শিন্নি দেয়। মিঞা সৈয়দদের সেলাম দিয়ে এসেছে বাপদাদা, ওরাও দেয়। বাপদাদা লাঙল ঠেলতে শিখিয়েছে, পুবের পথ দেখিয়েছে, পাহাড়ের পথ চিনিয়েছে, বিদেশের ঠিকানা দিয়ে গেছে। তাই ওরা লাঙল ঠেলে, পুবে যায়, বিদেশকে ভয় করে না। পদে পদে ওদের অতীতের বন্ধন। প্রশ্নাতীত ওদের আনুগত্য বাপদাদার নামে চলতি অনুশাসনের প্রতি। বুঝি সব দেশের সব যুগের কৃষকরাই এমনি, অতীত ওদের বড় প্রিয়। নিত্য কর্মে নিত্য ভাবনায় তাদের অতীতের টান, স্মৃতির সঞ্চালন। ভিটিটা সে অতীতেরই মূর্ত প্রতীক, মৃত বাপদাদার জীবন্ত নিশানি।

সেই ভিটি ছেড়ে যাবে লেকু? সেই আব্বাজানের ভিটি? আজও যার হাতের কাজের সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামে গ্রামে? রাগের মাথায় ক্রোকের কথাটা একদম খেয়াল ছিল না ওর। কেমন আনমনা হয়ে গেল লেকু। চেয়ে রইল মাষ্টারের দাওয়ার দিকে। কখন দু ফোঁটা পানি এসে জমেছে ওর চোখের কোণে। ঝরে পড়বার আগে টলটলিয়ে উঠে ফোঁটা দুটো। ওরা দেখল। ওরা মুখ নাবিয়ে নীরব হল।

শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এল ওরা। ওরা আর কি বলবে? কতই বা 'বুঝ' ওদের! মিঞার সাথে বোঝাপড়া, আপোসরফা, যাই করতে হয় মাষ্টার করুক, তার কথাই সকলের কথা। ওরা চলে যায়।

সরল গাঁয়ের মানুষ। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলেই বুঝি শিক্ষা আর শিক্ষিতের প্রতি অমন ভক্তি ওদের। যারা এলেম হাসিল করেছে তার হল খোদার খাস বান্দা, রসুলের পেয়ারা। ইহলোক পরলোক তাদের করায়ত্ব। বাপদাদার মুখ থেকে আরো হাজারটি উপদেশের মাঝে, এই উপদেশটাও শুনেছে ওরা। সে ভক্তিটাই ওরা দেয় সেকান্দর মাষ্টারকে। আজ সংকুচিত হয় মাষ্টার। অমন বিশ্বাস, শ্রদ্ধাভক্তির বিনিময়ে ওরা যা চায় সেটা দেবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা কোথায় মাষ্টারের? ভাবতে ভাবতে যেন আরো সংকুচিত হয়ে আসে সেকান্দর মাষ্টার।

বাকুলিয়ায় শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে তো মিঞা আর সৈয়দদেরই এক-চেটিয়া। বাকুলিয়ার প্রজাকুল ওদের এই এলেমকে সম্মান দেয়, যখন যায় তালতলির হাটে বুক ঠুকে তর্ক করে, আমাদের বাকুলিয়ার মিঞাদের মতো অতোটা পাশ কাদের আছে? তালতলির ঘরে ঘরে বি, এ, এম, এ, পাশ, তাই তালতলির মানুষ হয়ত মুখ লুকিয়ে হাসে। সে হাসিতে বাকুলিয়ার কৃষক একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, বলে, ওটা হিংসে।

কিন্তু সেকান্দর মাষ্টারকে নিয়ে ওদের গৌরবটা অন্য ধরনের। সে যেন ওদের আপন জন, ঘরের ছেলে। সন্তানের গৌরবে গর্বিত পিতার মতো সেকান্দর মাষ্টারের কথা বলতে বলতে বাকুলিয়ার কৃষকদের বুকটাও ফুলে ওঠে। ও যে কৃষকের সন্তান। আর মিঞা এবং সৈয়দ বাড়ির বাইরে একমাত্র সেকান্দরই তো দু দুটো পাশ দিয়েছে, বি, এ, পর্যন্ত পড়েছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে এমন একটা ছেলেও তো নেই বাকুলিয়ার কৃষকদের। তাই মাষ্টার ওদের গৌরব। ওদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্নেহপ্রীতি আর বোধহয় অনেক আশা ভরসা ওকে নিয়ে।

তুমি আমাদের লায়েক ছেলে! তোমার কাছে না এসে যাব কার কাছে? তুমিই তো করবে সব। ওরা বলে আর সেকান্দর যেন মিইয়ে যায় মাটির সাথে। ওদের জন্য কি করতে পারে সেকান্দর? ওর সেই সামর্থ্য বা স্বচ্ছলতা কোনটাই যে নেই? একটু যে চিন্তা করবে ওদের নিয়ে সে ফুরসুতই বা কই? সে তো নিজের সমস্যায় আকণ্ঠ নিমগ্ন।

স্কুলেই কেটে যায় দিনটা। সেখান থেকে মাসে মাসে যে কুড়িটা টাকা মাইনে পায় ছাঁকা আয় বলতে একমাত্র ওটাকেই ধরা যায়। জমি আছে দুকানি। তার জন্য একখানা হালও রাখতে হয়েছে। জমির ফসল আর স্কুলের মাইনেয় মোটামুটি চলে যায় সংসারটা। ভাই সুলতান, বোন রাশু আর মাকে নিয়ে ওর যে সংসার তার চাহিদাও হয়ত বেশি নয়, ডাল ভাত আর সাফ কাপড়।

কিন্তু শুধু 'চলে যাওয়াতেই' যে সন্তুষ্ট নয় সেকান্দর। আব্বাজানের আকস্মিক মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে ওকে। সেই অবস্থাতেই আই, এ,-টা পাশ করেছে। ভর্তি হয়েছিল বি, এ-তে কিন্তু ওই সংসারেরই তের ঝঞ্ঝাটে পড়াটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অথচ কত স্বপ্নই না ছিল ওর। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্খাটা পুরনো ক্ষতের মতো আজও জেগে ওঠে, মনে আর শরীরে যন্ত্রণা ছড়ায়। তাই নিজেকে একটা গোপন শপথে আবদ্ধ করেছে সেকান্দর-ছোট ভাই সুলতানকে যেমন করে হোক বি, এ,-টা পাশ করাবে, এবং ভালো ভাবেই পাশ করাবে। ক্লাস এইটে পড়ছে সুলতান। ওর কলেজের খরচের জন্য এখন থেকেই একটা দুটো করে টাকা জমিয়ে চলেছে সেকান্দর। জমাতে গিয়ে পরিশ্রমটা ওর একটু বেড়েছে বই কি! চাকরটাকে বিদেয় দিয়েছে। শুধু খন্দের কয় মাস একটা 'গাবুর' রাখে। সেই গাবুরের সাথে সেকান্দর নিজেও ফুরসুত মতো হাল ধরে। ডাল খেসারি, এ সব ফসলের জন্য ও নিজেই চাষ দেয়, বীজ বোনে। দিনের কাজগুলো সেরে বিকেল বেলায় যেতে হয় সৈয়দ বাড়ি রাবু আর আরিফাকে পড়াতে। মাস মাস সৈয়দ বাড়ির ওই দশটি টাকা বড় লোভনীয়। সব দিক সামাল দিয়ে চলার জন্য ওই টাকাটা একটা নিশ্চিন্ত অবলম্বন। বিকেলটা সৈয়দ বাড়িতে কাটে বলে সুলতানকে নিয়ে রাত্রে আর বসা হয়ে উঠে না। সকালেই ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হয়।

দিন আর রাতের এমনি একটানা খাটুনীর পর লেকু কসিরের কথা, বাকুলিয়ার কথা চিন্তা করা, এ কেমন করে সম্ভব হবে! কখনো সম্ভবও হয়নি। কিন্তু আজ লেকু ওরা সমস্ত দায়িত্বটাই ওর উপর ছেড়ে দিয়ে গেল কেন? এ কি ওদের-বিশ্বাস অথবা ওকে একটু বাজিয়ে দেখবার ছল! সে কখন চলে গেছে ওরা, তবু উঠোনে ওই বৈঠকের যায়গাটিতেই বসে বসে ভাবছে সেকান্দর।

কি বলবে ও ফেলু মিঞাকে? সেই হুরমতির বিচারের দিন সেকান্দরের কথায় ফেলু মিঞা রীতিমত নাখোস হয়েছে সে তো স্পষ্ট। এর পর ফেলু মিঞা কি শুনবে ওর কোন আর্জি? তা ছাড়া ওর নিজেরই যে খাজনা বাকী তিন সনের। নিজেরটা পরিষ্কার না করে অন্যের জন্য কেমন করে সুপারিশ করবে ও? মনে মনে একটু হিসেব কষে নিল সেকান্দর। সামনের ঈদের জন্য কয়েকটা টাকা তুলে রেখেছে ও। সেই টাকার সাথে চলতি মাসের মাইনেটা যোগ করলে বকেয়া খাজনা শোধ হয়ে যাবে। ঈদের ভাবনা ঈদের সময়টাতেই ভাবা যাবে।

তাই ঠিক করল সেকান্দর। নিজের 'জমাটা' পরিষ্কার থাকলে অন্যদের জন্য আবেদন করতে বাধবেনা ওর।

অন্ধকারটা ঘন হয়ে রাতের খবরটা জানিয়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে সৈয়দ বাড়ির দিকে পা বাড়াল সেকান্দর।

সেকান্দরদের উঠোন থেকে বাইরে যাবার পথটা রমজানের গোয়াল ঘর ঘেঁসে। লেকু কসিরকে আসতে দেখেই চুপি চুপি গোয়াল ঘরে গিয়ে আড়ি পেতেছিল রমজান। শুনছিল ওদের আলোচনা। শুনতে শুনতে শরীরের রক্ত ওর মাথায় চড়েছিল আর কি এক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছিল ওর মাথার খুলিতে।

কমজাত ছোট লোকের দল জোট বাঁধতে শুরু করেছে? আবার গুরু ঠাউরেছে মাষ্টারকে! কেন রমজানকে চোখে পড়ে না, না চোখে লাগে না তোদের? রমজানের কাছে এলে সে কি কোন একটা পথ বাতলে দিতে পারত না? কে না জানে রমজান ফেলু মিঞার ডান হাত বাঁ হাত…ব্যাটা লেকু, গায়ে চর্বি বড় বেশি হয়ে গেছে ওর। বলে কিনা, 'শুয়রের জাত রমজান'? যদি হতি মরদের বাচ্চা তবে রমজানের মুখের উপরই কথাটা বলতি। বলে দেখতি কত তোর মাজার জোর। মনে মনে গজরায় রমজান আর বড় ঘরে গিয়ে মাচাং থেকে এক ঝটকায় কামিজটা হাতে নেয়। তারপর কামিজটা কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে পড়ে।

কমজাত কি আর সাধে বলে! বোঝেনা নিজের স্বার্থটাও। রমজান তো শুধু মিঞার নায়েব নয়! আরো কিছু। চাষী আর মিঞার মাঝে রমজান হল গিয়ে এক সেতু। কত জনের কত দরবারে নিয়ে ও যায় মিঞার কাছে। মিঞা শুধু চোখ তুলে একবার তাকায় ওর দিকে, যেন শুধায়, তুমি বলছ? তারপর যা চায় রমজান তা-ই মঞ্জুর করে দিয়ে অল্প হেসে কাজে মন দেয় ফেলু মিঞা।

চাষী আর মিঞার মাঝামাঝি এই যে একটা মর্যাদা রমজানের, এতো নিছক একটি মর্যাদাই মাত্র। আর কি? না এতে দুটো পয়সা আমদানি হয় রমজানের, না কোন বিশেষ সুবিধে। এমন ব্যবস্থায় ফেলু মিঞা তো খুসি হয়েই সায় দিয়েছে। কিন্তু কমজাতের বাচ্চাগুলো, রমজানের নাম শুনলেই যেন ফোসকা পড়ে ওই ব্যাটাদের গায়ে। উপরে ফেলু মিঞা নীচে ওরা, মাঝখানের স্তরে রমজানকে বিশেষ মর্য্যাদা দিতে যেন আঁতে ঘা লাগে ছোট-লোকগুলোর। অথচ সে কি কম করেছে, না কম করে তার চাষী ভাইদের

জন্য। এই তো গেল বার জমি বর্গা দিল মিঞারা। দু কানি জমি কসিরকে পাইয়ে দিয়েছে রমজান। সৈয়দরা তো বছর বছরই জমি 'লাগিত্' দেয়। রমজানের সুপারিশেই ফজর আলির জন্য সে জমির এক কানি প্রতি বছরকার বরাদ্দ। সে সব জমিতে কি ধান হয়নি? রমজান কি গেছে সে ধানে ভাগ বসাতে? আর সেই অযাচিত উপকারের প্রতিদান…'শুয়রের জাত রমজান?' কয়েকটা দিন আগে সেই যে কসম খেয়েছিল রমজান সে কথাটা মনে পড়ল ওর। এ দুনিয়াতে কোন শালার উপকার করতে নেই। কোন শালার উপকার করবে না রমজান, কমজাতের তো নয়-ই। অকৃতজ্ঞ ছোটলোকের দল, বোঝে কি ওরা উপকারের। ওরা বোঝে রক্তচক্ষুর শাসন, ওরা বোঝে ডাণ্ডা, গুঁতো, উঠতে বসতে পায়ের লাথি।

আবার ওরই বিরুদ্ধে জোট বাঁধা হচ্ছে মাষ্টারকে নিয়ে? বেশ, বেশ, কত ধানে কত চাল সে আমারও জানা আছে। বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল রমজান।

যা ঘটেছে এবং যা ঘটেনি সব মিলিয়ে রং চড়াল রমজান। তিলকে করল তাল। সুবিস্তৃত এক ষড়যন্ত্রের গোপন জাল উদ্‌ঘাটিত হল ফেলু মিঞার চোখের সুমুখে। গুম হয়ে সবই শুনল ফেলু মিঞা। খাজনা নেবার মালিক ফেলু মিঞা। মাফ করনেওয়ালাও ফেলু মিঞাই। তার কাছে না এসে প্রজারা গেল মাষ্টারের কাছে?

সহসা রামদয়ালের পরিবর্তে সেকান্দরকেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হল ফেলু মিঞার। আপনার অশিক্ষার পাশাপাশি সেকান্দরের দুটো পাশ কেন যেন বড় হয়ে দেখা দিল আজ।

ছোটলোকের বাড় দিন দিন বেড়ে চলেছে স্যার। সময় থাকতেই ওদের থুতনিগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। নইলে বোল ছাড়লে কি যে বলে বসবে আর কি যে করে বসবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আর ওই যে সেকান্দর—মিনিমুখো, চুপচাপ থাকে ও আসলে কিন্তু শয়তানের আলি খুঁটা। দুটো পাশ করেছে বলে মনে করে নবাব সলিমুল্লা হয়েছেন তিনি। ছোটলোকগুলোকে ওইতো ক্ষেপিয়ে তুলছে। একটু থামল রমজান, বুঝি দেখে নিল মুনিবের মুখের প্রতিক্রিয়াটা। বলল আস্তে আস্তেঃ মিঞার 'পুত' আপনি। আপনার জ্ঞানগম্যি আর বুদ্ধির কাছে আমি আদ্‌না কোন্ ছার, তবু আপনার দোয়ার বরকতে দেশ বিদেশ যা ঘুরেছি স্যার তাতে যেমন মুনিব বাছতে ভুল করিনি তেমনি কমজাত কমদিলের লোকগুলোকেও চিনেছি

রোয়ায় রোঁয়ায়। আমি বলছি স্যার এখুনি যদি ওই মাষ্টারকে সজুত না করা যায় তবে বড় দুর্ভোগ এই গ্রামের। দুটো পাশের দেমাকেই হয়ত কোনদিন বলে বসবে—গ্রামের বিচার আমিই করব। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

ফেলু মিঞার মুখটাই আবার পড়তে চেষ্টা করল রমজান। অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ। রমজান কি বেশি বলে ফেলেছে? অথবা কম বলেছে। ভাবতে ভাবতেই আবার মুখ খুলল রমজান: আমিও শুনিয়ে এসেছি স্যার, বললাম—এই গ্রামে মিঞার পুত ফেলু মিঞা থাকতে তুই আবার কে রে? ব্যাটা গোলামের বাচ্চা! তুই কেন আসিস রাজপ্রজার ব্যাপারে নাক গলাতে?

এরপর বলার মত কিছু খুঁজে পায় না রমজান। শ্রোতা পক্ষ নীরব কেমন যেন নিরুৎসাহিত। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল ফেলু মিঞা, কাছারিতে আসতে খবর দাও ওদের।

বাবা, আমার জমিগুলো একটু ভাল লোক দেখে লাগিত্ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না এ কাজ। কথাটা শেষ করে রাবু, আরিফা এবং মাষ্টার সাহেবের মাঝখানের খালি চেয়ারটিতে বসলেন সৈয়দগিন্নী।

ব্যাপারটার আগামাথা বুঝতে না পেরে, সৈয়দগিন্নীর দিকে একবার তাকিয়ে চুপ থাকে সেকান্দর।

সৈয়দ সাহেব লিখেছেন, ঈদের ছুটিতে আসছেন তিনি। সবাইকে নিয়ে যাবেন কলকাতায়। গিন্নী যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। তাই জমিজমার বিলি-ব্যবস্থা গুলো স্বহস্তেই করে যেতে চায় সৈয়দগিন্নী।

কিন্তু আমাকে…

সেকান্দরের কথাটা শেষ হবার আগেই বলে ওঠেন সৈয়দগিন্নী, হ্যাঁ বাবা, তুমি ছাড়া এই কষ্টটা আমার জন্য আর কে করবে বল? ফেলুকে যে আমার বিশ্বাস হয় না, নইলে ওর জিম্মাতেই সব ছেড়ে দিয়ে যেতাম।

সহসা কোন উত্তর জোগায়না সেকান্দরের মুখে। সৈয়দ গিন্নীর গ্রাম ত্যাগের অর্থ ওর দশটি টাকার নিয়মিত আয় বন্ধ হওয়া।

ব্যাপারটা আচমকা কিছু নয়। সেই দু বছর আগে বুড়ো সৈয়দ গত হবার পর থেকেই সৈয়দগিন্নী যাই যাই করছেন। বাড়ির বড় বৌর বিদেশ বাসের প্রধান অন্তরায় ছিলেন বুড়ো সৈয়দ। সে বাধা অপসারিত হবার পরও বোধ হয় সব দিকে সামাল দিতে দিতে দুটো বছর লেগে গেছে ওদের। এবার যে সৈয়দ বাড়িতে সত্যি সত্যি তালা পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই সেকান্দরের।

পুকুরগুলো বড় দূরে দূরে। তোমার পক্ষে নজর রাখা সম্ভব হবে না। ওগুলো ইজেরা দিয়ে দিও। আর খেয়াল রেখ, ফসলে কিন্তু ভারি ঠকায় ভাগচাষীগুলো। পনেরো মণ ফসল হলে, বলবে দশ মণ। তোমাকে পাঁচমণ দিয়েই বুঝ্ দেবে। মিথ্যে আর ফাঁকির রাজা ওই চাষাগুলো, সে তো জানই··· ।

উঠি স্যার? সৈয়দগিন্নীর কথার মাঝেই বলে উঠল মালু। অনেকক্ষণ ধরেই উঠবার জন্য উসখুস করছে ও।

যা যা, আজ ছুটি। রাবেয়া আরিফা তোমরাও যাও। এশার নামাজটা পড়ে নাও। আমি এসে ভাত দেব। সৈয়দগিন্নীই ছুটি দিয়ে দিলেন ওদের। মুন্সিজীরা থাকবেন। মক্তবটা দেখবেন মুন্সিজী। ওঁর মাইনেটা খাজনা আদায়ের টাকা থেকে দিয়ে দিও। আর বছরের খোরাকিটা খন্দ শেষে একসাথেই আলাদা করে দিয়ে দিও ওঁদের। এত কাজ হয়ত একলা সামলাতে পারবে না তুমি। একটা 'গাবুর' রেখ, মাইনেটা আমার খরচা থেকেই যাবে। এতটুকু বলে থামলেন সৈয়দগিন্নী। বুঝি ভাবলেন। ভেবে চিন্তে বললেন, তোমার বাড়ির পেছনে আমাদের তিন কানি জমি আছে না? সেই জমির ফসলটা তোমার খরচা বাবদ নিয়ে নিও তুমি।

যেন সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেছে এমন ভাবে বলে গেলেন সৈয়দ-গিন্নী।

সেকান্দরের মনে হল আপন ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বাসের চেয়েও সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহ বিতরণের ইচ্ছেটাই যেন প্রবল। সেকান্দরের বাঁধা আয়টা বন্ধ হয়ে যাবে। হয়ত সেটাই পুষিয়ে দিতে চান সৈয়দগিন্নী তে-গুনা কিংবা চৌ-গুনা আয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহ ফেলু মিঞার সাথে যে চির শত্রুতার সূত্রপাত করে যাবে তার কি হবে? তা ছাড়া আদায় তহশিল বিলি বণ্টকের অত ঝঞ্ঝাট কি সামলাতে পারবে সেকান্দর? অথচ লোভনীয় আয়ের কেমন একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ। দু বছরেই হয়ত নিজের কোন-রকমে-চলে-যাওয়া সংসারের অবস্থাটা পাল্টিয়ে ফেলতে পারে সেকান্দর।

সেকান্দরের দ্বিধাটা এতই স্পষ্ট যে এবার আর চোখ বুজে থাকা সমিচীন মনে করলেন না সৈয়দগিন্নী। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! এত সংকোচ কেন তোমার? তুমি তো আর পর নও আমাদের।

সৈয়দ গিন্নীর এই অযাচিত আত্মীয়তায় বুঝি আরও সংকুচিত হয়ে আসে

সেকান্দর। কিন্তু সৈয়দ গিন্নীর তিরস্কারের চোখ দুটো এখনও ধরা ওর মুখের উপর। ও বলতে পারেনা কিছু।

রাবু আরিফা যখন পর্দা নিল তখনই তো কথাটা উঠেছিল। সবাই বলল এখন তো ওরা আর বেগানা পুরুষের সামনে যেতে পারবেনা, মাষ্টারকে বিদেয় দাও। আমি বললাম, তা কেন হবে? সেকান্দর তো আমার জাহেদেরই মত, ঘরের ছেলে। বলতে বলতে অপত্য স্নেহে সত্যি বুঝি নরম হয়ে আসে সৈয়দ গিন্নীর চোখজোড়া।

ভেবে দেখি বলে বেরিয়ে এল সেকান্দর।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না, কুয়াশার সাথে মিশে গাঢ় ধারায় ঝরে পড়ছে। শীত মাটির খটখটে রাস্তা। জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্যটা কি এক সোহাগী আলস্যে শয্যা নিয়েছে ওই লক্ষ পায়ে মন্থন-করা পথের বুকে। আর সেকান্দরের পায়ে পায়ে বুলিয়ে দিচ্ছে স্নেহসিক্ত স্পর্শ। আশ্চর্য হয় সেকান্দর, আজকের এই জ্যোৎস্নাসিক্ত মাটির আদ্র স্পর্শটি ওর মাঝে সঞ্চারিত হবে বলেই যেন দিন কয় আগে ওর কেম্বিসের জুতোর তলাটা ফেটে গেছিল। নিজের মনেই হাসল ও। দারিদ্র্যকে সহনশীল এমন কি মহান করে তুলবার কত যুক্তিই না রয়েছে পৃথিবীতে। আপন অক্ষমতা আর ব্যর্থতাকে ঢাকাবার জন্য দরিদ্রকুলই কত সান্ত্বনা আর দর্শনের প্রলেপ আবিষ্কার করে নিয়েছে। সেকান্দরের মনে পড়ল ওই তালতলি স্কুলেই ছোট বেলায় শোনা সতীশ স্যারের নীতি কথা: যারা দরিদ্র, নিরন্ন তাদের ভেতর থেকেই তো জন্মেছে যত মহাপুরুষ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এ্যাব্রাহাম লিংকন, আরও অনেক নাম বলতেন সতীশ স্যার। সে সব নাম যথা সময়ে অর্থাৎ কলেজ ছেড়েই ভুলে গেছে সেকান্দর। বক্তৃতার শেষে বলতেন সতীশ স্যার—দরিদ্রকে হেলা করনা।

কলেজে এসে সেকান্দর নজরুলের দারিদ্র্য-বন্দনা পড়েছিল আর সতীশ স্যারের নীতি কথাটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার ব্রতও নিয়েছিল। বিশ্বাস করিয়েছিল নিজেকে—প্রতিভা আছে তার, দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেই সে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। কিন্তু অভিভাবকহীন দরিদ্র সংসারের অভাব নামক নিষ্ঠুর দৈত্যটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওর শৈশব আর কৈশোরের সেই বিশ্বাস। বি. এ, পাশ করার স্বপ্নটা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে যেদিন মা আর ভাইবোনের মুখে অন্ন তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়ে ও ফিরে এসেছিল বাকুলিয়ায় সেদিনই সে বিশ্বাসের মিনারটা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল। সেই ভগ্নবিশ্বাসের জঞ্জালের উপরই জন্ম নিয়েছিল আর একটি বিশ্বাস—বিপুল ঐশ্বর্যের লালনার অভাবে

এ দেশ রবীন্দ্র প্রতিভা নামক কোন বস্তুর সাক্ষাৎ পেত না কোনদিন। সেদিন থেকে নিজের উপর কোন মোহ ছিল না সেকান্দরের।

বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নামটাই যে কেন মনে পড়েছিল বলতে পারে না সেকান্দর। আজ একটু অবাকই হল ও।

অবশ্য এইটুকু লেখাপড়া নিয়েই বিদেশ গিয়ে নিজের ভাগ্যটা একবার পরখ করে দেখতে পারত সেকান্দর। কিন্তু ওর মনটা গ্রাম ছাড়তে সায় দেয়নি। কি যেন আছে বাকুলিয়া গ্রামে আর তালতলির স্কুলে যা ওকে বন্দী করে রেখেছে এই কয়েক মাইল পরিধির জগতে।

কিন্তু আজ তো অতি সহজেই ও ফিরিয়ে ফেলতে পারে নিজের অবস্থাটা। টেনেটুনে কড়া ক্রান্তির হিসেব করে করে দিন গুজরানের যে অভিশাপ তা থেকে মুক্তি পেতে পারে অতি সহজে। ছোট ভাই সুলতানের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে এতটুকু বেগ পেতে হবেনা ওর। একটা সহজ স্বচ্ছলতায় সুন্দর আর শ্রীময় করে তুলতে পারে সংসারের চেহারাটা। আর, যে চিন্তাটাকে মনের ধারে কাছেও ঘেঁসতে দেয় না ও, মা ঘেনর ঘেনর করে শুধুই ধমক খায় ওর, সেই একটি লাজুক লাজুক লক্ষীমতী বৌর কথাটাও ভাবতে পারবে বই কি সেকান্দর। জমাতে হবে দুটো পয়সা, একটি বাড়তি মুখ মানে সেই আশায় জলাঞ্জলি। তাই তো ওই চিন্তাটাকে কখনো মনের কিনারে ঠাঁই দেয়নি সেকান্দর।

সমস্ত দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার এমন অভাবনীয় সুযোগ পেয়েও সেটা গ্রহণ করতে এত দ্বিধা কেন ওর? ফেলু মিঞার রোষবহ্নির ভয়? অপরের অনুগ্রহ গ্রহণ করে আপনাকে ছোট করতে চায় না সেকান্দর? অথবা অন্য কিছু। নিজের মাঝেই কোন স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পায় না সেকান্দর।

শীত রাতের কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাটা কেমন যেন থকথকে। মুখে আর হাতে পায়ে মেখে দেয় কি এক ভাললাগার পরশ। ক্ষণিকের জন্য এই ভালোলাগাটা অন্য সব দুর্ভাবনাকে বুঝি দূর করে দেয় সেকান্দরের মন থেকে। কিন্তু রোমাঞ্চ নেই এই ভালোলাগায়। নেই কোন শিহরণ। এ যেন সদর রাস্তার লম্বা বাঁকটি এড়িয়ে কোনাকুনি মেঠো পথ ভেঙ্গে সময় এবং শ্রম বাঁচিয়ে ওই তালতলির স্কুলে পৌছানোর আনন্দ। আনন্দটা ফাঁকির, প্রাপ্তির নয়।

কতই বা রাত হয়েছে। সন্ধে সন্ধ্যি গিয়েছিল সৈয়দ বাড়ি। বড় জোর ঘণ্টাখানিক ছিল সেখানে। এরি মাঝে গ্রামটা নিঝঝুম. যেন মুখ থুবড়ে

পড়ে রয়েছে রাতের বুকে। হঠাৎ ওর মনে হল দুটো ছায়ামূর্তি চলছে ওর পিছু পিছু, যেন ওকেই অনুসরণ করছে। ফিরে দাঁড়াল সেকান্দর। কুয়াশাটা বোধ হয় বেড়েছে, তাই চাঁদের আলোটা সাদা পর্দার মতো আড়াল করে রেখেছে ওদের। আগন্তুকদের ছায়াগুলো একটু এগিয়ে আসতেই সামনের ছায়াটি চিনতে কষ্ট হল না সেকান্দরের। ওটা মালু। কিন্তু, আপাদমস্তক চাদরে মোড়া পেছনের ছায়াটি কার? আরো এগিয়ে আসতে বুঝি চিনে ফেলল সেকান্দর।

হুরমতি? আর একটু হলে বুঝি চেঁচিয়েই উঠছিল সেকান্দর। এরি মাঝে কি সেরে উঠল হুরমতি? সেরে উঠে আবার রাস্তায় বেরিয়েছে? আরো আশ্চর্য, সামনে আসতেই হুরমতি মাথার চাদরটা ফেলে দিয়ে যেন সেই ছেঁকা খাওয়া কপালটা ওকে দেখাবার জন্যই দাঁড়িয়ে পড়ল।

তালতলি। কবির গানে। ভয়ে ভয়েই বলল মালু। পড়ার বইগুলো দেরাজে রেখেই তো ছুট্ দিয়েছে ও। হুরমতি তৈরী হতে দেরী করেছিল, তাই তো এভাবে মাষ্টার সাহেবের মুখোমুখি পড়তে হল।

হঠাৎ মনে পড়ল সেকান্দরের এ কয়দিন পড়াশোনায় নিয়মিত ফাঁকি দিয়ে আসছে মালু। ও নিজেও বুঝি একটু ঢিল দিয়েছে এ কয়টা দিন। বলল সেকান্দর—যা। পড়াশোনায় বড্ড্ ফাঁকি দিচ্ছিস কিন্তু।

পাশ কাটিয়ে দখিন খেতের রাস্তা ধরে ওরা।

চাঁদের আলো হুরমতির কপালের কলঙ্কটা ঢেকে রেখেছে। তবু কেন যেন ওর দিকে তাকাতে পারলনা সেকান্দর। মেয়েটির স্বভাবের প্রতি এক আধলাও শ্রদ্ধা নেই সেকান্দরের। কিন্তু ওর সাহসের কাছে মাথা নত না করে পারে না সেকান্দর। সেই ছেঁকা দেবার দিনও দেখেছে, আজও দেখল। গোটা গ্রাম মিলে কলঙ্কের দুরপনেয় স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে ওর ললাটে, একঘরে করেছে। তবু এই গ্রামের পথ দিয়েই ও হেঁটে চলেছে অকুতোভয়ে। ওর অপসৃয়মান ছায়াটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে আজ কেমন অপরাধী মনে হল সেকান্দরের। লঘু পাপে গুরুদণ্ডের মতো অন্যায়টিকে ওরা কেউ রাখতে পারল না, না সেকান্দর, না লেকু কসির মিলে গ্রামের যে মানুষ, তারা।

ফেলু মিঞার কাছারির দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সেকান্দর।

সেলামের পর্ব সেরেই কথাটা পাড়ল সেকান্দর। ধৈর্য ধরে শুনল ফেলু মিঞা। শোনার পর বলল, তোমার যদি অসুবিধে হয় যা পার দিয়ে দাও আপাততঃ, বাকীটা দিও যখন খুশি।

রমজানের বর্ণনায় সেকান্দরের উপর বিরক্ত ও উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল ফেলু মিঞার। একটু যে উত্তেজিত হয়নি, তাও নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নিজের রাগটার রাশ টেনেছে ফেলু মিঞা। হাজার হোক এই গ্রামের অপর দশটা পরিবারের মতো সেকান্দরের বাপদাদারও মিঞাদের খেয়ে, মিঞাদের ক্ষেতে মেহন্নত করেই বেঁচেছে, মানুষ হয়েছে। সেই মিঞাদের বংশধর হয়ে ফেলু মিঞা বদদেমাগী হবে কেমন করে!

লেকু ফেকুদের ব্যাপার নিয়ে তুমি কেন মাথা ঘামাতে যাও? ওটার জন্য আমার নায়েব আছে, আমি আছি। ক্ষতি করব না কোন প্রজার—এটা তো মান? হিতাকাঙ্খীর সদুপদেশের মতো ধীর কণ্ঠে বলে ফেলু মিঞা। দুবছর পর পর দুর্যোগ গেল, ওরা কোত্থেকে খাজনা দেবে? ওদেরও কিছু মাফ করে দিন, নতুবা যা নেবার সে নেবেন আগামী সনে। অনুরোধের স্বর ফোটাল সেকান্দর।

সহসা ভ্রূ জোড়া কুঁচকে চোখ দুটোকে ছোট এতটুকু করে আনল ফেলু মিঞা। ছুরির মতো তীক্ষ্ণ আর ধারালো স্বরে বলল, রাজস্টেট কি খাজনাটা মাফ দেয় আমাকে।

এর পর সেকান্দরের বলার কিছু থাকে না, আস্তে উঠে পড়ে ও।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবে সেকান্দর। বিছানায় শুয়ে শুয়েও শেষ হয় না ভাবনাটা। কাল সকালেই তো আসবে ওরা। কী বলবে সেকান্দর? দিও না খাজনা, ক্রোক আসুক! ক্রোকই বা লাগবে কেন? রমজানকালুর দল লাগিয়ে ফেলু মিঞা যদি ভেঙ্গেই দেয় ওদের ঘরগুলো, লাঙল চালিয়ে সমান করে দেয় ভিঁটিভুঁটি, কি করবে ওরা? কি করতে পারে? বাধা দিতে গেলে, বড় জোর দু একটা খুন জখম হবে। আর খুন হলেই বা কি! এই পড়তি অবস্থায়ও দু চারটা খুন হজম করে নেবার শক্তি এবং বুদ্ধি দুই-ই আছে মিঞাদের।

কি যে করবে ওরা সেটা যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে সেকান্দর। ওরা যাবে রামদয়ালের কাছে। টাকা নেবে, মিটিয়ে দেবে মিঞার পাওনা। বাকুলিয়ার আরো কিছু জমি যাবে রামদয়ালের পেটে, আর ওই লোকগুলো সম্বৎসর উপবাসের চিত্রটা কল্পনা করে এখুনি আধমরা হবে। যদি তাকত পায় শরীরে তা হলে চলে যাবে পুবে অথবা উত্তরের পাহাড়ে। যখন ফিরে আসবে সেই তখন দুটো ভাত পেটে পড়বে বৌ বাচ্চাদের। কিন্তু জমি? জমি যে গেল সে তো আর উদ্ধার করতে পারবে না ওরা। এমনিই হয়। এমনিই হচ্ছে,

সেই ছোটবেলা থেকেই তো দেখে আসছে সেকান্দর। রেহানী জমি কথনো ফিরে আসে না কৃষকের হাতে।
এ ছাড়া অন্য উপায় আছে কি? মাঝ রাতেও চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায়না সেকান্দর। কি হল সেকান্দরের? এ সব চিন্তা তো কোনদিন গিঁট পাকায়নি ওর মাথায়? পাঁচজনে মিলে বিশ্বাস করে ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে, তাই বলে এমন অস্থির হতে হবে কেন ওকে? ফেলু মিঞার দয়া হয়নি অতএব যার যা করার কর গিয়ে। সেকান্দর মাষ্টারের কিছুই করার নেই। সব চিন্তা দূরে সরিয়ে ঘুমের আরাধনায় মন দিল সেকান্দার।
ঘুম বুঝি হোল না। দুটো পাশ ফিরতেই সকাল হয়ে গেল। কি সব অশ্রাব্য গালিগালাজ কানে এসে ওর চোখের পাতাগুলো আল্গা করে দিল। চোখ মুখে এক কোশ পানি ছিঁটিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল সেকান্দর।
হারামজাদা বেজন্মা, কুত্তার বাচ্চা। গর্দান তোর মটকিয়ে ভাংব, রক্ত তোর চুষে চুষে খাব। বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা...
কার বিরুদ্ধে আস্ফালন করে চলেছে রমজান, আর গিরোয় গিরোয় টিনের পাত দিয়ে বাঁধা বাঁশের লাঠিটা অনবরত শূন্যে ঘুরিয়ে চলেছে। লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতেই ডাঙ্গা পেরিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে রমজান, যেখান থেকে লেকুদের বাড়ির কলা গাছের ঝাড়টা চোখে পড়ে সেই উঁচুমত ফাঁকা যায়গাটিতে।
রমজানের এমন হিংস্র ক্রুদ্ধ মূর্তি ক্বচিৎ দেখেছে সেকান্দর। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে ও ঠাহর পায়নি, উঠোনের মাঝখানে বাঁধা রমজানের গাই-গরুটি। গাইটির গা-ময় ছোপ ছোপ রক্ত। মাঝে মাঝে গাইটির দিকে তাকিয়ে রমজান যেন হিংস্রতর হয়ে উঠছে। আক্রোশে ফুলে উঠছে ওর শরীর। বাতাস চিরে চিরে হুংকার ছাড়ছে। সেই হুংকারের সাথে সাথে গালভর্তি পানের পিক ছিঁটকে পড়ছে ওরই গায়ে, আশপাশে। ভারি পায়ের গোড়ালিগুলো ঠনঠনে উঠোনের মাটিতে যেন ঠং ঠং করে বাজছে, যেন কাঁপছে উঠোনটা। কে না চেনে রমজানের এই হিংস্র বীভৎস চেহারা। বাকুলিয়ায়, গোটা মৌজায় এ চেহারা মূর্তিমান ত্রাস। প্রমাদ গোনে সেকান্দর, একটা খুনখারাবি কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে রমজান।
ঘটনাটা ঘটেছিল সেই:সোবেসাদেকের সময়। আম্বরি উনুনের ছাই ফেলতে গিয়েছিল বাড়ির পেছনে। ছাই গাদাটা একেবারে বাড়ির শেষ সীমায়। তারপর একটা গড়। গড়ের ওপারে ওদের এক ফালি ক্ষেত। কার্তিকের

শেষাশেষি ওই ক্ষেতটায় লেকু ছিঁটিয়ে দিয়েছিল খেসারি, ওরা বলে বাউলা। ছাই ফেলতে এসে ক্ষেতটার উপর একবার চোখ বুলোনো আম্বরির রোজকার অভ্যাস।

ও দেখত, শীষ গজালো বাউলার। শীষ থেকে বেরিয়ে এল কচি কচি পাতা। শীষটা বাড়তে বাড়তে লতিয়ে গেল। সেই লতা থেকে লকলকিয়ে উঠল চিকন চিকন সবুজ শাখা। সবটা মিলে পুষ্ট হল, থলথলিয়ে উঠল সবুজ লতানো দেহগুলো। ফুল হল, ফুলের বুক চিরে বেরিয়ে এল ছড়া।

ছাইয়ের ডালাটা কোমর থেকে নাবাতে ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকত আম্বরি। লতানো দেহগুলো ছড়ার ভারে নুয়ে পড়েছে। পাতারাও ঢাকা পড়েছে ছড়ার আড়ালে, এত ঘন হয়েছে বাউলার ছড়া। গড়টা পেরিয়ে একবার আলের উপর গিয়ে দাঁড়াত আম্বরি; মাটি দেখা যায়না, গোটা জমিনটা যেন এক হাত পুরু সবুজ কাঁথায় ঢাকা পড়েছে।

ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে বাউলা পাতার রং, ছড়াগুলোও হলদেটে হয়ে ওঠে। ওরা ঠিক করেছিল, আর কয়টা দিন গেলেই তুলে আনবে বাউলা-গুলো। ইতিমধ্যে কাঁচা বাউলাও দুচারদিন খোলায় ভেজে খেয়েছে ওরা। লেকুর বেজায় আপত্তি, বলেছিল—কাঁচাই শেষ করবি নাকি।

আজ ক্ষেতটার দিকে ভাল করে তাকাবার আগেই গাদায় ছাই ফেলল আম্বরি। কোদাল নিয়ে এসেছিল ও, ছাইয়ের গাদাটা ঢিপির মতো উঁচিয়ে উঠেছে। কোদাল চালিয়ে ওটাকে সমান করে দিল ও। কিন্তু, গড়ের পারে উঠে ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই বুকটা ওর ধড়ফড়িয়ে উঠল, এ কী দেখছে ও। দুটো গরু অসম্ভব দ্রুততায় সংহার করে চলেছে বাউলা ক্ষেতটা। অদূরে উত্তর কোণে যেখানে রমজানের বাড়ির একটা সীমানা এসে মিশেছে ক্ষেতের সাথে, সেখানে দাঁড়িয়ে রমজান। ডালা কোদাল ফেলেই পড়ি মরি ছুটে আসে আম্বরি, ওর মানুষটিকে জাগিয়ে তোলে। লেকু এসে দেখে প্রায় সিকি ক্ষেত নিঃশেষ। ক্ষেতটার মাঝে খেজুর কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল লেকু, আর তিন দিক থেকেই চোখা চোখা কাঁটাওয়ালা খেজুর ডালের ঘের তৈরী করে দিয়েছিল। গরু ছাগলের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই এ সব সতর্কতা। দু হাতে দুটো খেজুর ডাল উপড়ে নিয়ে লেকু তাড়া করল গরু দুটোকে। একটি ছুটে কোনরকমে পালিয়ে গেল। কিন্তু গাইটা পালাবার পথ পেল না। উন্মাদের মত লেকু পিটিয়ে গেল গাইটাকে। লম্বা লম্বা কাঁটাগুলো গভীর ক্ষত করে বসে গেল গাইটার গায়ে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে লেগে

রইল গোশতের ভেতর। কসির যাচ্ছিল তালতলি কামলার কাজে। সে-ও একটা কাঁটা ডাল তুলে নিয়ে লেগে গেল পিটুনী যজ্ঞে। কাঁটায় কাঁটায় বুঝি জর্জর হল গাইটার শরীর, রক্ত ঝরল ফোঁটা ফোঁটা, থক থক রক্ত জমল চামড়ার ওপর। অবশেষে প্রাণভীতু পশুটা শেষ শক্তি টেনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। লেকু কসিরের রাগটাও বোধ হয় পড়ে এসেছে ততক্ষণে।

রমজান ভাবেনি এতদূর গড়াবে ব্যাপারটা, এমন মারাত্মক ভাবে জখমি হবে গাইটা। পয়লা বিয়ানের গাই। রোজ দেড় সের করে দুধ দিচ্ছিল। এ জখমি সেরে উঠবে গাইটা, ভরসা কম। গাইটার শোকেই অমন ক্ষিপ্ত হয়েছে রমজান।

গাইটার গায়ে হাত রেখে চমকে উঠল সেকান্দর। কাঁটায় কাঁটায় একসার গোটা শরীর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, নীচের মাটিটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। ইস্, নির্বোধ পশুটাকে এমন ভাবে জখম করল লেকু? রমজানের প্রতি নয়, অবুঝ পশুটার প্রতি সহানুভূতিতে সেকান্দরের মনটা বিরূপ হল লেকুর উপর।

হি হি হি হি, তীক্ষ্ন হাসিতে রমজানের হু হুংকার চীৎকারটাও বুঝি তলিয়ে গেল।

রমজানের উঠোনের দক্ষিণ পারে ডাঙ্গা। ডাঙ্গা ঘেঁসে পায়ে চলা পথ। সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছে হুরমতি। কপালের পোড়াটি ওর বীভৎস এক হাঁ মেলে চেয়ে রয়েছে। এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি ঘা-টা। রাত জাগা ফ্যাকাশে মুখটা যেন হঠাৎ আলো লেগে কেমন ঝলকে উঠেছে। তালতলির কবির গান শুনে এই মাত্র বুঝি ফিরছে হুরমতি।

কেম—ন? হার্মাদির ফলটা কি খুব তিতো লাগছে এখন? হি হি হি। আবার হাসে হুরমতি। সেকান্দরের চোখে চোখ পড়ে গিয়ে যেন আরো বেশি করে হাসে ও। আর ওর হাঁ মেলা ঘা-টাও কি এক ক্রূর বীভৎসতা নিয়ে যোগ দেয় সে হাসিতে।

চীৎকার থামিয়ে কুঁতকুঁতে চোখ দুটোকে সরু করে হুরমতিকে একবার দেখে নিল রমজান। হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল হুরমতির দিকে। কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে লাঠিটা ঝুলে রইল কলা গাছের মাথায়।

বাহ্ রে আমার মরদ। মেয়েমানুষের উপর বাহাদুরি কেন? যাওনা লেকুর কাছে? যেন জিঘাংসার একখানি ছুরি ঝিলিক দিয়ে গেল হুরমতির ঠোঁটের আগায়। রমজান 'কুদে' ওঠবার আগেই মিলিয়ে গেল হুরমতি।

হারামজাদি কুচকি, নিস্ফল আক্রোশে গর গর করে রমজান।

উন্মত্ত রমজান কি যে করে বসবে কে জানে? আশংকায় বুক কাঁপে সেকান্দরের। লেকুদের বাড়ির খেজুর পাতার আব্রুটার বাইরে দাঁড়িয়ে ও ডাক দেয়—লেকু বাড়ি আছ?

দাওয়ায় বসে কোঁচের সলায় ধার তুলছিল লেকু। সেকান্দরের ডাক শুনে কোঁচটা এক পাশে সরিয়ে চলে যায় ঘরে। আম্বরির নক্সা আঁকা 'বঠনী'টা বাইরে এনে বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়। আম্বরি ঘোমটা তুলেছে কিনা একবার আড়চোখে দেখে ডাক দেয়—আসেন, মাষ্টার সাব।

বঠ্নীতে পা তুলে বসে সেকান্দর। তারিফ করে বঠ্নীর নক্সার, বলে, আম্বরি করেছে, না?

ছোট্ট একটা হুঁ বলে লেকুও তাকায় রুইতনের ঘরের মত নক্সাগুলোর দিকে। নক্সাটা যে সুন্দর, এ কথাটা কোনদিন মনে হয়নি ওর।

আম্বরি আমাদের খুব কামের বৌ, না রে লেকু? লেকুর জমাট গাম্ভীর্যটাকে একটু তরল করার উদ্দেশ্যেই বুঝি বলল সেকান্দর।

নিরুত্তর লেকু তাকায় আম্বরির দিকে। বুঝি লজ্জা পেয়ে ঘোমটাটাকে আরো কয়েক ইঞ্চি মুখের উপর নামিয়ে নিয়েছে আম্বরি।

প্রথমে ফেলু মিঞার সাথে গত রাত্রির আলাপের কথাটাই পাড়ে সেকান্দর। মেহেরবানী হয়নি তার, এখন ওরা করবে কি? লেকুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে সেকান্দর।

লেকুদের ঘরের সামনে উঠোনটুকু মাত্র কয়েকহাত। তারই মাঝে উত্তরের কোণ্টা খেজুর পাতার বেড়া দিয়ে চুলো বসিয়েছে আম্বরি। ঘরের দিকটায় বেড়া নেই, ওটা খোলা। উপরেও কোন আচ্ছাদন নেই। শীতকালে উন্মুক্ত আকাশের তলায় এমনি ভাবেই রান্নার ব্যবস্থা করে এদিকের কৃষকরা বিষ্টি-বাদলার ভয় নেই, দিব্যি খটখটে আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় খোলামেলা যায়গায় চুলো বসিয়ে রান্না করাটা চমৎকার একটি আনন্দ। খড়কুটো, শুকনো ডালপালার আগুন জলে লকলকিয়ে। রান্নাও হয়, আগুন পোহানর কাজও চলে।

শুকনো সব আম জামের পাতা, পটপটির মতো শব্দ তুলে ফাটছে, জ্বলছে। খোলায় চাল ভাজছে আম্বরি। ঠুট্ঠার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে চালগুলো। চালগুলোর সেই কাতর ছটফটানীর সাথে তাল রেখেই আম্বরির হাতের কলা ডগাটি দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে। তারপর আঙুলের

আগায় করে দুটো চাল তুলে আম্বরি পট করে ছুঁড়ে দেয় মুখের ভেতর। মুড় মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল চালগুলো ওর দাঁতের নীচে। বুঝল আম্বরি ঠিক মতোই হয়েছে 'করই' ভাজাটা। খোলাটা উপুড় করে নামিয়ে নিল 'করই'। তারপর এক চিমটে লবণ মিশিয়ে দু মুঠ বাউলা ছেড়ে দিল খোলার উপর।

আজ তো আমার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল তোমাদের, যাবে না? লেকুকে নিরুত্তর দেখে শুধাল সেকান্দর।

নাঃ, যা করার আপনারাই ঠিক করেন, এতক্ষণে মুখ খুলল লেকু। কিন্তু গলাটা ওর মুখটার মতোই কেমন ভার ভার।

লেকুর নিরুৎসাহ দেখে যে কথাটা প্রথমেই বলবে ভেবেছিল সেটাই বলল সেকান্দর: অবোধ পশুটা, ওটা তো বেকসুর। কেন অমন অমানুষের মতো মারলে ওটাকে?

লেকু তাকায় মাষ্টারের দিকে, দপ করে জ্বলতে গিয়েই নিভে যায়।

শুধু বলে, মাষ্টার সাব, আপনি, আপনিও?…শেষ করতে পারে না লেকু। কণ্ঠনালির কোন গ্রন্থিতে যেন আঁটকে গেছে কথাগুলো। অপ্রকাশিত ব্যথার মোচড়ে নীল শিরা জাগা বিকৃত মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় লেকু।

কি এক কশাঘাতে যেন জর্জর হল সেকান্দর। লেকুর অসমাপ্ত বাক্যের না-বলা কথাগুলো সাজিয়ে গেল মনে মনে: তুমি তো রমজানের জ্ঞাতি ভাই, জমি আছে, মাষ্টারি আছে তোমার। পেট ভরে মাছ ভাত খাও দু বেলা। তুমি তো বলবেই ও কথা। রমজান তোমার কাছে মানুষ, তার গরুটাও বোধ হয় মানুষ তোমার চোখে। কিন্তু লেকু, সে অমানুষ, অমানুষ…সেকান্দরের মনে হল প্রচণ্ড ঘৃণা মিশিয়ে এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল লেকু।

আম্বরি ওদের সামনে দু খোরা বাউলা মেশানো 'করই' ভাজা রেখে যায়। একটা খোরা টেনে নেয় সেকান্দর। কিন্তু খোরাটার উপর চোখ রেখেই জ্বলে উঠল লেকু। এতক্ষণের সংযমের বাঁধটা বুঝি ভেংগে পড়েছে ওর। কি রে আম্বরি; বাউলা কোথায় পেলি? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

কেন, ক্ষেত থেকে আনলাম তো?

কার হুকুমে, কার হুকুমে ক্ষেতের বাউলা ধরলি তুই? একশো বার যে না করেছি?

ইস্, গরুছাগলে খেতে পারে আর মানুষ খেলে দোষ? হঠাৎ কেমন ঠেস দিয়ে বলল আম্বরি।

ওরা যেন ভুলেই গেল তিন বাড়ির লোক সেকান্দর মাষ্টার উপস্থিত ওদের মাঝে।

মানুষ? কে? তুই? আমি? পশুর চেয়েও অধম। অমানুষ, অমানুষ। বলতে বলতে খোরাটা হাতে তুলে নিল লেকু। ছুঁড়ে মারল আম্বরির মাথাটা লক্ষ্য করে। খা, তোর বাউল তুই খা।

মাটির খোরা, আম্বরির কপালে লেগে দু টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। আর আম্বরির চোখের কোণ থেকে কান পর্যন্ত চামড়াটা দু ফাঁক করে রেখে গেল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে চোখটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে আম্বরির গাল বেয়ে। হতভম্ব আম্বরি! যন্ত্রণাটা ব্যক্ত করার ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে বুঝি।

অমানুষের জাত, বাউলা খাবার সখ? অকারণেই সেই পাশে ফেলে রাখা কোঁচটা হাতে তুলে নিল লেকু। আর বাকী রাগটুকু সেহ কোঁচটার উপরই ঝেড়ে ফেলল। সজোরে উঠোনের দিকে সোজা করে ছুড়ে দিল কোঁচটা। ঘচাং ঘিং একটা আওয়াজ তুলে মাটির গায়ে গেঁথে রইল কোঁচের তীক্ষ্ণ শলাগুলো।

অপরাধীর মতো মাটির দিকে চেয়ে রইল সেকান্দর। না পারল লেকুর দিকে চাইতে, না পারল আম্বরিকে একটা সহানুভূতির কথা শোনাতে। ত্রস্তপদে যেন পালিয়ে এল সেকান্দর। কি জন্য এসেছিল সে, আর কি হয়ে গেল। কিছুদূর এসে পেছনে তাকিয়ে দেখল খেজুর পাতার দরজাটা আলগা করে বেরিয়ে এল লেকু; হন হন করে চলে গেল তালতলির রাস্তাটার দিকে।

অপরাধ গ্লানিমার বোঝা ঠেলে অবশেষে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠে এল সেকান্দরের বুকের ভেতর থেকে। যাক, কপালের খুন ঝরিয়ে পিঠটা আজ বাঁচাতে পেরেছে আম্বরি।

কেন ও সব ছুতানাতা নিয়ে পেরেশান হও? তার চেয়ে চল তিন নম্বরের কথাবার্তাটা পাকা করে ফেলি রামদয়ালের সাথে। রমজানের নালিশটা আমলে নিতে চায় না ফেলু মিঞা।

সবই তো শুনেছে ফেলু মিঞা। ক্ষতবিক্ষত গাছটাও রমজান দেখিয়েছে। তবু এমন কথা ফেলু মিঞার? তা হলে বিচার কোথায় পাবে গাঁয়ের মানুষ! অবশ্য নিজ হাতেই বিচারটা করতে পারে রমজান। কিন্তু ফেলু মিঞা না

তার মুনিব, বাকুলিয়ার মিঞা? মুনিব থাকতে কেমন করে বিচারের দণ্ড নিজের হাতে তুলে নেবে রমজান?

মিঞা আভিজাত্যে একটু ঘা দিয়ে, সাথে সাথে তোয়াজ করে নানাভাবে কথা বলতে জানে রমজান। এ যে ওর বিদেশের শিক্ষা!

ওর ক্ষেতে গরু ছেড়েছ তুমি। সে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরও ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তোমার ও গাইটি জখমী হয়েছে। অতএব শোধবোধ, দু পক্ষই সমান, আমি বলি চেপে যাও। বিচার-কিচার করতে গেলেই হাঙ্গাম—মজলিস ডাক, সাক্ষী আনো, কম ঝামেলা নাকি?

মুনিবের নিস্পৃহতায় ক্ষুণ্ণ হয় রমজান। এ যেন ইচ্ছে করেই একান্ত অনুগতকে উপেক্ষা করা, অ-খুশি করা। তবে কি রমজানকে ওই লেকু কসির চাষাভূষোদের সাথে একই কাতারে ফেলে বিচার করে ফেলু মিঞা? একক করে পৃথক করে রমজানের কোন মূল্য নেই তার কাছে? রমজানের মনের হিসাবগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যায়। বিরস মুখে জমা খরচের খাতাটা টেনে নেয় রমজান। মাঝে মাঝে আড় চোখে লক্ষ্য করে মুনিবের মুখ চোখের চোখের হাবভাবটা।

ইংলণ্ডেশ্বর ভারত সম্রাটের খাস কর্মচারীদের তৈরী করা নক্সাগুলোর মাঝে ডুবে আছে ফেলু মিঞা। চারিদিকে তার যেন একটি ব্যূহ, কত সব নক্সা-খতিয়ান আর মানচিত্রের সযত্ন মোড়ক, কত বোস্তানী দলিলদস্তাবেজের স্তূপ। এটা খুলছে ওটা মুড়ে রাখছে, কোনটা বা প্রচণ্ড বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলছে। এ বাণ্ডিল সে বাণ্ডিল তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে ফেলু মিঞা। হঠাৎ একটা কালো এবং লাল রেখাঙ্কিত কাগজের উপর যেন হুড়মুড় করে পড়ে ফেলু মিঞা। কি এক আগ্রহে চোখজোড়া তার চিক চিক করে ওঠে। পেয়েছি, পেয়েছি, সহসা আনন্দ অতিশয্যে চেঁচিয়ে ওঠে ফেলু মিঞা, নক্সাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে দলিল দস্তাবেজের ব্যূহ থেকে। রমজানের সুমুখে নক্সাটি বিছিয়ে দিয়ে বলে: পেয়েছি, দেখ, এই যে মেঘনার মোহনা, ছোট ছোট দ্বীপগুলো দেখছ? ওই সব দ্বীপ, বড় বড় চর আর গোটা উপকূলটা তো আমাদেরই ছিল। তারপর ওই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাবুর্চি না বেয়ারা ছিল একটা সাহেব, কার্জন নাম, সে একশো বছরেরও আগের কথা হে। সেই ব্যাটা সাহেব, নিজের ঘাঁড়ে একটা বন্দুক আর দুটো ভাড়াটে বন্দুকধারী পেয়াদা নিয়ে একদিন কোত্থেকে হাজির হল, বলল, 'এ আমার জমিদারী।' তখনকার দিনে ওই দুটো বন্দুক আর সাহেবের সাদা চামড়া, এর উপর আবার

কথা? ব্যাস রাতারাতি গোটা তল্লাটটা হয়ে গেল কার্জনের জমিদারী। সেই বছরই তো আমার আব্বাজানের দাদা এক রকম বিনা যুদ্ধেই কার্জনের হাতে ওই তল্লাটটা তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন হজ্জে। এইটুকু বলে নক্সাটার উপর ঝুঁকে পড়ে আবার কি যেন দেখতে থাকে ফেলু মিঞা। তন্ময় হয়ে যায়। ডুবে যায়। আঙ্গুলের নখ দিয়ে এখানে সেখানে দাগ কাটে। এক মনে দাগ কাটে ফেলু মিঞা।

মুহূর্তের জন্য নিজের অভিযোগটা যেন ভুলে যায় রমজান। রমজানেরও হাসি পায়। চেপে রাখতে পারেনা হাসি। মুখ ঘুরিয়ে দাখিলা মুসাবিদার কাজে মন দেয় ও।

আল্লার কি কেরামতি জান? কয়েক বছর বাদেই তিন চারটে দ্বীপ, রীতিমতো পুরনো আর অরণ্যময় দ্বীপ, কার্জন ব্যাটা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছিল সে সব দ্বীপে, একদিন সব ডুবে গেল স্রোতের তলায়। সে সব দ্বীপ আবার জেগে উঠেছে। আবার ভেসে উঠেছে পানির উপর। বুঝলে রমজান? সমস্ত কাগজ-পত্র আমার তৈরী। জলদি জলদি সদরে যাবার ব্যবস্থাটা করে ফেল। কার্জন ব্যাটা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। ও সব সম্পত্তির আমরাই তো হক মালিক। সরকারকে সমস্ত অবস্থাটা জানিয়ে ফেরত চাইতে হবে আমাদের প্রাচীন সম্পত্তি। হঠাৎ থেমে যায় ফেলু মিঞার কথার তোড়। তার মনে হল রমজান যেন মন লাগিয়ে শুনছেনা। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে ওকে নিরীক্ষণ করে বলল আবার: ও বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? আরে রমজান। মুনিব তোমার স্কুল কলেজ পাশ না দিলে কি হবে, এলেম রাখে হে, এলেম রাখে। ওই তোমার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও ক্ষমতা নেই ফাঁকি দিয়ে যায় এই ফেলু মিঞাকে! আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে হাসে ফেলু মিঞা। চাবির গোছাটা নিয়ে উঠে যায়। নিজেই সিন্দুক খুলে বের করে আনে সাদা লাল সবুজ কাপড়ে বাঁধা নানা আকারের কতগুলো দলিলের পোঁটলা। আলবোলার নলটা মুখে পুরে নতুন দলিলে আবার মন দেয় ফেলু মিঞা। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে রমজান লক্ষ্য করে মুনিবের কাণ্ড কারখানা। এই রাগ, আনন্দ অতিশয্য, মুনিবের বিচিত্র স্বভাবটার থৈ পায় না রমজান। কর্ণওয়ালিসকে ছেড়ে আবার কোত্থেকে কোন্ কার্জন সাহেবকে নিয়ে পড়ল ফেলু মিঞা। রমজানের বুদ্ধিতে ধরেনা এ রহস্য। তাও জুটেই মরা সাহেব, জ্যান্ত হলে না হয় একটা বোধগম্য হেতু পেত রমজান।

কালু কালু, ডেকে ওঠে ফেলু মিঞা।

কালু দৌড়ে এসে কলকিটা তুলে নেয় হুঁকো থেকে। নতুন তামাক সাজাতে শুরু করে।

আরে ব্যাটা তামাক না। আমাদের নতুন বিয়ানের গাইটা পৌঁছে দিবি রমজানের বাড়ি। ওর গাইটা বোধ হয় বাঁচবে না। চকিতে একবার রমজানকে দেখেই আবার দলিলের স্তূপে ডুব দেয় ফেলু মিঞা।

এ হল গিয়ে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা। দিল তার দরাজ। এ দিলের পরিচয় আগেও পেয়েছে রমজান। কিন্তু এতে কি অপরাধীর সাজা হল, না ন্যায় বিচার হল? রমজানের মাথার গরম ঠাণ্ডা হয়না, পাল্টা প্রতিশোধ না-নিয়ে কেমন করে ঠাণ্ডা হবে রমজান! তবু প্রত্যক্ষ পাওয়াটা উপেক্ষণীয় নয়। মুনিবকে খুশি করার জন্যে উঠে আসে রমজান, বলে, স্যার তিন নম্বর তালুকটার ব্যাপারে তা হলে রামদয়ালের সাথে বসে একটা কবালার মুসাবিদা করে ফেলি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি পারবে তো, না কি আমাকেও যেতে হবে? খোলা দলিলগুলো বন্ধ করে বলে ফেলু মিঞা। তা আপনাদের দোয়ায় অ আ ক খ টা তো শিখেছিলাম ছোট বেলায়, তারপর তো সব দেখে শেখা, দেশে আর বিদেশে। আপনার কাজে কোনদিন গলতি পেয়েছেন স্যার? মাটির সাথে যেন মিশে যায় রমজান।

আরে কি যে বল, ওই দেখে শেখাটাই তো আসল শেখা। দেখছোনা আমাকে? তুমি তো আমার যোগ্য সাকরেদ।

সাকরেদ না স্যার, অধম গোলাম আপনার। বিণীত নম্রতায় আর এক ধাপ নেবে আসে রমজান। 'অধম' শব্দটা ছোটবেলায় মক্তবের মৌলভি সাহেবকে একবার ব্যবহার করতে শুনেছিল রমজান। শব্দটা কেন যেন খুব পছন্দ হয়েছিল ওর। তাই মনে রেখেছিল। আজ সেই শব্দটার এমন সার্থক প্রয়োগে খুসি হয়ে উঠল রমজান। ভাগ্যিস সৈয়দদের মক্তবে বসে বাংলা বর্ণমালাটার সাথে একটু পরিচয় করে নিয়েছিল রমজান। সে জন্য আজ আল্লার দরবারে তার হাজার শোকরগুজার।

এবার ফেলু মিঞা পরগণা আমিরাবাদ আর দখিন ক্ষেতের নক্সাটাই খুলে ধরল চোখের সামনে। সেই সুলতানপুরের জেলে পাড়া, তালতলির একশো ঘর তাঁতি, চাটখিলের যুগিরা, সব ওই তিন নম্বর তালুকের প্রজা। মুহূর্তের মাঝে কার্জনের কল্পিত চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে ফেলু মিঞার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রামদয়ালের মুখখানি। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই দরাজ দিলটা যেন

সহস্র সাপের ছোবল খেয়ে বিষিয়ে উঠল। ফেলু মিঞার চোখে ঘৃণা আর প্রতিহিংসা। মিঞা আভিজাত্যের কলংক সেই তিন আর চৌদ্দ নম্বর তালুক, পুনরুদ্ধারের জন্য এখনো টাকার ব্যবস্থা নেই ফেলু মিঞার। একমাত্র আগামের টাকাটারই ব্যবস্থা হয়েছে, স্ত্রী হালিমার কয়েক ছড়া অলংকার সরিয়ে রেখেছে ফেলু মিঞা।

স্ত্রী হালিমার কথাটা মনে হতেই 'ছ্যাপরা' খেল ফেলু মিঞা। কী এক ভয় এসে যেন গ্রাস করল ওকে।

কাকুতি মিনতি করেও যখন কিছু হয়নি, সোজা হুকুম দিয়েছিল, ধমক ছেড়েছিল ফেলু মিঞা। তাতেও কাজ হয়নি। উল্টো বলেছিল বউটি, গায়ের সোনা ঘরের লক্ষ্মী। গা থেকে এক রত্তি সোনাও খুলবনা।

ওসব কুসংস্কারের বালাই রাখেনা ফেলু মিঞা। ঝট করে বউয়ের গলার মফ চেইনটা খুলে নিয়েছিল। আর খপ করে হাত দুটো ধরে চুড়িগুলো টেনে বের করেছিল। সেই সাথে বিবি হালিমার হাতের একটুখানি চামড়াও হয়ত উঠে এসেছিল। অভিসম্পাত দিয়েছিল হালিমা: কুষ্ঠ হবে কুষ্ঠ হবে ওই হাতে। খোদার কহর পড়বে, লানত্ পড়বে।

ফেলু মিঞার মনে হয়েছিল কুলবধূর অভিসম্পাতে দালানের ইটগুলোও বুঝি সত্যি কেঁপে উঠল। মনে হয়েছিল যে হাতটায় চুড়ি কয়টা ধরেছিল ফেলু মিঞা চুড়িশুদ্ধ সেই হাতখানি বুঝি তখখুনি খসে পড়বে। এমন সাংঘাতিক কহর দিল বৌটি? তাও মাত্র কয়েক ভরি সোনার জন্য?

অভিসম্পাতকে বড় ভয় ফেলু মিঞার। তাই তো সেদিনের সেই দৃশ্যটা মনে জাগলেই 'ছ্যাপরা' খায়, চমকে ওঠে ফেলু মিঞা। কিন্তু ফেলু মিঞা তো এটাই জানতো—বান্দীর মেয়ে, ছোট লোকের বউ, ওরাই মুখ খারাপ করে, চেঁচামেচি করে, গালি দেয়, কহর দেয়। কিন্তু মিঞা বাড়ির বৌ বা মেয়েকে কে কবে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনেছে? সেই মিঞা বাড়ির বৌ কিনা কমজাত ছোট লোকদের মত চেঁচাল? কহর দিল? ছিঃ ছিঃ। ফেলু মিঞার গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। স্ত্রীর হালিমাকে সত্যি সত্যিই ঘৃণা করতে শুরু করেছে ফেলু মিঞা।

চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে খবরটা। সবাই জেনেছে সাত নম্বর তালুক ফিরে ফিরে এসেছে মিঞাদের। প্রজারা এসে সেলাম দিয়ে যাচ্ছে কাছারিতে। কেউ বা নিয়ে আসছে নজরানা।

কিন্তু আনন্দ কোথায় ফেলু মিঞার? অর্ধেক আনন্দই তো কেড়ে নিয়েছে স্ত্রী হালিমা।

তাছাড়া আর একটা ভয় এত ব্যস্ততা আর চিন্তার মাঝে ও ধুক ধুক করছে ওর মনের ভেতর। বিছে হার, বাজুবন্দ, নোলক আর গলার নারকেল ফুলগুলোর খবর তো এখনো হালিমার অজানা। স্ত্রীর অজানাতেই বাক্স থেকে অলংকারগুলো সরিয়েছে ফেলু মিঞা। যথা সময় ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকাও এনেছে। যখন জেনে যাবে হালিমা আরও কি কঠিন অভিশাপ দেবে সে কে জানে! জমিজিরাত ঘরবাড়ি ফেলে সোনার প্রতি কেন যে মেয়েদের এত লোভ আজও বুঝতে পারলনা ফেলু মিঞা। অদ্ভুত এই মেয়ের জাত।

সংস্কার বা কুসংস্কার কোনটাকেই তেমন আমলে আনেনা ফেলু মিঞা। তবু স্ত্রী হালিমার অভিশাপকে এত ভয় কেন ওর? এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর খুঁজে পায়না ফেলু মিঞা।

এত প্রশ্ন, এত ধন্দ, এত দুশ্চিন্তা। কপালের রেখাগুলো কুঁচকে আসে। চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। ফেলু মিঞা মাথার চুল ছেঁড়ে। দুহাতের তালুতে মাথাটাকে চেপে ধরে। ফেলু মিঞা কি পাগল হবে? তা হলে আজ বিকেলেই তালতালিটা ঘুরে আসি স্যার। দলিলের বোঁচকায় সুতো প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল রমজান।

ফেলু মিঞা বুঝি সম্বিৎ ফিরে পায়।

আলবত আলবত। শুধু ঘুরে আসা নয়, একেবারে পাকা করে আসবে। নক্সাটার উপর আবার ঝুঁকে পড়ে ফেলু মিঞা।

রমজানের সেই ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটি, কেন যেন লাল হয়ে থাকে সারাক্ষণ, চকচকিয়ে ওঠে সে চোখ। সেই পাঁচশো টাকার নোটের তাড়াগুলো, কামিজের নীচের দিকে ভারী পকেটটায় এখনো যেন অনুভব করেছে রমজান। তিন নম্বরে আরো বড় দাঁও। আহ্, রমজানের গায়ের লোমগুলো কি এক নাচন দিয়ে গেল। একটু আগে মুনিবের উপেক্ষায় যে ক্ষোভ জমেছিল ওর মনের ভেতর মুহূর্তে উবে গেল সে ক্ষোভ।

শোন। নক্সা থেকে মুখ তুলে রমজানের দিকে তাকাল ফেলু মিঞা।

বাকী বকেয়া আদায়, সে তো আছেই। তা ছাড়া……। থামল ফেলু মিঞা। কি যেন ভাবল। বলল আবার, আমি ভাবছি কিছু জমি বিক্রী করে দেব। আজকাল জমির বেশ দাম আছে।

মুনিবকে সত্যিই বোঝেনা রমজান। লোকে আজকাল তালুক বেচে জমি কিনছে। কেননা জমিতেই এখন টাকা, ফসল বিক্রীর নগদ মুনাফা। একটু

বুদ্ধি খরচ করলেই তো ব্যাপারটা বুঝতে পারে ফেলু মিঞা। কিন্তু ফেলু মিঞা বুঝবেনা। ফেলু মিঞা জমি বেচে তালুক কিনবে।
কেমন একটা ধূর্ত হাসি ঝিলিক তুলে যায় রমজানের ঠোঁটের কোণে। বলল রমজান, তা তিন নম্বরের জন্য দরকার পড়লে জমি কিছু বেচতে হবে বই কি?
ততক্ষণে নক্সাটার আঁকাবাঁকা টানের বিচিত্র মায়ায় আবার হারিয়ে গেছে ফেলু মিঞা। সব রাগ, সব ক্ষোভ, স্ত্রীর অভিমান—ভুলে গেছে ফেলু মিঞা। এখন শুধু ওই আঁকা-বাঁকা টানের নক্সা, ডেসিমলের হিসাব। ওই নক্সা। ধন গৌরব আভিজাত্য আর মর্যাদার কিংখাব মোড়া সেই অতীত যেন বন্দী ওই নক্সার গোলক ধাঁধায়। উদ্ধার করতে হবে তাকে, মুক্ত করতে হবে তার পুনরুজ্জীবনের পথ। কঠিন সংকল্পের মুখে ভেংগে যাচ্ছে সব বাধা-বিপত্তি, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছে ফেলু মিঞা। কি এক রোমাঞ্চে দুলে দুলে যায় তার সারা অঙ্গ।

সেলামালাইকুম।
ওয়ালাইকুম। নক্সাটা গুটিয়ে রেখে ওদের দেখল ফেলু মিঞা। ওরা সবাই এসেছে, কসির, বুড়ো ট্যাণ্ডল, সারেংদের বড় হিস্যার মজু সারেং, ফজর আলি। আরো অনেকে।
ওদের মতলবটা আঁচ করে আগেভাগেই সিদা কথাটা শুনিয়ে দেয় ফেলু মিঞা: শুনেছি সব। মাফটাফ হবেনা। বকেয়া মিটিয়ে দাও। তারপর অন্য কথা। নইলে—
নইলে কি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ওরা জানে।
কোত্থেকে দেব? সেই পুরনো কথা কসিরের।
কো-ত্থেকে দেব? ভেংচি কাটে ফেলু মিঞা। আপনার হাজারো অসহায় অপদার্থতার ক্ষোভে অহর্নিশ জ্বলে চলেছে ফেলু মিঞা। তাই কসিরের হতাশ কান্নার মতো ঝরে পড়া কথাটা যেন বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অশ্লীল হয় ফেলু মিঞা! দুই মাগীরে দুই পাশে নিয়ে শোবার সময় জিজ্ঞেস করিস আমাকে? কোত্থেকে দিবি, সে আমি জানি? থামেনা ফেলু মিঞা। একটি কথার সূত্র ধরে বলে চলে অনেক কথা।

মুসলমান, তার উপর ছোট লোক। ওদের স্বভাবটাই তো ওই। কামাই নেই রোজগার নেই। কিন্তু, শাদী ? মাশাল্লাহ্, এক গণ্ডা, কমসে আধ গণ্ডা। এই জন্যই তো গোটা জাতটার এই দুরবস্থা।

কসির অবশ্য তেমন গায়ে মাখেনা কথাটা দুই বউ নিয়ে। সে নিজেও পস্তায় এখন। খেতে দিতে পারেনা। তার উপর দুই সতীনে খিটিমিটি চুলোচুলি লেগেই আছে হরদম।

মুখ নীচু করে ফজর আলি। ওর দু বউর সংসারে এতটুকু কোঁদল নেই। তা নিয়ে ওর অনেক গর্ব।

কিন্তু উসখুস করে রমজান। হঠাৎ সরাশরিয়তের খেলাপ বলতে শুরু করল কেন ফেলু মিঞা ? মুসলমানের শাদী হল ফরজ কাম। যে শাদী করবেনা বেহেশত তার হারাম। দুই বৌ, চার বৌ সে ত সুন্নত, পুণ্যের কাজ। এক পত্নীক হলেও মিঞার কথাটায় ধর্মের দিক দিয়ে যেন সায় নিতে পারেনা রমজান। তবু মিঞার কথা তো ? ভাল হোক মন্দ হোক শুনে যেতে হবে। লেখাপড়া আমাদের নেই কিনা ! তাই—। জাহাজে জাহাজে নানা দেশের নানা লোকের রুচির সাথে পরিচয় ঘটেছে মজু সারেংয়ের। তাই ওর চিন্তাটা অন্য ধরনের।

লেখাপড়ার কথায় আবার খিঁচিয়ে ওঠে ফেলু মিঞা ; ঝাঁটা মার লেখাপড়ার কপালে। দেখছ না আমার দিগ্‌গজ ভাইগুলোকে ! হ্যাঁ যদি বল ওই মিত্তিরদের মতো, দুটো ছেলে জজিয়তি করে, মাস মাস টাকা পাঠায় গ্রামে। সে টাকায় শুধু কি মিত্তিরদের উন্নতি ? কত কাজে লাগে সে টাকা। একটা ডিস্‌পেনসারী চলে, আর ওই মেয়েদের স্কুলটা তো সম্পূর্ণ মিত্তিরদের টাকাতেই চলে। এমন লেখা পড়ার দাম আছে, বুঝি।

বিলকুল ঠিক। বিলকুল ঠিক। এবার সবাই ফেলু মিঞার সাথে সায় না দিয়ে পারে না। মিঞা বাড়ির চাকুরে ছেলেরা কিছু টাকা পাঠালে বাকুলিয়ার অভাগারাও তার কিছু উপকার হয়ত পেতো। সে কথাটাই ভাবে ওরা।

আর দেখ ওই রামদয়ালকে। পাশ সেও তো একটা করেছে। গোটা বাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি বি, এ, পাস। তবু দেখ সুদী কারবার, তেজারতি, চাষ— সবটাতেই আছে ওরা। তাই তো অত উন্নতি ওদের।

আশ্চর্য হয় রমজান। উঠতে বসতে হিন্দুদের, বিশেষ করে ওই রামদয়ালের আর ওই মিত্তিরদের চৌদ্দ পুরুষের মুণ্ডপাত করা যার অভ্যাস তার মুখেই আজ হিন্দু প্রশস্তি ?

এত কথার মাঝে আসল কথা বুঝি চাপা পড়ে যায়। হাঁটুর উপর ভর রেখে একটু নড়েচড়ে বসে কসির, ফজর আলি।

হুজুর······সেই ভীরু ভীরু স্বর কসিরের।

আবার হুজুর? তিন দিনের সময় দিলাম। যা, ভাগ।

আপনি হলেন মিঞা, গেরামের মাথা, আপনি দয়া করলে বাঁচি, নইলে মরি। কসিরের হয়ে সুপারিশ করে ফজর আলি।

দেখেছ রমজান? রামদয়ালের সাথে থেকে থেকে কেমন কথা বলতে শিখেছে ফজর আলি? ফেলু মিঞার খানদানী মেজাজটা সত্যি খুশি হয়ে ওঠে।

পুরনো খতিয়ানের বোঁচকাগুলো তাকে তুলতে তুলতে আড় চোখে কসিরের দিকেই তাকায় রমজান। ভেসে উঠে ওর চোখের সুমুখে সেই লেকুর 'বাউলা' খেতের ছবিটা। ইস্, দুই বদমাশ মিলে কি নিষ্ঠুর মারটাই না মারল গাই গরুটাকে। হঠাৎ কেউটের ছোবল খেয়ে যেন সচকিত হল রমজান। বিষের জ্বালাটা কি এক অস্থিরতা ছড়িয়ে চলেছে ওর স্নায়ু শিরায়। এত বড় মারটা কি রমজানকে নীরবেই হজম করতে হবে?

দরিয়ার মতো দরাজ হয়েছে আজ ফেলু মিঞার দিলটা। নতুন বিয়ানো গাই গরু দান করে দিল রমজানকে। তিন নম্বর তালুক কেনার হুকুমটা দিয়ে দিল। এতগুলো খুশিতে কিছুক্ষণের জন্য বুঝি হারিয়ে গেছিল রমজান। কসির বা ফজর আলি যে ওই কমজাত লেকুটারই দোসর, কথাটা মনে হতে হয়ত তাই একটু দেরী হল।

শা—লা। দুই বৌর 'সোয়াদ' তোদের আচ্ছা করেই মিটাচ্ছি আমি। আলমারির তালাটা টিপতে টিপতে বিড় বিড় করে রমজান। নিজের যায়গাটায় এসে বসে। সোজা করে তাকায় ওদের দিকে। আজ বুঝি অনেক কেউটের অনেক ছোবল জ্বালা ধরিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। হৃদপিণ্ড তার বিষের মন্থনে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। মনটা তার তড়পায় বোশেখের শেষে শুকিয়ে যাওয়া ডোবার মাছগুলোর মতো। হ্যাঁ, মুনিবের মদদ থাক বা না থাক, প্রতিশোধ সে নেবেই। সে যে কসম খেয়েছে, দাদ না তুলতে পারলে বাপের ব্যাটা নয় সে। সে কসম ভুলেনি রমজান।

আরে মাষ্টার এস, এস। ডাকল ফেলু মিঞা। নিজের পাশেই বসবার যায়গা করে দিল।

আজকের কাগজে খবরটা দেখেছ?

জী না। কাগজ তো খুলে গিয়ে দেখি। কি খবর? শুধাল সেকান্দর।
আবার বেধেছে গোলমাল। এবার ইউ, পিতে।
কিসের গোলমাল? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেকান্দর।
কিসের আবার গোলমাল। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, রায়ট, রায়ট। বলে ওর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিল ফেলু মিঞা।
তা-ই তো। খবরটা পড়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সেকান্দর। যেন নিজের কাছেই ছোট্ট একটা প্রতিবাদ জানিয়ে রাখল।
শোন মাষ্টার! এই ফেলু মিঞা একটা কথা বলে রাখছে—ওই হিন্দুরা একটা একটা করে সব মুসলমান খতম করবে এ দেশ থেকে। এখন তো রায়ট হচ্ছে কালে ভদ্রে! কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখছি, এমন দিন আসছে প্রতি মাস, প্রতি দিনই রায়ট হবে! মনে রেখ কথাটা।
আলবোলায় ঘন ঘন কয়েকটা টান মারে ফেলু মিঞা। ধোঁয়াগুলোকে একেবারে তলপেট অবধি টেনে নেয়। তারপর একটা লম্বা হাঁ মেলে উঁচিয়ে রাখে মুখটা, কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়া মিছিল করে বেরিয়ে যায়।
ইংরেজ থাকতেই এই অবস্থা? ইংরেজ চলে গেলে, হিন্দুদের হাতে স্বরাজ এলে কি অবস্থাটা হবে, ভেবে দেখ তো? একটা মুসলমানেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না এ দেশে। একটাও না। সব মুসলমান, ধনী নির্ধন আমীর ফকির সবাই যদি আজ একাট্টা না হতে পারি আমরা তবে এই, এই আমাদের ভবিষ্যত। জেনে রেখো মাষ্টার। একদিন নিজের চোখেই এ সব দেখবে আর বলবে—হাঁ বলেছিল বটে ফেলু মিঞা।
তা কেন হবে! ছোট একটা প্রতিবাদ জানায় সেকান্দর। যে আর্জি নিয়ে এসেছে সেটা পেশ করার জন্য একটু ঝুঁকে আসে সুমুখে।
হুজুর, গরীবের দিকে একটু দেখবেন না? সেকান্দরের আগেই মজু আর কসির প্রায় এক সাথেই বলে উঠল।
এই তো, এই তো আমাদের মুসলমান। দেখ, চেয়ে দেখ। খাজনা দেবার পয়সা নেই। পরনে কাপড় নেই। পেটে ভাত নেই। শুধু জানে হাত পাততে। শুধু জানে নফরদারী। বেহায়া বেসরম বেল্লিক। ওদের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে আর সেকান্দরের দিকে মুখ করে বলল ফেলু মিঞা। আবার লাল হয়ে এসেছে তার মুখ। আবার সেই ক্ষোভ আর ঘৃণা যেন একটানা ঝাঁকুনী দিয়ে চলেছে তার শরীরে।
মুসলমান তো নয়, কাঙ্গালের জাত, ভিক্ষুকের জাত—এ কথাটা চীৎকার

করেই বলে ফেলু মিঞা। আর সেই কাঙ্গালের জাতটার কথা যখন ভাবতে বসে ফেলু মিঞা তখন এমনি ক্ষুব্ধ রাগে দিশে হারায়, চোখ মুখ তার লাল হয়ে আসে, ঠিক যেমনটি হয় মিঞাদের লুপ্ত আভিজাত্যের কথা ভাবতে গেলে।

এই এই, এখনো বসে আছিস তোরা? এখনো গেলি না আমার সুমুখ থেকে? এই কালু, ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা।

কালুকে আসতে হয় না। তার আগেই ওরা উঠে যায়। শুধু অনুনয়ের কাতর চোখগুলো একবার সেকান্দরের দিকে তুলে ধরে। বেরিয়ে যাবার আগে ওদের অনুক্ত আবেদনটা যেন রেখে যায় ওরই হাতে। সে যেন কিছু করে ওদের জন্য।

কি বলবে সেকান্দর! সে-ই তো পাঠিয়েছিল ওদের, বলেছিল, আমার একলার কথায় তো হল না কিছু, তোমরা সবাই মিলে ধর্না দাও মিঞার কাছারিতে। কিন্তু, ফলে বুঝি বিপরীত হল।

উত্তেজনাটা চচ্চড় করে বেড়ে চলেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলু মিঞা। আলবোলাটা সরাতে গিয়ে ফেলেই দিল মেঝেতে। কলকিটা ভেঙ্গে দু টুকরো হল, ছাইগুলো ফরাসময় ছড়িয়ে পড়ল।

কি হবে, কি হবে এই ভিখিরীর জাতের, বলতে পার মাষ্টার? তুমি কি ভাব দিলে আমার রহম নেই? দুঃখে আমারও যে বুক ফেটে যায় মাষ্টার। কিন্তু কি করব? মিঞা বাড়ির ইজ্জত, মিঞা বাড়ির নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় তালতলির ওই মালাউনের গোষ্টিটা। টাকা যে আমার চাই, যেমন করে হোক। নইলে শুধু আমার হার নয়, বাকুলিয়ার, ওই সুলতানপুরের, গোটা পরগনার মুসলমানের হার। কোনদিন, কোনদিন ওরা আর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। পারবে না।

নিজের উত্তেজনায় নিজেই যেন বেহুশ ফেলু মিঞা। খালি পায়েই পায়চারি শুরু করেছে মেঝের উপর।

কিন্তু……

না না তোমার কথা আলাদা, তুমি যখন খুসি দিও, তবে ওই ব্যাটাদের বলে দাও টাকা চাই আমার, টাকা, নগদ টাকা, নতুবা জমি। চটিতে পা ঢুকিয়ে চট্ চট্ শব্দ তুলে অন্দর মহলের দিকে চলে যায় ফেলু মিঞা।

আম্বরি আম্বরি। তোর খুব লেগেছে না রে? দেখি? আম্বরির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে লেকু।

কপাল থেকে কান অবধি ন্যাকড়ার পট্টিটা টেনে টেনে আল্গা করার চেষ্টা করছে আম্বরি। কচু ডগার কষ ভেজানো তেনা, শুকিয়ে চিমসে গেছে ক্ষতের সাথে। ও শুয়ে আছে, ঘরের একমাত্র আসবাব, ওদের জাম চৌকিটায়! আম্বরির শ্বশুরের নিজের ব্যবহার করা সখের চৌকিখানা। সেই লেকুর বিয়ের সময় বুড়ো ছেলে-বৌকে খুশি হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল বাড়ির প্রাচীন জাম গাছটা ফেড়ে তৈরী করা এই চৌকিখানা।

উ উ আহ। কঁকিয়ে ওঠে আম্বরি। ওর অসাবধানে কখন লেকু হাত বাড়িয়ে টান মেরেছে পট্টিতে, চচ্চড় করে উঠে এসেছে ন্যাকড়া। বেশ শুকিয়ে এসেছে ক্ষতটা, যতটা মারাত্মক ভেবেছিল লেকু, তেমন কিছু নয়।

মাগো! কী ডাকাত। আম্বরি বলে আর আঙ্গুল বুলোয় আধ-শুকনো ঘাটার উপর। লেগেছে ওর। পানি এসে পড়েছে চোখে। আর সেই ফাঁকে ওই ডাকাতটা যে কখন ওর পলকা শরীরটাকে নিবিড় বেষ্টনে ধরে নিয়েছে বুঝি টেরই পায়নি ও।

পাটার মতো চওড়া বুকটার উপর মাথা রেখে নিথর পড়ে থাকে আম্বরি।

তুই এ রকম কেন রে আম্বরি?

কি রকম?

জানিস তো আমার শূয়রের মতো রাগ। যখন রাগি তখন হাতের মুখে না থেকে পালিয়ে গেলেই পারিস!

আম্বরি চুপ। ওই হাতগুলো যখন আদর দেয় ওকে তখন কেমন যেন বোবা বনে যায় ও। বলার থাকলেও বলতে ইচ্ছে করে না কোন কথা। ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে ও যেন পরখ করে মানুষটার হাত, বুক, হাতের পেশী। সোহাগ ভরা হাত। কে বলবে এই হাতের আঙ্গুলগুলোই এক সময় লোহার শলার মত দাগ কেটে কেটে বসে যায় আম্বরির পিঠে। দুটো হাত কি একই মানুষের? সে হাতের আদরে বুঝি মট মট করে ভেঙ্গে যায় আম্বরির কাঠির মতো শরীরটা। কোন্ গহিন সায়রের পানি যেন ধেয়ে আসে ওর দু চোখ ঠেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আম্বরি।

মানুষটার বুকে মুখ রেখে কাঁদতে কত যে সুখ আম্বরির ! মানুষটা কি বোঝে সে কথা ?

আস্তে আস্তে শাড়িটা সরিয়ে ওর পিঠে হাত রাখে লেকু। পিঠটা স্পর্শ করেই যেন চমকে ওঠে লেকু। ওর হাতের বাঁধনটা যায় আল্গা হয়ে। ওর বুকের উপর থেকে ঢলে পড়ে আম্বরি। মুখ তুলে আম্বরির পিঠটা দেখে লেকু। নীল আর কালো দাগে একাকার ওর পিঠ, একটুও ফাঁক নেই বুঝি। আর কেমন অমসৃণ প্রথম চাষ দেওয়া জমিটার মতো। ইস্, এমন করে ওকে পিটিয়েছে লেকু ? এ দাগ কি শুধু পিঠে ? লেকুর মনে হল এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের দাগ আম্বরির সারা অঙ্গে। চামড়ার নীচে মাংস ঢাকা যে সব হাঁড়, সেই হাঁড়গুলোও বুঝি এমনি কালো আর নীল হয়ে গেছে। সেখানেও বুঝি দাগ ধরেছে।

শোন্ আম্বরি। অনেকক্ষণ পর বলল লেকু।

আম্বরি শোনে। কিন্তু, জবাব দেয় না। পিঠের উপর লেকুর থরথরে হাতের স্পর্শটা অদ্ভুত মোলায়েম লাগছে ওর।

আমি পাহাড়ে যাচ্ছি। একটা খেপ নিয়ে আসি। তারপর চল্ দু জনাই চলে যাই রঙ্গম।

রঙ্গম ? আম্বরির বুকের ভেতর হঠাৎ বুঝি একটা খুশির লহর দৌড়ে এসে নেচে নেচে যায়। কিন্তু, পরমমুহূর্তেই উবে যায় ওর আনন্দটা। বলে, সে কি গো ? জমিজিরাত ঘরবাড়ি ফেলে রঙ্গম যাবে ?

জমিজিরাতের ভাবনা আর ভাবতে হবেনা রে আম্বরি। জমি রেহান দিয়েছি দয়াল কাকার কাছে।

রেহান ? বুঝি বিশ্বাস করতে চায় না আম্বরি।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

কেন গো ? উঠে বসে আম্বরি।

চট করে কোন উত্তর দেয় না লেকু। কি যেন ভাবে। কেমন অন্য মনস্ক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আম্বরির শাড়ি পরা। তারপর আচমকা ধাক্কার মতো মুখের ভেতর থেকে ঠেলে দেয় কথাগুলো : আমি যাব ফেলু মিঞার পায়ে ধরতে ? ওই বদমাশ রমজানটার মোতাজ হতে ? আমি মরদ না ? এই যে মুগুরের মত হাত দেখছিস দুটো, এ হাত দিয়ে এখনো বহুত কামাই করতে পারি আমি। জমি বন্ধক রেখে ফেলু মিঞার সব বকেয়া শোধ দিয়ে এসেছি। কারো ধারি না আমি, কারো খাই না। কামাই করব, আবার

ফিরিয়ে আনব আমার জমি। উত্তরে যদি কামাই ভালো না হয় যাব রঙ্গম। তোকে নিয়ে যাব অম্বরি। তুই যাবি?

মানুষটার দিকে ভয়-ভয় চোখে চেয়ে থাকে আম্বরি। এত বছর ঘর করেও যেন চিনতে পারল না মানুষটাকে। কেমন ফুলছে, ফুঁসছে মানুষটা, কী ক্ষোভে, কী রাগে। বুকটা তার হাঁপরের মত উঠছে আর নামছে, ঘাড়ের পেশীগুলো ফুলে ফুলে কেবলি যেন পাক খেয়ে চলেছে।

আমাদের জমি নেই? লোক যে তোমায় ফকিরা বলবে গো? কী এক ব্যাকুলতায় লেকুর হাতখানা আঁকড়ে ধরে আম্বরি।

হাঁ, আর তোকে বলবে ফকিরার বৌ, ফকিরনী। ঘাবড়াসনে আম্বরি, এই গতর যখন আছে তখন অনেক হবে। অনেক হবে আমাদের।

হবে কি? সেই পাটার মত চওড়া বুকের আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটে শুধায় আম্বরি।

মস্তবড় ধনী। অগুনতি তার রায়ত প্রজা। কত যে লয়লস্কর। ঘোড়া শালে ঘোড়া, হাতি-শালে হাতি। কাচারিবাড়ি, কোঠাবাড়ি, তেতলা দালান। ধন দৌলতের শেষ নেই তার।

তেতলার একটি ছোট্ট ঘরে থাকেন তিনি।

খালাম্মা, কি নাম তার? ফস করে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে মালুর মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গুম করে একটা কিলও নেবে আসে ওর পিঠে। কিলটা রাবুর। তাই চুপ মেরে যেতে হয় মালুকে।

বারান্দায় পাটি পেতে ওরা সব গোল হয়ে বসেছে। পীর পয়গম্বরের কিস্‌সা শোনাচ্ছেন সৈয়দগিন্নী। রাবু আরিফা ছাড়াও হুরমতি, আম্বরি, সেকান্দরের মা, ট্যাগুলদের বৌ, মাথায় আঁচল দিয়ে বসেছে ওরা। বড়রা শুনতে শুনতে পান চিবোচ্ছে। ছোটরা জোড়া হাঁটুর উপর মুখ রেখে তন্ময় হয়েছে।

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর, তিন লক্ষ আওলিয়া, পীর দরবেশ। সবার নাম কি মনে রাখা যায় রে! স্মিত হেসে মালুর প্রশ্নের জবাব দেন সৈয়দগিন্নী। ধনী হলেও পরহেজগার নেকবক্ত্ লোক। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে ষোল ঘণ্টাই তাঁর কাটে এবাদত বন্দেগিতে। এত ধন দৌলত নিয়েও কিন্তু সুখ নেই তাঁর। জীবনের একমাত্র সাধ তাঁর আল্লাকে দেখবেন। তাই দিনে দিনে এবাদত যায় বেড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকেন সেজদায়।

রাতে এশার নামাজ সেরে তাহাজ্জত পড়েন সেই শেষ রাত অবধি। বুঝিবা একটু চোখ বোজেন, কিন্তু উঠে পড়েন মোরগ ডাকারও আগে। সোবে সাদেকের সময় যিকির করেন, ফজরের নামায সারেন। তারপর কোরাণ তেলাওয়াত করেন সেই বেলা অবধি। এ ভাবেই দিন যায়। মাস যায়। বছর গিয়ে আবার ঘুরে আসে। কত বছর যে কেটে যায়! তবু আল্লার সাক্ষাৎ পান না তিনি।

নামায এবাদত আরো বাড়িয়ে দিলেন তিনি। খোদার ধ্যানেই মগ্ন রইলেন সারাদিন। এক একটা সেজদা দেন, ঘণ্টা যায় কেটে, মাথা তোলেন না। একটা সেজদা দেন, ঘণ্টা যায় কেটে, মাথা তোলেন না। যে ঘরে খাওয়া সেই ঘরেই এবাদত, সেই ঘরেই শোয়া, ঘর ছেড়ে বের হন না তিনি।

এক রাত, সোবে সাদেকের একটুখানি আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি, ঘুমের ঘোরেই শুনতে পেলেন ছাদের উপর কারা যেন চলে বেড়াচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ধুপধাপ খুটখাট। ঘুম তাঁর ভেঙ্গে গেল। অমনি শব্দটাও থেমে গেল।

দ্বিতীয় রাত।

তৃতীয় রাত।

চতুর্থ রাত।

একই শব্দ, ধুপধাপ খুটখাট। ঘুম ভাংতে না ভাংতেই মিলিয়ে যায় সব রকমের শব্দ। এ কী ব্যাপার? কিসের শব্দ? মানুষই যদি হবে তবে তাঁর ঘুম ভাংতে না ভাংতেই ধুপধাপটা থেমে যাবে কেন?

তিনি ছাড়া আর কেউ থাকেন না তেতলায়। ছাদে উঠবার সিঁড়িটাও তাঁরই ঘরের ভিতর দিয়ে। সে সিঁড়িতে মস্ত বড় তালা। তবু শব্দ হয় প্রতি রাতে, কারা যেন চলে বেড়ায়।

ইয়া আল্লা! এ কী তোমার লীলা! আল্লার দরবারে কেঁদে পড়েন সাধক পুরুষ। কেঁদে কেঁদে জায়নামাযটা ভিজিয়ে ফেললেন। সে রাতে আল্লার নাম করে শুলেন তিনি। শোবার আগে সেই পুরাতন প্রার্থনাটিও করলেন, আল্লা, তোমার দর্শন চাই। কী আশ্চর্য! সেই একই ধুপধাপ খুটখাট শব্দ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন—তুমি যেই হও, ওখানে কর কি? ·উত্তর এল—গরু ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াই।

অবাক হলেন সাধক পুরুষ। এ কি তাজ্জব ব্যাপার! আমার তেতলার ছাদে গরু ঘোড়া কখন আর কেমন করেই বা উঠবে! আর সেখানে গরু ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবার স্পর্ধাই বা কার?

পরের রাতে আবার একই শব্দ। শুধালেন, যেই হয় জবাব দাও, গরু ঘোড়ার ঘাস কি আমার তেতলার উপর ?

অমনি উত্তর এল—খোদা কি তেতলায় থাকেন ?

গায়ে যেন কাঁটা বিঁধল সাধক পুরুষের। চমকে উঠলেন তিনি। ভাবলেন দিন ভর, রাত ভর। দিলে তার সদমা এল, ছটফটিয়ে সময় কাটে তাঁর। বুঝলেন এ হচ্ছে খোদারই গায়েবী আওয়াজ। ডাকলেন ছেলেদের, বললেন, বাবারা, তোমাদের বিষয় সম্পত্তি তোমরাই বুঝে নাও, আমি চললাম খোদার রাহে।

কিছু খানা আর সামান্য বিছানাপত্র নিয়ে রওনা হলেন তিনি, যেদিকে দুচোখ যায়।

যেতে যেতে দেখলেন একটা লোক পুকুরের ঘাটে নেমে আঁজলা ভরে পানি খাচ্ছে। প্রশ্ন এল সাধকের মনে, আমি চলেছি খোদার সন্ধানে, আর থালা বাটি গেলাস না হলে খাওয়া চলে না আমার ? থালা বাটি গ্লাস ওই পুকুরেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

চলতে চলতে এবার দেখলেন, পথের পাশে গাছতলায় শিকড়ে শিথান দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে একটি লোক। ঘুমন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন সাধক : তোষক চাদর বিছানা কিছুই নেই লোকটার অথচ কি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে : আর আমি চলেছি খোদার অন্বেষণে বিছানা বালিশের গাঁটরি লয়ে ? গাছতলায় ওই নিদ্রিত লোকটার পাশেই বিছানা বালিশগুলো রেখে এগিয়ে চললেন সাধক।

পথ চলেন সাধক। পথের যেন শেষ নেই। খোদারও সাক্ষাৎ নেই। তবু বিরতি আসে না তাঁর চলার।

এক যায়গায় দেখলেন রাস্তার উপর একেবারেই উলঙ্গ একটি লোক নামায পড়ছে। তাঁর সন্দেহ হল লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। তবু জিজ্ঞেস করলেন ল্যাংটা যে নামায পড়ছ বড়, ল্যাংটা কি নামায হয় ? ত্বরিতে জবাব এল লোকটির—আমি ল্যাংটাই এসেছি পৃথিবীতে, সেই ল্যাংটা ভাবেই ডাকি খোদাকে।

উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন খোদা-অন্বেষী সাধক। নিঃসন্দেহ হলেন তিনি, পাগল নয় লোকটি, হয়ত কোন আওলিয়া দরবেশ। প্রশ্ন জাগল সাধকের মনে, তবে আমিই বা কেন এত কামিজ, জামা-জোব্বা আলখাল্লা পরে রয়েছি ? গায়ের বাহুল্য লেবাস তিনি ছুঁড়ে ফেললেন পথের ধুলোয়।

দিন যায়, মাস যায়, খাবার গিয়েছে ফুরিয়ে। পথে পথে চেয়ে মেঙ্গে খান। না পেলে উপোস দেন। উপোস চলে কখনো দিনের পর দিন। তবু সাধক পথ চলেন আর একমনে ডাকেন খোদাকে। গ্রীষ্মের খরতাপে শ্রান্তিতে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি তাঁর ফেটে যেতে চায় তবু মুখ থেকে আল্লার নাম পড়ে না। সম্পূর্ণ রিক্ত, সর্বলোভ সর্ববিলাস মুক্ত কামিল পুরুষ তিনি। তার ডাকে কেঁপে ওঠে খোদার আরশ। এবার সাড়া না দিয়ে পারেন না খোদা।

খোদা হুকুম দিলেন জিব্রাইলকে ; যাও দুনিয়াতে। দেখ, কি চায় আমার ওই ভক্ত বান্দা।

জিব্রাইল তীরের বেগে নেমে এসে শুধাল, কি চাও সাধক ?

আমি চাই খোদাকে দেখতে, অকুতোভয়ে বললেন সাধক।

ফিরে গিয়ে জিব্রাইল খোদার নিকট পেশ করল সাধকের আর্জি। শুনে খোদা বললেন তুমিই খোদা, সেই পরিচয় দাও তার সামনে।

তথাস্তু।

জিব্রাইল সাধকের কাছে এসে বলল আমিই খোদা।

কেন যেন সায় দেয়না সাধকের মন। জিজ্ঞেস করেন, খোদাতালাই কি তোমায় পাঠিয়েছেন ?

মিথ্যে বলতে পারল না জিব্রাইল, বলল, খোদাই আমাকে পাঠিয়েছেন। ক্ষোভে অভিমানে কান্না এসে যায় সাধকের চোখে। সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তিনি, গায়ের শেষ বস্ত্রটিও পথের ধারে নিক্ষেপ করে নিঃস্বের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। এক ধ্যান, এক জপ তাঁর—আল্লা আল্লা। তবু কি আল্লার দর্শন পাবেননা তিনি ? চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বললেন সাধক, জিব্রাইল, খোদাকে বল আমি যে তাঁরই দর্শনপ্রার্থী।

উত্তর নিয়ে ফিরে এল জিব্রাইল। না, খোদা বলেছেন, কোন আদম সন্তান তাঁকে দেখতে পায়না, দেখতে পাবেনা।

হা আল্লা, এত পরীক্ষার পর এই তোমার কথা ? কিন্তু ধৈর্য হারালেন না সাধক, শান্ত আর দৃঢ় স্বরে বললেন : জিব্রাইল। আবার যাও তুমি। বিশাল এই সৃষ্টির মালিক সেই পরোয়ারদেগারকে আমি দেখবই।

অদৃশ্য ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যায় জিব্রাইল। চক্ষের নিমেষেই ফিরে আসে। একই উত্তর খোদার। কিন্তু স্বীয় প্রার্থনা থেকে এক ইঞ্চিও টললেননা সাধক। ব্যর্থ যাবে তাঁর আজন্ম এবাদতবন্দেগী সাধনা ? তিনিও বলেন যাও জিব্রাইল, আবার যাও।

কতবার যে জিব্রাইল যায় আর আসে তার বুঝি কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। অমন যে ফেরেশতা জিব্রাইল সেও বুঝি দৌড়াদৌড়িতে হয়রান পেরেশান হয়ে ওঠে। শেষবার জিব্রাইল এসে বলল : হে রসুলের উম্মত। প্রস্তুত হও! সর্বশক্তিমান প্রভু তোমাকে দর্শন দেবেন।

জিব্রাইলের কথাটা ফুরোতে না ফুরোতেই কোত্থেকে যেন কোটি তারা আর লক্ষ চাঁদ নেবে এল পৃথিবীর বুকে, আলোয় আলোয় ভরে গেল পৃথিবী। অপূর্ব সে আলো, সেই আলোর ছটার উদ্ভাসিত দিগদিগন্ত। সাধককে ঘিরে যেন লক্ষ আলোক শিখার নাচন। ঝলসে গেল সাধকের চোখ। বেঁহুশ তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কাহিনী শেষ করে চোখের পানি মুছলেন সৈয়দগিন্নী, তসবির ছড়াটা কোল থেকে জায়নামাযের উপর রেখে মুনাজাত করলেন। তাঁর দেখাদেখি শ্রোতারাও হাত তুলল আকাশের দিকে, ওদেরও চোখ অশ্রুসজল।

আ-মিন। আ-মিন। সবার আগে সশব্দে এবং টেনে টেনে দুবার উচ্চারণ করল মালু। তারপর উঠে এল পড়ার টেবিলে।

বসে আছে সেকান্দর, কখন গল্প শেষ হবে, উঠে আসবে ওর ছাত্র-ছাত্রীরা। ধর্মকর্মের কথা তেমন করে ও ভাবেনা। ভাববার ফুরসুতই বা কোথায়? তবু সৈয়দগিন্নীর কাহিনীটা শুনে মনটা ওর ভিজে যায় আর কেমন অবাক হয় ও। ইহলোক আর পরলোকের সুস্পষ্ট সমন্বয় যে ধর্মে সেখানে কেমন যেন বেখাপ্পা এই কাহিনী। দীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আর বাস্তবের পৃথিবী, এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দবাড়ি। চল্লিশের ওপারের পুরুষ মহিলারা সবাই হজ্জ সেরে এসেছেন। কর্তা সৈয়দ দুদুবার হজ্জ করেছেন। নিজের ইংরেজী ডিগ্রি আর ইংরেজের আপিসে বড় চাকুরিটার সাথে লম্বা দাড়ি, লম্বা কোর্তা আর মদিনা শরীফের গোল-টুপীর লেবাসটাকে অতি সহজে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। সেই সৈয়দবাড়ির কর্ত্রীর মুখে ত্যাগী সাধকের কাহিনীটি কেমন যেন বেমানান মনে হয় সেকান্দরের কাছে।

এ বুঝি একান্ত দেশজ উপাদান, বাংলার মাটিতে লালিত নারীমন, ত্যাগব্রতী সাধকের পায়ে যে মন অর্ঘ্য ঢেলেছে যুগে যুগে।

আখেরাতের নেয়ামত পেতে হলে ছাড়তে হবে দুনিয়ার লালসা। যিনি সেই নির্লোভ এবাদতী, খোদার নেয়ামত তাঁরই জন্য। তিনিই পাবেন খোদার সান্নিধ্য। মোনাজাত শেষ করে কাহিনীর চুম্বকটি শোনালেন সৈয়দ গিন্নী।

কাহিনীর রেশ এখনো বুঝি আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওদের। ফ্যাচ ফ্যাচ করে নাক ঝাড়ছে হুরমতি। দূরে রাখা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোটা ওর মুখের কাছটিতে এসে কি যেন ঔজ্জল্যের সন্ধান পেয়ে চিকচিকিয়ে উঠছে। মাথায় ঘোমটা নেই ওর।

সেকান্দরের দৃষ্টিটা অজানতেই হুরমতির কপালের উপর স্থির হয়ে থাকে। ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে। দূর থেকে নজরে পড়ে একটি গোল কালচে মত দাগ, যেন বড় রকমের একটা টিপ পরেছে হুরমতি। ওকে যতই দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে সেকান্দর মাষ্টার। এত যে ঝড় বয়ে গেল মেয়েটার উপর দিয়ে, একটুও দমাতে পারেনি ওর উদ্ধত বেপরোয়া স্বভাবটাকে। পঞ্চায়েতের নিষেধ কোন বাড়িতেই বন্ধ করতে পারেনি ওর যাতায়াত। বন্ধ করতে পারেনি প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রামের পথ দিয়ে ওর চলা। সেকান্দরের চোখটা কেমন নির্লজ্জের মতো পড়ে থাকে হুরমতির মুখের উপর। আরিফার পাশেই বসে আছে ও, একই কাঁচা হলুদ গায়ের রং, টিকোল নাক, টলটলে চোখ; সাদা শাড়ির শুভ্র মোড়কে ধরা নিখুঁত প্রতিমার মতো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কে বলবে এ বাড়ির মেয়ে নয় ও!

ভেঙ্গে গেল আসর। মাথার কাপড় টেনে পড়তে এল রাবু আর আরিফা। কাহিনীটি থেকে কি শিখলে বল তো? জিজ্ঞেস করল সেকান্দর। ওদের বিমূঢ় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেই উত্তরটা দিয়ে গেল ও! অসম্ভবও সম্ভব হয় যদি থাকে নিষ্ঠা, সুদৃঢ় মনোবল আর ত্যাগের স্পৃহা। দেখলেনা, কত দুঃখ কত ক্লেশ পদে পদে মাড়িয়ে এগুলেন ওই মহাসাধক, এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা আসেনি, সংশয় আসেনি তাঁর মনে। এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বল হননি, হতাশায় ঢলে পড়েননি তিনি। এমন সাধনায় কখনো সিদ্ধি না এসে পারে? এই সাধনা কি শুধু ওই মহাসাধকের? সত্য দর্শনের এই সাধনা সকল মানুষের, সমস্ত পৃথিবীর। যুগে যুগে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত গড়েছে অজেয় মনের এই অক্লান্ত সাধনা। শ্রোতাদের চেয়েও নিজেকে শোনাবার জন্যই যেন কথাগুলো বলে গেল সেকান্দর, কি এক আবেগ ঢেলে, গভীর কোন অনুভূতির রস নিঙড়িয়ে। আর ওর কচি শ্রোতারা হাঁ করে গিলে গেল মূল্যবান উপদেশগুলো।

কিন্তু, একি? রাবুর চোখে পানি কেন?

সেই তখন থেকে কাঁদছে ও, চাচাজানের কথা মনে পড়েছে হয়ত, বলল আরিফা।

না না ছিঃ কেঁদোনা। আচ্ছা যাও, আজ আর পড়তে হবেনা। সুমুখে খোলা বইটা বন্ধ করে দিল সেকান্দর। মালুর খাতাটা টেনে নিয়ে মন দিল ওর হাতের লেখায়।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায় রাবু। বুঝি অনেক কিছুই মনে পড়ছে ওর। কোন ঝাপ্সা স্মৃতি, অস্পষ্ট কোন মুখ, মুখের আদল। হয়ত টুকরো কোন কথা সেই মৃতা মায়ের কোলে বসে শোনা। এখন সে সবের কিছুই মনে নেই ওর। তবু কি যেন মনে পড়ে আর চোখ ফেটে কান্না আসে।

দশের উপর তিন বসিয়ে অর্থাৎ মালুকে ফেল করিয়ে খাতাটা ওকে ফেরত দেয় সেকান্দর। একটা দীর্ঘশ্বাস পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসে ওর বুক ঠেলে। কবে দেখেছে রাবুর আব্বাকে মনে করতে পারেনা সেকান্দর। সৈয়দবাড়ির বুজুর্গ্ এলেমদার পুরুষ। দেশী বিদেশী, ইংরেজী আরবি ফারসি, কত বিদ্যে তাঁর। সেই মানুষ, হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল, তাজা বউ আর তিন মাসের মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সে তো প্রায় তের-চৌদ্দ বছর আগের কথা। কোথায় কোথায় যে ভেসে বেড়াচ্ছে লোকটা, আজ যদি খবর আসে নোঙ্গর ফেলেছে বেরিলীতে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চলে গেছে দেওবন্দে। হঠাৎ হয়ত খবর পাওয়া গেল বড় পীর সাহেবের মাজার জিয়ারতে গেছে বোগদাদে, সেখান থেকে কারবালায়। মাঝে দুএকবার বাড়ি এসেছিল, কয়েক ঘণ্টা, বড়জোর একদিনের জন্য। শেষবার এসেছিল বোধ হয় বছর পাঁচ ছয় আগে। মহাসাধকের গল্প শুনে সেই দেওয়ানা বাপটির কথাই কি মনে পড়ে গেছে রাবুর?

কি ঠিক করলে, বাবা? পাশে এসে শুধালেন সৈয়দগিন্নী।

জী, এখনো যে বুঝতে পারছিনা। আমতা আমতা করে কানের উপরকার চুলগুলো টানতে টানতে বলে সেকান্দর।

এতে আবার বোঝাবুঝির কি আছে, বাবা? লোক রাখবে, তারা তদারক করবে, তুমি শুধু দেখবে যাতে নষ্ট না হয় কিছু। তাতে সময় লাগবে তোমার। এটা ঠিক। কিন্তু সেটা তো আমি পুষিয়ে দেব, বাবা? বুঝি এখুনি ওর মুখের হাঁটা শোনার জন্য তাকিয়ে থাকেন সৈয়দ গিন্নী।

গরীব স্কুল মাষ্টারের মনে কেন এত দ্বিধা, কেন এত সংশয়, সৈয়দগিন্নী কি কখনো বুঝবেন? সেকান্দর মাষ্টার নিজেও তো বুঝতে পারছেনা সৈয়দ-গিন্নীর অযাচিত অনুগ্রহদানের এই উগ্র ইচ্ছাটাকে। হয়ত উপকারের ইচ্ছা আদৌ নেই সৈয়দগিন্নীর। সৎ আর বিশ্বাসযোগ্য লোকের হাতে আপন

সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে প্রবাসে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান মাত্র। আর কিছু নয়।

নিরুত্তর সেকান্দর মাথা চুলকায়। স্যাণ্ডেলের উচ্চ শব্দে অসন্তোষ জানিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে যান সৈয়দগিন্নী।

গ্রামের চাঁদনিটা মনকে বুঝি উন্মনা করে, নিভৃত কোন্ থেকে টেনে নেয় বাইরের জগতে। বাইরের বিশাল প্রকৃতিটার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয় মনের নিজস্ব কোন অস্তিত্বের জগতকে। মনটা পাখা মেলে, জোছনার তরঙ্গে দোল খেয়ে খেয়ে গলে পড়া রাতের রহস্যে উধাও হতে চায়। সেই চাঁদজাগা রাতে সৈয়দবাড়ি থেকে ফেরার সময় এত কথা মনে হয়নি সেকান্দরের, কিন্তু মনে আছে, কেমন ভাল লেগেছিল ওর।

আজকের রাতটা অন্ধকার। জমাট ঘন এই অন্ধকারের রূপ। খোলামেলা বিস্তীর্ণ পৃথিবীটাকে সে যেন মুঠোর মাঝে এতটুকু করে নিয়েছে। চেতন-অচেতনের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে বস্তুটাকেই করে তুলেছে মুখ্য।

মনের চিন্তাগুলোকেও যেন সমস্ত অস্বচ্ছতা আর দ্বিধামুক্ত করে স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। এই বুঝি অন্ধকার রাতের প্রকৃতি।

পথ ঠাওর করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে সেকান্দর, সত্য আর অপরাধকে গোপন করার জন্যই নাকি অন্ধকারের সৃষ্টি। সজাগকে ঘুমের অচৈতন্যে বিলীন করাই নাকি অন্ধকারের কাজ। অথচ কথাটাকে ঘুরিয়ে বললেই যেন সত্য বলা হয়। অন্ততঃ সেকান্দরের তাই মনে হল। অন্ধকার ওর বিক্ষিপ্ত চেতনাকে এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে এনে সুষ্ঠু এক সংহতির রূপ দিয়ে গেল। ওর মনের সুপ্ত অথবা জাগ্রত চিন্তাগুলোকে অবয়ব দিয়ে স্পষ্ট করে তুলে ধরল ওরই চোখের সুমুখে। সহসা কি এক তীক্ষ্ণতায় আপনাকে অনুভব করল সেকান্দর। এমন করে নিজেকে কখনো অনুভব করেনি ও। সেই চকিত অনুভবটাই বুঝি একটি প্রশ্নের আকারে এই অন্ধকার রাতে ঘিরে ধরল ওকে। অখ্যাত গ্রাম্য জীবনে, গরীব শিক্ষকের বিড়ম্বিত প্র্যাত্যাহিকতার মাঝেও কোন সাধানার ধন কি খুঁজে পাওয়া যায় না? সাধকের গল্পটি মনে মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এ কী প্রশ্ন উঠে আসে! চঞ্চল আর দ্রুত হয় সেকান্দরের পদক্ষেপ।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানুষ করতে হবে ভাইটিকে, নিজের যত অপূর্ণ আকাঙ্খা

তারই মাঝে রূপায়িত হবে, এতদিন এটাকেই তো একমাত্র সাধনা বলে জেনে এসেছে সেকান্দর। আজকের অন্ধকারে মনে হল ওটা আরো হাজারটি স্বার্থবোধের মতোই একটি সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা। যে স্বার্থ জ্ঞানে ফেলু মিঞা উন্মাদ, রমজান হিংস্র, রামদয়াল নিষ্ঠুর, সৈয়দগিন্নী চতুরা, সেকান্দর মাষ্টারও তেমনি একটা স্বার্থপর বুঝি। তবে...?

সহসা মনের মাঝে গজানো অনেক আগাছা যেন ছেঁটে ফেলে দেয় সেকান্দর। না সৈয়দগিন্নীর অনুগ্রহটা গ্রহণ করবে না ও। ওতে ছোট করা হবে নিজেকে, নিজের শিক্ষকতার পবিত্র ব্রতকে। গ্রাম্য কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে শুধু ঝন্‌ঝাট আর নোংরামিই ডেকে আনবে নিজের উপর। আর ছোট ভাই সুলতান? নিজের আয়ে নিজের শ্রমেই ওকে মানুষ করবে সেকান্দর।

সুঁচ চলেনা এমনি ঘন আর নিরেট অন্ধকারে কি যেন আলোর সন্ধান পেয়ে গেল সেকান্দর মাষ্টার। এমনিই বুঝি হয়। আচম্বিতেই ঘুরে যায় জীবনের মোড়।

কিন্তু, লেকুটার হল কি? কদিন ধরে সেকান্দরের ধারে কাছে ঘেঁসছে না ও। সবাই মিলে গেল ফেলু মিঞার কাছে, লেকু যায়নি। নিজেকেই অপরাধী মনে হয় সেকান্দরের। সেদিনকার সেই সকাল বেলায় কেমন ঘৃণা আর খেদ মিশিয়ে বলেছিল লেকু, আমরা তো অমানুষের জাত। সেই কথা আর ক্রুদ্ধ লেকুর সেই মুখটা মনে পড়ল সেকান্দরের। ওর এতটুকু ভরসা নেই সেকান্দরের উপর। তাই নিজের পথেই বুঝি চলেছে ও। রামদয়ালের কাছে জমি রেহান দিয়ে টাকা এনেছে লেকু। মিঞার বকেয়া পাওনা শোধ দিয়েছে। ইস্ কী বিষ মিশিয়েই না রমজান সেকান্দরকে শুনিয়ে গেল কথাটা। এত বিষ ওর হিংসায়? গতরাত নিজের ঘর থেকেই চেঁচিয়েছিল রমজান: হল তো এখন? জোট বাঁধ ওই ছোট লোকদের নিয়ে? কেমন সটকে পড়ল জোটের পালোয়ানটা। জ্ঞাতি ভাইয়ের দুষমনি করলে এমনিই হয়। আরো দুর্ভোগ আরো অপমান সেকান্দরের নসিবে আছে এটা হলফ করেই বলে দিতে পারে রমজান।

অবশ্য রমজানের ক্রোধের হেতুটা অন্য। তলে তলে একটু আধটু সুদী কারবার করছে ও, সবাই জানে। সেটা জানা সত্ত্বেও বাকুলিয়ায় ওর স্বধর্মী ভাই বেরাদাররা ছুটে যাবে বিধর্মী রামদয়ালের কাছে এটা ওর পক্ষে অসহ। রামদয়ালের কাছে জমি বন্ধক রেখেছে লেকু, এ খবরটা পেয়ে তাই গোটা শরীরে আবার আগুন ধরেছিল রমজানের। তেঁতে উঠেছিল ওর মাথার

ঘিলুটা। শুধু তো একটা দাঁও ফসকে গেল না! আরও একটা প্রতিশোধ নিল লেকু, আচ্ছা রকম জব্দ করল রমজানকে। গাইগরুটাকে জখমী করেও বুঝি ওকে এতটা বেচাইন করতে পারেনি লেকু।

সহসা মুসলমান জাত সম্পর্কে দিব্য জ্ঞান লাভ করল রমজান। মুনিব ফেলু মিঞার সাথে আজ একমত হল ও।

মুসলমান—তায় আবার কমজাত, ছোট লোকের বাচ্চা। কি হবে এই জাতের? মুনিব ফেলু মিঞার অনুকরণে মনে মনেই আফসোস করে রমজান। ফেলু মিঞার এই উক্তিটা বিশেষ ভাবেই আজ ভাল লেগে গেল রমজানের। শালা কমজাত কমিনা; কি ক্ষতি হত জমিটা রমজানের কাছে বন্ধক দিলে? টাকা কি কম পেত লেকু, নাকি কম দিত রমজান? গ্রামের জিনিস গ্রামেই থাকত, তারই জাত ভাইয়ের জিম্মায়। হাজার শত্রুতা থাকুক, রমজান তো মুসলমান, রামদয়াল হিন্দু—মুসলমানের শত্রু। শালা যদি মরিস এখন, কে যাবে তোর গোর খুঁড়তে? ওই রামদয়াল না তোর পড়শী জাত ভাইরা? ফেলু মিঞার দুর্বোধ্য সেই বিক্ষোভের উৎসটা এমনি করে দিনের মত পরিষ্কার হয়েছিল রমজানের কাছে। মুনিবের প্রতি মনে মনে সালাম জানিয়েছিল রমজান। আর রাত্রে খেতে বসে মনের জ্বালা ঝেড়েছিল জ্ঞাতি দুষমন সেকান্দরকে উপলক্ষ্য করে।

কিন্তু, বলা নেই কওয়া নেই, জমিগুলো রেহান দিয়ে দিল কেন লেকু? দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে বিছানায় গাটা এলিয়ে দিতে দিতে ভাবে সেকান্দর মাষ্টার। পাশের চৌকিতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছোট ভাই সুলতান। ওর নিঃশ্বাসের বাতাসটা সেকান্দারের গায়ে এতে লাগছে। অন্ধকারেই ওর দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি পাঠিয়ে পাশ ফেরে সেকান্দর।

হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। হঠাৎ তরজার বেড়ার উপর কি যেন খস খস করে ওঠে। বেড়ার উপর কোন ছোট হাতের কয়েকটা ধাক্কাও পড়ল বুঝি। ঘুমটা ভেঙ্গে গেল সেকান্দরের। কানটা খাড়া করে ও শুনতে পেল নীচু মেয়েলী কণ্ঠস্বর—মাষ্টার সাব, মাষ্টার সাব।

ওকেই ডাকছে। কিন্তু, এত রাতে কে-ই বা ডাকবে ওকে! তার উপর মেয়েলী স্বর? অন্ধকারেই পায়ের ইশারায় এগিয়ে এসে দরজার হুড়কোটা খুলে ফেলল সেকান্দর।

হুরমতি? কি হল হুরমতির? এই গভীর রাতে সেকান্দর মাষ্টারের কাছে কী প্রয়োজন পড়ল ওর? হুরমতির সঙ্গে মালু। সেকান্দর কোন কিছু জিজ্ঞেস

করার আগেই হড় হড় করে লম্বা এক বৃত্তান্ত দিয়ে গেল মালু যার সবটা বুঝে নেওয়া দুঃসাধ্য। ঘরে ফিরে পিরানটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল সেকান্দর। রাস্তায় পড়ে ওর ভুলটা ভেঙ্গে গেল। রাত গভীর নয়, শেষ প্রহরটা যাই যাই করছে। চাঁদটা মরার আগে ম্লান আর বিমর্ষ মুখে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কয়েকটা বাদুড় ফর ফর বাতাশ কেটে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। এই রাতের বেলা কোত্থেকে একটা বাজপাখী ডেকে উঠল। কি বিশ্রী আর কর্কশ গলাটা।

শীতটা ফুরিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক কামড়ে যাচ্ছে গাটা। পায়ের তলায় শিশির ভেজা মাটিটা কেমন মৃদুল কোমল। মাঝে মাঝে সিক্ত ঘাসের শীষ পায়ে পায়ে কি যেন আদর বুলিয়ে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে কেমন এক ভালো লাগা জড়িয়ে থাকে সেকান্দরকে ঘিরে। আর যেন অনেক বিস্ময় সহসা আঘাত করেছে ওর দুয়ারে তেমনি করে ও তাকায় পাণ্ডুর চাঁদটার দিকে, শেষ রাতে ফিকে জামায় আবৃত গাছের ঝোপগুলোর দিকে। বাকুলিয়ার শেষ রাত যে সুন্দর, এ কথাটা এতদিন কেমন করে অজানা থেকে গেল ওর কাছে! কি এক স্নিগ্ধতার পরশে গাটা ওর জুড়িয়ে যায়। মিষ্টি একটা স্বাদে ভরে যায় মুখটা। এমনি আরো অনেক স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েই বুঝি কেটে গেছে জীবনের আটাশটি বছর। চিন চিন করে জেগে ওঠা কোন ব্যথার মতোই কথাটা মনে এল সেকান্দরের।

বাতাসে কেমন থকথকে হয়ে লেগে রয়েছে হুরমতির ফুলেল তেলের গন্ধটা। কি এক উদ্বেগে কাতর ওর মুখটা। কিসের যেন ব্যাকুলতায় দ্রুত আর এলোমেলো ওর পদক্ষেপ। ওকে ঘিরে শেষ রাতের রহস্য। মনে পড়ল সেকান্দরের এই রাতেরই প্রথম প্রহরে দেখেছিল ভক্তির রসে উদ্বেল হৃদয়টা ভাসিয়ে কাঁদছিল মেয়েটি। আর এই শেষ প্রহরের রহস্য-মোড়া মেয়েটির বুকে কত দুর্ভাবনার দুরু দুরু কম্পন, কে জানে!

হুরমতির খবরে আর মালুর বয়ানে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। কসিররা চলে যাচ্ছে।

ওদের দোচালা ঘরটির সামনে সাদা উঠোনটুকু ফিকে জোছনায়ও কেমন ধবধবে। দু বউ এক ছেলের সংসারে যা কিছু সম্পত্তি উঠোনে নামিয়ে গাঁটরি বাঁধছে কসির। কী-ই-বা সম্পত্তি। খান তিনেক কাঁথা, মাটির হাঁড়ি, মাটির বাসনখোরা, একটা এ্যালুমিনিয়ামের বাটি, দুটো এনামেলের ছড়-ওঠা গামলা, পিঁড়ি। কাঁথাগুলোর আলাদা একটা গাঁটরি করে ওর ভেতর দা কাস্তে

আর কুঠারটা সেঁদিয়ে দেয় কসির। একটা 'কোরায়' হাড়ি পাতিলগুলো ভরে মাছ ধরার কোঁচটা হাতে নেয়, তারপর বউদের ডাকে—চল্।
লম্বা ঘোমটা টেনে কাঁদছে বউরা। আঁচলের খুঁটে চোখ মুচছে ঘন ঘন। ভিটির প্রতি মেয়েদেরই বুঝি টান বেশি। নীড় রচনায় হৃদয়ের অবদানটা পুরুষদের চেয়ে ওদেরই বেশি, তাই নীড়ের প্রতি এত মমতা ওদের। কসির ঘর গড়েছে, আবার গড়বে। তাই ভাংতেও বুঝি দ্বিধা নেই ওর। কিন্তু বউরা? তৈরি করা ঘর ফেলে যেতে কলজেটা ওদের ছিঁড়ে যাচ্ছে।
এই খবরদার। ফ্যাস ফ্যাস করবি তবে চোখের উপর বসিয়ে দেব এই কোঁচ। খেঁকিয়ে ওঠে কসির। ওর হাতের চাপে ঝনঝনিয়ে ওঠে কোঁচের শলা।
কাঁথার গাঁটরিটা কাঁধে নিয়ে বলল লেকু, হয়েছে বউদের উপর আর মরদ গিরি ফলিয়ে কাম নেই, এগোও তুমি।
সত্যি কি চলে যাচ্ছে কসির? রাত্রির আবরণ নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা আর রামদয়ালের ঋণ ফাঁকি দিয়ে? ওকে কেমন করে ঠেকাবে সেকান্দর? ওর কাঁধে হাত রাখল সেকান্দর, বুঝি বলতে চাইল, যাসনে ভাই কসির, সুখ দুঃখ আহার অনাহার সবই আমরা সমানভাবে ভাগ করে নেব। ছাড়িসনে বাপ-দাদার ভিঁটিটা। ঠিক এ কথাগুলো বলার জন্যই তো হুরমতি ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছে ওকে। কিন্তু, বলতে পারল না সেকান্দর। কিসের ভরসায় ওকে থেকে যেতে বলবে সেকান্দর।
ফজর আলী যেন একেবারে ছিপি এঁটে দিয়েছে মুখে। মনমরা হয়ে চলেছে সবার পেছনে। অথচ সেদিন ও-ই-তো পয়লা মনে করিয়ে দিয়েছিল বাপ-দাদার ভিঁটের কথা। আজ সে-ও বুঝি খুঁজে পায়না কোন কথা।
ভাড়া-করা নৌকোটা বাঁধা আছে বড় খালে। লেকু আর কসির বোঝা-গুলো নামিয়ে রাখল। তারপর কসিরের হাত ধরে বাচ্চা কোলে বড় বউ আর ছোট বউ উঠে গেল। এক পা পাটাতনে আর এক পা কাদায় রেখে কসির বিদায় নিল ওদের কাছ থেকে। সেকান্দরের হাতে হাত রেখে অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ও—মাষ্টারসাব মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার আসব!
মানুষ হবে কসির? তাই ঠিক। তাই ঠিক। কসির, মানুষ হয়েই ফিরে এস তুমি। পানিতে ভরে গেল সেকান্দারের চোখ।

কলকলিয়ে চলেছে জোয়ারের পানি। জোয়ারের টানে যেন উড়ে চলল নৌকোটা। পার থেকে চেয়ে থাকে ওরা, যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় নৌকোটা। ছইয়ের বাইরে মাথাটা উঁচিয়ে কসিরও বুঝি জন্মভূমির শেষ ছবিটি দেখে নিচ্ছে, বুক ভরে টানছে বড খালের চেনা বাতাস। আর আজন্ম চেনা মানুষের ছাযাগুলোও যখন হারিয়ে যাবে দৃষ্টির বাইরে তখন হয়ত ওদের মুখগুলোই সে ভাসিয়ে তুলবে আপন মনের পটে।

কোথায় যাবে কসির? হযত আসামের গহিন অরণ্যে। পূর্ববঙ্গের কত কৃষক সেখানে নীড বেঁধেছে, ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ অরণ্য অঞ্চলকে মানুষের কাকলিতে মুখর করে তুলেছে। তাদেরই সাথে নতুন করে ঘর বাঁধবে কসির। ওর কুঠারের আঘাতে পায়ে পায়ে পিছু হটবে জঙ্গল। হিংস্র পশুর দেহ খণ্ড বিখণ্ড হবে ওর বর্শাফলকের মুখে। বশ মানবে বিরোধী প্রকৃতি। তারপর সবল দুটি হাতের সঞ্চালনে লতাগুল্মের ঘন আগাছা, ছিন্ন কাণ্ড উপডে ফেলবে ও, বের করবে তুলতুলে নরম মাটি। সে মাটিতে ফসল বুনবে। মাটি আর ফসলের সে-ই হবে অধীশ্বর।

কিন্তু সেখানেও কি সুখের মুখ দেখবে কসির? আরো কত ফেলু মিঞা আরো কত রামদয়ালের পাওনার হাত কি হন্যে হয়ে পিছু পিছু তাডা করবে না ওকে?

নাঃ কসির ফিরবে না। বুঝি অসাবধানেই সেকান্দরের মনের চিন্তাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা চমকে উঠল। সত্যিই তো, যারা গেছে তারা ফিরেছে কেউ? কেউ ফেরেনি। ষোল ঘর লোক নিযে কেমন জম-জমাট থাকত মাঝি বাডিটা। আজ মোটে তিন ঘর, তিনটি পরিবার। মৃধা বাড়িটাতো বিরানাই হয়ে গেল। একমাত্র রহমত বুড়ো বুঝি তার চেয়েও বয়সে বড ভাঙ্গাচোরা গরুর গাড়িটা নিয়ে টিম টিম করছে অতবড বাডিটাতে। পরিত্যক্ত ভিঁটিগুলোতে এখন শুধু আগাছার জঙ্গল।

নাঃ, কসির ফিরবে না, ভরা গাঙ্গের কুলকুল জোয়ারেও বুঝি সেই একই প্রতিধ্বনি।

চল ফিরি।

ওরা বসে পড়েছিল। সেকান্দরের ডাক শুনে বুঝি চমকে উঠে শেষ বারের মত বড়খালের দূরতম বাঁকটির উপর অন্বেষা দৃষ্টি বুলিয়ে আনে। বড়খালের কোলে কি যেন চিরদিনের জন্ম বিসর্জন দিয়ে গেল ওরা।

চাঁদটা যে কখন ডুবে গেছে টের পায়নি কেউ। যে ঈষৎ ভেজা হিমটা এতক্ষণ লেগেছিল পায়ের ডগায়, সেটা উঠে এসেছে হাঁটু অবধি। একটু পরেই বুঝি ফর্সা হয়ে যাবে। এখনকার আকাশটা দেখা-না-দেখার কেমন এক রহস্য আর দখিন ক্ষেতের বুক চিরে মাটির রাস্তাটা অস্পষ্ট ইশারা।
বইয়ে পড়া, ছোট বেলায় কিছুটা বুঝি চোখেও দেখা সোনার বাংলা, সোনার গ্রাম। ভেঙ্গে যাচ্ছে সেই গ্রাম বাংলার গাঁথুনী। এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে মানুষগুলো। ঘুঘু চরছে শূন্য ভিটায়। কে রুখবে, কেমন করে রুখবে এ ভাঙ্গন?
কেমন মুঠো হয়ে আসে সেকান্দরের হাতজোড়া। বুঝি অস্বাভাবিক রকমের শব্দ করেই বেরিয়ে আসে ওর মনের বিক্ষোভটা। হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকে বাকুলিয়ার লেকু আর ফজর আলি, কলংকিনী হুরমতি আর মায়ের মার খাওয়া ছেলে মালু: কি হল সেকান্দর মাষ্টারের?

এস, একটু চা খেয়ে যাও। বাড়ির সীমানায় পা রেখে ওদের ডাকল সেকান্দর। চা খাওয়াটা ওর অনুপানের মতো। বাড়িতে চায়ের পাট নেই। কেবল ঘোর কোন বর্ষার দিনে অথবা সর্দি জমে মাথাটা যখন টনটন করে তখন আদা তেজপাতার সাথে এক চিমটে চা পাতা সেদ্ধ করে তার সাথে কিছু চিনি লবণ মিশিয়ে চুমুক চুমুক টানে। শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মাথা ধরাটা ছেড়ে যায়।
আসলে চা খাওয়াটা বাহানা, ওদের সঙ্গটা বুঝি ছাড়তে চায় না সেকান্দর। নির্ঝন্ঝাট সরল জীবনটা ওর কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। স্থির বাসনা-স্কুল-ক্ষেত-বাড়ি। নির্ধারিত বৃত্তের মাঝে সীমিত জীবন। হঠাৎ সেই বৃত্তের আড়ালটা যেন অপসারিত হয়ে গেছে। ওর অজানতেই কখন বিস্তৃত হয়ে গেছে জীবন আর চিন্তার পরিধিটা। গৎ ধরে চলা আর বাঁধাধরা ভাবনা, সব কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
বাকুলিয়ার সকলের সাথে, সব কিছুর সাথেই কখন সে জড়িয়ে পড়েছে। কারো বিশ্বাস, কারো অবিশ্বাস, কারো বা ঘৃণা—সব কিছু মিলিয়ে এ জীবনটা কেমন? ইচ্ছে করলেও যেন এর মায়া কাটানো যায় না।
দু হাতের চেটোর মাঝে ধরা গরম এনামেলের বাটিটা একটু বুঝি নড়ে উঠল।

নিজের ভেতরেই চমকে ওঠে সেকান্দর। গত রাত অর্থাৎ মাত্র ঘণ্টা পাঁচ ছয় আগে সৈয়দ বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঠিক এ কথাগুলোই কি ভাবছিল না সেকান্দর? হয়ত একটু অন্য ভাবে ভাবছিল, অন্য কোন ঘটনার সাথে মিলিয়ে। তালতলির শ্যামচরণ দত্ত হাইস্কুলের জুনিয়ার মাষ্টার আবুল বশর মোহাম্মদ সেকান্দরের কি হল? ও কি ভাবতো কখনো? ভাবলেও কোনদিন কি বেচাইন হত ও?

চায়ের বাটিটা এক পাশে ফেলে রেখে বেড়ার গায়ে ঢলে পড়েছে মালুর ঘুমঘুম দেহটা। সেদিকে চোখ পড়ে হঠাৎ চটে গেল সেকান্দর: এই মালু। লেখা নেই পড়া নেই, খালি ডাং ডাং। ঘর বাড়ি ছেড়ে রাত বিরেতে যার তার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এখনি বখে যেতে শুরু করেছিস, না? দাঁড়া আজ স্কুলের বেতটা নিয়ে আসব, তোর পিঠেই ভাংতে হবে ওটা। মালুর দিকেই উঠে যাচ্ছিল সেকান্দর। হঠাৎ হুরমতির চোখে চোখ পড়ে পা-টা যেন তুলতে পারে না ও। অসাবধানে এমন একটা রূঢ় কথা বলে ফেলল ও? হুরমতির চোখের পাতাগুলো কেমন লাল নীল আর ভারি ভারি। ও কি কেঁদেছে এতক্ষণ? কেমন যেন লজ্জা পেয়ে নিজেই চোখ নামিয়ে নিল সেকান্দর। না, আজ হুরমতিকে এতটা অশ্রদ্ধা করতে পারল না ও।

মালুকে শুইয়ে দাও আমার চৌকিটায়, সারারাত ঘুমোয়নি, কতক্ষণ আর ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখবে। হুরমতিকে উদ্দেশ্য করেই বলল সেকান্দর। স্বাভাবিকের চেয়েও বুঝি নরম ওর স্বরটা।

না গিয়ে কি করবে? হাশে গেরামে কি ভাত মিলে, না কাম মিলে? চা শেষ করে খোরাটা দাওয়ায় রেখে বলল ফজর আলি। এতক্ষণ ধরে এ সব কথাই বুঝি তোলপাড় খাচ্ছিল ওর মনে।

আরো যাবে, দেখবেন মাষ্টার সাব। ওই মিঞা আর বাবুরা মিলেই খেদাবে। সেকান্দরের দিকে তাকিয়ে লেকু মুখ খুলল এতক্ষণে।

অকস্মাৎ ক্ষেপে গেল সেকান্দর। তর্জনীটা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: খবরদার লেকু, খবরদার ফজর আলি। যাবার টাবার কথা বলেছ কি এখুনি বের হও আমার বাড়ি থেকে। গেরামটাকে কি তোমরা গোরস্থান বানাবে?

কাঁচু মাচু করে মুখ আর বুক এক করে ওরা। ওরা হয়রান মানে, আজ কি হয়েছে সেকান্দর মাষ্টারের?

সেদিন আমার মাথাটা ঠিক ছিল না মাষ্টার সাব। আপনি মাফ করে দিন। সেকান্দরের আকস্মিক রাগটাকে গলিয়ে দেবার জন্যই বুঝি পেছনের কোন

কথা পাড়ল লেকু। কুণ্ঠিত নীচুস্বর লেকুর। এমন স্বরে লেকুকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি কেউ।

ওর কথা আর ওর স্বর, দুটোই যেন রাগ তাড়িয়ে বিস্ময় ফোটায় সেকান্দরের মুখে। অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারে না সেকান্দর, মাফ চাইবার মতো এমন কি করেছে লেকু। হঠাৎ মনে পড়ে হেসে দিল ও, বলল, কি যে বল। একটু থেমে বলল আবার, গেরামটা ছাড়বে না তো?

মাষ্টারের স্বরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল। ওদের বুকে গিয়ে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল।

না। অদ্ভুত এক জোর লেকুর গলায়।

জাহাজের ভাড়াটা আলাদা করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল লেকু। থোড়া যায়গাটাকে ঢাকতে গিয়ে সারা ঘরটাই লেপতে হয়েছে আম্বরিকে।

পাহাড় থেকে ফিরে এসেই রওনা দেবে রঙ্গম, এবার একলা নয়, আম্বরিকে সাথে করে। এই তো ঠিক ছিল। কিন্তু, এই একটি মুহূর্তে ওর সব ঠিক বেঠিক হয়ে গেল!

আচ্ছা উঠি। সেলাম দিয়ে উঠে গেল ওরা।

একটু গড়িয়ে নেবার জন্য নিজের চৌকিটায় গা রাখল সেকান্দর। ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ ঘুমুতে পারল না। মায়ের চেঁচামেচি আর হাতের টান খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। ঘরের ছায়াটা দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নাবতে শুরু করেছে, এত্তেলা দিচ্ছে মা।

হাঁ, স্কুলের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বই কি! তাড়াতাড়ি মালুকে একটা ধাক্কা দিয়ে উঠে গেল সেকান্দর। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এল, নাকেমুখে দুটো গুঁজে নিল।

খুন হলরে। খুন হলরে। খুন···হঠাৎ চীৎকার ভেসে এল। কানখাড়া করল সেকান্দর। গলাটা চেনা চেনাই মনে হচ্ছে। উত্তর দিক থেকেই ভেসে আসছে চীৎকারটা।

মুখে একটা পান পুরে ছাতাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেকান্দর। কতটুকুই বা এগিয়েছে। পেছন থেকে কে যেন গলা ফাটিয়ে ডাকছে— মাষ্টার সাব মাষ্টার সাব শীগ্‌গীর আসেন। পেছন ফিরে দেখল সেকান্দর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে ফজর আলী, চীৎকারের সাথে সাথে হাতের ইশারায় থামতে বলছে ওকে।

খুন খারাবিটা কালেভদ্রে হলেও 'কাইজা' ফ্যাসাদ তো বাকুলিয়ায় নিত্য ব্যাপার। কিন্তু সে সব ঝগড়া বিবাদে সেকান্দর মাষ্টারের আবার ডাক পড়েছে কবে! গায়ের জোরে যে যা পারল, বাকিটুকুর জন্য তো রয়েছে মাতবর আর পঞ্চায়েত। খিঁচোনো মেজাজটা আরো যেন খিঁচিয়ে যায় সেকান্দরের। ওরা বুঝি একটুও রেহাই দেবে না ওকে, স্কুলে যাবার মুখেও না। হাজারো ঝামেলা ঝন্ঝাট চাপিয়ে দেবে ওরই মাথায়।

মারামারি করেছে তো আমি করব কি? পঞ্চায়েত ফেলে আমার কাছে কেন? ফজর আলির কথা সবটা না শুনেই খেঁকিয়ে ওঠে সেকান্দর।

মারামারি কি বলছেন, এ যে খুন!

খুন?

হ্যাঁ, খুনই তো। জানটা তো যায় যায়। কতক্ষণ টিকবে কে জানে!

যেন সম্বিত পেয়ে পড়ি মরি ছুট দেয় সেকান্দর মাষ্টার।

গাঁও মুল্লুকে যেমন আরো দশটি বিবাদ সামান্য শুরু থেকে মারাত্মক আকার নেয় তেমনি মামুলি ঘটনাটা রক্তারক্তি পর্যায়ে পৌঁছেছে। শেষ হয়নি, শেষের জেরটা কোথায় এবং কতদিন চলবে কে জানে।

লেকুর ঘরের পেছনের চালটা চুঁইয়ে পানি পড়েছে গেল বর্ষায়। সেই তখন থেকেই নতুন চাল তুলবার কথাটা ভেবে আসছে ও। মুফতে নয়, নগদ দিয়ে কসিরের চাল দুটো তাই কিনে রেখেছে ও। সেকান্দরের বাড়ি থেকে ওরা আর ঘরে ফেরেনি। এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে দু একজনকে ডেকে ওরা দুজনে কসিরের পরিত্যক্ত ঘরের চালগুলো নামাতে লেগে যায়।

মাত্র একটা চাল নামিয়েছে এমন সময় রমজান এসে হুংকার ছাড়ে—খবরদার, ও চাল ধরবেনা, নেমে এস শীগ্‌গীর। খাজনা বাকি রেখে পালিয়ে গেছে কসির। অতএব ওই ঘর মিঞার প্রাপ্য। স্পষ্ট কথাটা জানিয়ে দিয়ে রমজান বুঝি কালু পেয়াদাকে নিয়ে নাবানো চালটা দখল করতে যায়। তখুনি তর্ক। আর তর্ক থেকে হাতাহাতি বেধে গেল লেকুর সাথে। ফজর আলি ছিল চালের উপর, বাকি চালটার বেতের বাঁধন গুলো কেটে কেটে আলগা করছিল। লেকু ছিল নীচে। তাই অত লক্ষ্য করেনি ফজর আলি। হঠাৎ চীৎকার শুনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল ফজর আলী উন্মাদের মত দা চালাচ্ছে রমজান, একটার পর একটা কোপ বসিয়ে চলেছে লেকুর গায়ে। জলদি চাল থেকে নেমে আসে ফজর আলি, পেছন থেকে পা-টা পটকান দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় রমজানকে। নইলে তো টুকরো টুকরো হয়ে যেত লেকু।

ঘটনার যায়গায় এসে দেখল সেকান্দর এতটুকু অতিরঞ্জন নেই ফজর আলির বর্ণনায়। দার কোপে কোপে জর্জর লেকুর পেশীবহুল শরীরটা। উরুর উপরকার ক্ষতটাই সবচেয়ে বড়। এক দলা গোশত ঝুলে পড়ে ক্ষতটা একটি বীভৎস রূপ নিয়েছে, সাদা হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এখনো রক্ত পড়ছে গল গল করে। ঘাড়ে কাঁধে পিঠে বাহুতে শুধু দার কোপ, এতটুকু যায়গা যেন খালি রাখেনি রমজান। ঘা গুলোর মুখে রক্ত এখন দলা পাকিয়ে জমে আছে চিটে গুড়ের মতো। অচেতন লেকু যেন ডুবে আছে রক্তে, মাটিটাও রক্তে জবজব।

একবারের বেশি তাকাতে পাবল না সেকন্দার। মানুষকে মানুষ এমন করে আহত করতে পারে, দলা দলা মাংস এমন করে কেটে কেটে তুলে নিতে পারে আর একটি মানুষের দেহ থেকে? এ কী বর্বর প্রতিশোধ নিল রমজান। ওর গরুটাকে যেমন করে কাঁটা ফুঁড়ে ফুঁড়ে জর্জর করেছিল লেকু, এ তো তার চেয়েও নৃশংস, তার চেয়েও বীভৎস। সারা গায়ে দায়ের কোপে কোপে কী বন্য-ক্রূরতা আর বর্বরতার ভাষা রেখে গেছে রমজান।

সবাই বে-দিশা। সবাই লেকুকে ঘিরে, কিন্তু ওর ধুক ধুক হৃদয়ের স্পন্দনটা যে যেকোন সময় থেমে যেতে পারে সেদিকে যেন কারও খেয়াল নেই।

এই যাও। রহমত মৃধার গাডিটা নিয়ে আস। জলদি কর। ফজর আলির দিকে তাকিয়ে আদেশ করল সেকান্দর। মাষ্টারের এ মূর্তি অন্য মূর্তি, এ মূর্তিকে আমল না দিয়ে চলে না! ফজর আলি ছুটে যায় মৃধা বাড়ির দিকে। এই মালু, তুই দৌড তো। গগন ডাক্তারকে নিয়ে আয়। এই ছেপ ফেললাম, এটা শুকোতে না শুকোতেই চলে আসা চাই কিন্তু। মালু ছোটে তালতলির পথে।

ক্রোধে গোটা শরীরটা কাঁপছে সেকান্দরের: এ কি মগের মুল্লুক নাকি? ইংরেজের আইন কানুন কি নেই দেশে? থানা পুলিশ উঠে গেছে দেশ থেকে? চীৎকার শুনে যে যার কাজ ফেলে ছুটে এসেছে, বড় রকমের ভীড় জমে গেছে। সেই ভীড়টার উদ্দেশ্যেই যেন চেঁচিয়ে চলে সেকান্দর মাষ্টার। কয়টা হার্মাদ মাতিয়েছে দেশের মধ্যে। আজ এর ছাগল চুরি, কাল ওর ক্ষেতের ফসল চুরি, মারামারি অশান্তি লাগিয়েই রেখেছে। এই হার্মাদ শয়তানগুলোকে সায়েস্তা করতে হবে, ওদের হাতপা ভেংগে দিতে হবে। অনর্গল চেঁচিয়ে চলেছে সেকান্দর।

এতক্ষণে বুঝি খবরটা আম্বরির কানে গেছে। আলুথালু বেশে দৌড়ে আসছে

ও। পেছনে হুরমতি, কিছুতেই সামলে রাখতে পারছেনা আম্বরিকে। রক্তমাখা জ্ঞানহীন মানুষটাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে ওঠে ও। নিথর দেহটার উপর আছড়ে পড়ে।
আহ্ হুরমতি, থামাতো ওকে, নিয়ে যা এখান থেকে। বলল সেকান্দর। কিন্তু বললে কি হবে, আম্বরির গায়ে এখন দুনিয়ার জোর।
এই হট্ হট্। ছুঁবিনা ওকে এখন। খবরদার। নিজেই তেড়ে আসে সেকান্দর। ওর ধমকে এই শোকের মাঝেও বুঝি হকচকিয়ে যায় আম্বরি। পলকের জন্য কান্নাটা ওর থেমে যায়। হুরমতি টেনে নিয়ে যায় ওকে।
বেশিদুর নিতে পারে না। ওর হাতের বাঁধন থেকে ছিঁটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায় আম্বরি। মাথা আছড়ায় মাটিতে। টেনে টেনে বিলাপ করে, ওরে আল্লারে, আমার কপালটা পুড়ল রে। এরি মাঝে আবার বিলাপ ছেড়ে খনখনিয়ে উঠছে ওর অভিসম্পাতের জিহ্বা, কোন্ হার্মাদ, কোন্ কুত্তার বাচ্চা, কোন্ শুয়রের জন্ম শুয়র আমার এমন সর্বনাশ করল রে। আল্লার কহর পড়ুক, নির্বংশ হোক সেই বেজন্মা।
'কহর' থামিয়ে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে আম্বরি। মাথার চুল ছেঁড়ে, কাপড়ের আঁচল টেনে টেনে ছেঁড়ে। হুরমতি কোলে নিতে চেষ্টা করে ওকে। কামড়ে দেয় হুরমতির হাত। আবার গড়াগড়ি খায় মাটিতে। তারপর অভিশাপের সম্ভাব্য পরিণতিগুলোও সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বয়ান করে চলে আম্বরি: হাত ভাংবে, পা ভাংবে, হাটু ভাংবে। লুলো হবে, অন্ধ হবে, খোদার আকাশ থেকে ঠাডা ভেংগে পড়বে মাথায়, সারা গুষ্টি জাহান্নামে যাবে।
এই চুপ। খালি কাঁদবি নাকি তুই? কান্না ছাড়া কার কি পারিস? আম্বরির সামনে এসে খেঁকিয়ে ওঠে সেকান্দর। তারপর হুরমতির দিকে তাকিয়ে বলল ও, এই হুরমতি নিয়ে যা ওকে বাড়িতে। ওর ধমকের চোটে ভীড়টাও বুঝি পিছু হটে যায় দুপা।
ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ সেকান্দর মাষ্টার। নিজেকেই যেন ও আর সামলে রাখতে পারছে না। মিনিমুখো মুচকি শয়তান, আড়ালে বলতে রমজান। ভাল মানুষ শান্ত সরল 'মাষ্টার সাব', বলত বাকুলিয়ার মানুষ। সেই শান্ত মানুষটির এই অগ্নিমূর্তির দিকে বিস্ময় মেলে চেয়ে থাকে বাকুলিয়ার মানুষ। গ্রামের কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারপিট, এক কথায় ভয়ংকর কিছু ঘটলেই মিঞা বাড়ির কর্তারা আসেন অকুস্থলে। এটা ওদের প্রজা হিতৈষণার

ঐতিহ্য। ফেলু মিঞাও এল। শুনল দেখল। বলল : বড় আফসোস, এমন না হক কাণ্ড ঘটে গেল। যাক, ডাক্তার ডাক। টাকা পয়সা যা লাগে নিও আমার কাছ থেকে। আর রমজানটা বাড়াবাড়ি রকমের গোঁয়ার বই কি? ওকে শাসন করে দেব আমি। তোমরাও রাতে এস আমার কাছারিতে।

রহমত গাড়িওলাকে নিয়ে ফিরে এসেছে ফজর আলি। ফেলু মিঞার শেষের কথাগুলো ওর কানে যায়। ফস করে বলে ও, বিচারের জন্য ফৌজদারিই আছে, সেখানেই দেখব আমরা।

গ্রামের মেল আছে, জমাত আছে। ও সব ছেড়ে ফৌজদারি কেন? শান্ত ভাবেই বলল ফেলু মিঞা।

হয়েছে হয়েছে। জমাত পঞ্চায়েত যে কি বিচার করে সে আমাদের দেখা আছে। সেকান্দরের কর্কশ রুক্ষ স্বরে ফেলু মিঞাও বুঝি চমকে ওঠে।

তবু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখে ফেলু মিঞা, বলে, তা হাজার দোষ আছে জমাতের, তা বলে কি গ্রামের কাইজা লয়ে পুলিশ ডাকবে, কোর্ট যাবে?

যাবোই তে', ফেলু মিঞার চোখে চোখ রেখেই বলে সেকান্দর।

ফেলু মিঞার নীল রক্তটা অকস্মাৎ সমুদ্র ঘূর্ণীর মতো কয়েকটা পাক খেয়ে গেল। গর্জে উঠল মিঞার ব্যাটা : মেলের বিচার, মজলিসের বিচার, বিচার বিচার নয়? যাও তবে ফৌজদারিতে, দেখি কি বিচার পাও।

এ হুমকিরও জবাব আছে। জবাব দিতে যাচ্ছিল সেকান্দর, কিন্তু থেমে যেতে হয়। গগন ডাক্তার এসে গেছে।

পর পর দুটো সুঁই ফুটিয়ে দিল গগন ডাক্তার। ওষুধ দিয়ে পিঠ আর উরুর বড় দুটো ঘা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। বলল, মারাত্মক সব জখম, নিয়ে যাও শহরের হাসপাতালে।

ওরা ধরাধরি করে লেকুকে তুলে নিল গরুর গাড়িতে। ফজর আলিকে গাড়ির সাথে রওনা করে দিয়ে সেকান্দর চলে এল বাড়িতে। বাক্স খুলে তুলে নিল কিছু টাকা। দ্রুত পা চালিয়ে মন্থর গরুর গাড়ির নাগাল ধরল।

ফেলু মিঞার চোখের সুমুখ দিয়েই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

এত বড় স্পর্ধা? যাকে কখনো দেখেনি সেই দাদুর জামানার কথাটা মনে পড়ল ফেলু মিঞার। শুধু বাকুলিয়া কেন, দশ বিশ গ্রামে মিঞার চোখে চোখ রেখেছে কেউ কোনদিন? মিঞার সুমুখে কথা বলত তারা মুখ নীচু করে, হুকুম তামিল করত নিঃশব্দে।

ফেলু মিঞার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল আগুনের ফুলকি। বিচারের আশ্বাস দিল, তবু এই উদ্ধত অবাধ্যতা? কেন, হক বিচার কি করতনা ফেলু মিঞা? নাঃ, ছোট লোককে মোটেও আস্কারা দিতে নেই। বাপদাদার অভিজ্ঞতার সেই শোনা কথাটাই দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল ফেলু মিঞা।
হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল ফেলু মিঞার। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা এদিক ওদিক বুলিয়ে আনল একবার। তারপর দ্রুত পা চালাল তার কাছারির দিকে। আর ওর পিছে পিছে ভেসে চলে আম্বরির অভিসম্পাতগুলো: এত হার্মাদি সইবে না খোদা। খোদা জ্যান্ত কবরে নিবে তোকে। খোদার ঠাডা পড়বে, পুত মরবে ঝি মরবে, সর্বশান্ত হবি। নিজের বিষ্ঠা নিজে খাবি।
অভিসম্পাতগুলো যে রমজানের উদ্দেশ্যে সেটা বুঝি বলার প্রয়োজন করে না। নিরক্ষর কিষানীর অশ্লীল মুখরতায় এত উত্তেজনার মাঝেও না হেসে পারেনা ফেলু মিঞা। এমনিই ওদের স্বভাব, যেন মুখটা খারাপ করলেই সব শোধ নিয়ে নেয়া হল। কিন্তু মুহূর্তও স্থায়ী থাকেনা তাঁর মুখের হাসিটা। কেন যেন মনে হল ফেলু মিঞার, আম্বরির ওই অভিসম্পাত গুলো তারই উদ্দেশ্যে। ব্যথিত মনের বদ দোয়া, ফলে যায় সেই বদ দোয়া। এতে যে কোন সন্দেহ নেই ফেলু মিঞার! বৌ হালিমার সেই অভিসম্পাতটাও মনে পড়ল। কুষ্ঠ হবে, কুষ্ঠ হবে ওই হাতে। খোদার কহর পডবে। কি এক ভয়ে গায়ের লোমকূপগুলো তার দাঁডিয়ে যায় আর সেই ভয়টাকে এড়াবার জন্যই আরো জোরে পা চালায় ফেলু মিঞা।
কাছারিতে উঠে বুঝি বেকুব বনে যায় ফেলুমিঞা। কোত্থেকে ছুটে এসে ধড়াস করে তার পায়ের উপর পড়ে যায় রমজান। দু হাতে জড়িয়ে থাকে মুনিবের পা জোড়া। সেই অবস্থাতেই বলে চলে: আপনি মিঞা। আপনি মুনিব। আপনি রিজিকের মালিক। চাবুক মারতে হয় আপনার হাতেই মারবেন এই অধমের পিঠে। কিন্তু, হুজুর ওই ছোট লোক কুত্তার বাচ্চাগুলোর সুমুখে নাজেহাল করবেন না। দোহাই আপনার।
কোন রকমে পাজোড়া ছাড়িয়ে নেয় ফেলু মিঞা, বলে, ব্যাটা চাষা, তোরে কি খুনাখুনি করতে বলেছিলাম? এতটুকু হয়ে যায় রমজান ফেলু মিঞার ধমকে। ফেলু মিঞার যদি ন্যায় বিচারের রোখ চেপে বসে তবে সর্বনাশের কিছু কি বাকি থাকবে?
চাষার পুত চাষা, শোন্। ওকে শুনতে বলে নিজের যায়গাটিতে এসে বসে ফেলু মিঞা। রমজান কাছে এসে হাতজোড় দাঁড়িয়ে থাকে।

জামার খুটটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে পাশে বসিয়ে দেয় ফেলু মিঞা, বলে, শীগ্‌গীর যা শহরে। গত মাসের পয়লা কি দোসরা তারিখ দিয়ে মামলা দায়ের করবি কসিরের বিরুদ্ধে। টাকা নিয়ে যা। যা লাগে তাই খরচ করবি। আর···হুঁ, আর একটা মামলা ঠুকে দিবি চুরির। ট্রেসপাসের। ট্রেসপাস বুঝিস? অন্যের যায়গায় অনধিকার প্রবেশ করেছে লেকু···হ্যাঁ শোন। এদিক ওদিক তাকায় ফেলু মিঞা।
নিশ্চিন্ত হয়ে নেয় কেউ নেই ধারেকাছে। তার পর মুখটা রমজানের কানের কাছে এনে ফিস ফিস করে বাতলিয়ে দেয় বুদ্ধিটা।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় রমজানের মুখের দুশ্চিন্তার কালি। খুশির চোটে বুঝি লাফিয়ে উঠবে ও। কুতকুতে চোখের মণিগুলো সাপের জিবের মতো লিকলিকিয়ে বুঝি বেরিয়ে আসতে চায় কোটর ছেড়ে। ঠোঁটের কোণে কৃতজ্ঞতা স্বস্তি আর নেমকহালালির একটা বিচিত্র হাসি অনেকক্ষণ ধরে রাখে রমজান।
সাধে কি আর সে রমজান—মালিও না, সারেংও না, একেবারে চাষার পুত চাষা; আর ফেলু মিঞা, যাকে বলে মিঞার ব্যাটা মিঞা, তার বুদ্ধির সাথে আঁটবে এমন মাথা এই পরগণায় আছে কয়টা?
টাকা নিয়ে রমজান দৌড় মারে মেঠো পথে। কোনাকুণি আলের পথে সেকান্দর মাষ্টারের আগেই সে পৌঁছে যাবে শহরে, আগেই যে ওর পৌঁছানো দরকার।

বাকুলিয়ার ছোট্ট ছেলে মালু। তালতলির মেলাটা কত কি দিয়ে গেল ওকে! গান সুর আর কথা দিয়ে যেন ভরে দিয়ে গেল ওর ছোট্ট বুকটা। কিষ্কিন্ধ্যার সেই বীর পুরুষটি যে চমক লাগিয়েছিল ওর মনে সেটা প্রথম দুটো রাতের বেশি স্থায়ী হয়না। পরের চমকটা দিয়ে যায় গণি বয়াতি। সে চমক কাটে না, কাটবার নয়। দিনে দিনে সে চমকের ঘোরে মালু যেন কত কিছু খুঁজে পাচ্ছে, যা ওর ছোট্ট মাথার বুদ্ধি দিয়েও ধরতে পারে না, ছোট্ট মনটা দিয়ে বুঝতেও পারে না।
কত কিস্‌সা কত গান গণি বয়াতির। আর ঢং কি শুধু একটি? কত ঢংয়ে কত সুরে কত রকমের নাচে ভাবে বলা কথা আর গাওয়া গান। শুধু কি গণি বয়াতি? সুলতানপুরের মধু গায়েন, উদরাজপুরের গফুর কবিয়াল,

চাটখিলের রতন বড়ুয়া। ওরা যেন এ দুনিয়ার মানুষ নয়, জিনপরীর দেশের মানুষ। ফেরেশতাদের সাথেও নিশ্চয় ভাব আছে ওদের। সেই ফেরেশতাদের কাছেই বুঝি যাদু শিখেছে ওরা।

যাদু না জানলে অমন করে মাতিয়ে যেতে পারত তালতলির মেলাটা? আর মালুকে তো সে যাদু একেবারেই বশ করেছে। সেই নেচে নেচে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাওয়া, সেই স্বর, সেই সুর, সেই মুখ; সব সময় ওরা যেন ভাসছে মালুর চোখের সুমুখে। আর ওদের সুরটা বেজে চলেছে মনের ভেতর। ঘুমের মাঝেও ওদেরই দেখছে মালু। এই তো, এটাকেই তো বলে যাদু করা। ওদের ভেতর যাদু আছে, কথাটা প্রথমে শুনেছিল ভটচায্যদের ছেলে মাখনের কাছে। তারপর নিজের চোখেই তো দেখেছে মালু, একটা নয় দুটো নয়, রীতিমতো গোছা গোছা তাবিজ ওদের বাজুতে বাঁধা। কি যে সাধ জাগে মালুর, এমন একটা তাবিজ কি সংগ্রহ করতে পারে না ও?

গানের মতো করে গাওয়া সেই আরবী ফার্সি বয়াতগুলোকে-রোজ সকালেই আব্বার মুখে শুনে আসছে মালু। তা ছাড়া রাখালের গান, বিয়ের সময় নেকো সুরে গাওয়া মেয়েদের গান, এ সব গান তো হামেশাই শুনছে। কিন্তু তালতলির মেলার বয়াতিদের গানের সাথে তার যেন কোন তুলনাই হয় না। তার জাত, তার শব্দ, তার টান সবই যে আলাদা।

ওদের ঢংটা নকল করে মালু। ওদের গানগুলো গায়, যখন লোক থাকে ধারে পাশে তখন মনে মনে। যখন থাকেনা কেউ তখন দিব্যি গলা ছেড়ে। আর সে কি ফুর্তি, সে কি মজা ওর! সকালের ওই মক্তব, রাবুর ফরমাশ সব ফেলে দিয়ে শুধু ওর গান গাইতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে ওদের মতো নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে অনেক লোকের সুমুখে গাইবে সে। আহা, ওদের মতো করে কবে গাইতে পারবে মালু?

এমন সব মানুষ আছে দুনিয়াতে যারা দিনভর শুধু গান করে? শুধু গান আর গান? সে গান গেয়ে খুশির বান ডেকে দেয় মানুষের মনে?

হাসির সুড়সুড়ি জাগিয়ে পাগল করে তোলে হাজার হাজার মানুষকে? কাঁদায়? হ্যাঁ সে তো নিজেই দেখল, রতন বড়ুয়ার গান শুনে অতগুলো মানুষ ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদল। এই মানুষগুলোর খবর এতদিন জানত না মালু? ভাবতেও মনটা খারাপ হয়ে যায় মালুর।

কত দূরদূরান্ত থেকে এসেছিল ওরা। তারও দূরে, তার চেয়েও অনেক দূরে

নিশ্চয় দুনিয়া রয়েছে, মানুষ রয়েছে। সেই দুনিয়ার মানুষগুলো কেমন কে জানে? সেই অজানা দুনিয়ার অচেনা মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে মালু যেন অনেক দূরে চলে যায়।

হঠাৎ মনে হল মালুর, তালতলি আর তালতলির ওপারে তামাম দুনিয়াটাই গানে ভরা। গান নেই শুধু বাকুলিয়ায়। আব্বার দরুদ, মিঞা মসজিদের আজান? ধ্যৎ, সে কি গান? তালতলির স্কুলের ছেলেরাও গান করে। মেয়েরাও। রাহুদি তো কি একটা যন্ত্র বাজায় প্যাঁপুঁ করে। সেই যন্ত্রটার সাথে গানের যে কি সম্পর্ক এতদিনেও বুঝতে পারলনা মালু। নইলে নিশ্চয়ই তার অন্ধিসন্ধিগুলো জেনে নিত রাহুদির কাছ থেকে।

রাহুদির প্রসঙ্গে বড আপা আর রাবু আপার কথা মনে পড়ল মালুর। গান করে না কেন ওরা? এত লোক গেল মেলায়, তালতলিটাতো ভেঙ্গেই পডল, অথচ আপারা গেল না। একদিন বলেই ফেলেছিল মালু। বলে কি ধমকটাই না খেয়েছিল বড আপার কাছে। কিন্তু রাবু আপা বড ভাল, খুব ভাল। এতগুলো রাত যে তালতলির মেলায় কাটাল মালু, সে তো রাবু আপার বরাতেই।

গুন্ গুন্ করে মালু গণি বয়াতির মুখে শোনা গানের কলি। গলা ছেড়ে গাইবার উপায় নেই। শুনবে সবাই। আর শুনলে রক্ষে আছে?

সেদিন তো অল্পের উপর দিয়েই বেঁচে গেছে মালু। দুপুর বেলায় কোরান পড়তে লাগিয়ে দিয়েছিলেন আব্বাজান। সম্প্রতি শুরু হয়েছে উৎপাতটা। মুন্সিজীর উদ্দেশ্য ছেলেকে কেরাত শেখাবেন। কেরাত শেখাতে শেখাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মুন্সিজী। মালুও গলাটাকে খাট করতে করতে এক সময় চুপ মেরে যায়। ওর মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সুরগুলি গুটি গুটি বেরিয়ে আসে। মালুকে ঘিরে সুরগুলি যেন নাচতে থাকে। মনে মনে গাইতে থাকে মালু। মনে মনে গাওয়া গানটা কখন যে জিবের ডগায় এসে ধ্বনি তুলল টের পায়নি ও, শুধু বুঝলো একটি উর্দু কিতাব ওর কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। ছিটকে পড়ল অদূরে। মুন্সিজীর হাতখানা ওর কান অবধি পৌঁছুবার আগেই তিন লাফে অনেক দূরে চলে এসেছিল মালু।

দেখেছিস বড় আপা, মালু আমাদের কেমন সেয়ানা হয়ে উঠেছে। বাইরে তার কত কাজ আজকাল। মুচকি মুচকি হাসে আর বলে রাবু।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে আসে মালু। গানের সাথে সাথে কোত্থেকে লজ্জা এসেও যেন ভর করেছে ওর উপর। এই প্রথম লজ্জার সাথে পরিচয় হল মালুর।

রাবুর কথাটা অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করে ওর মনের ভেতর। কেমন যেন, অন্য রকম মনে হচ্ছে মালুর। মধুর চেয়েও মিষ্টি রাবু আপার কথা, রাবু আপার শাসনটাও। আদরটাও। আর কি সুন্দর চাঁপা ফুলের গন্ধ-ঘেরা রানুদি। সেই রাবু, সেই রানু, ওদের চেয়েও মিষ্টি মনে হয় গণি বয়াতির গান। স্পষ্ট বুঝতে পারছে মালু, ওদের কথা শুনে, ওদের ফরমাশ খেটে আগের মতো মনটা ওর খুশিতে নেচে ওঠে না।

কি বিপাকেই না পড়ল মালু। মধু গায়েনের 'বঁধুয়ার' সুরটি মনে মনে ভাঁজতে গিয়েও মুখটা ওর লাল হয়ে ওঠে। কান যেন গরম হয়ে আসে। ও ছুটে যায় সৈয়দদের সেই মজা দীঘির পারে। সেখানে চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত। লোকজন থাকেনা ধারে কাছে। গলা ছেড়ে গান ধরে মালু। ঘরে ফিরেও লজ্জাটা ওর থেকে যায়। ওর মনে হয় কেমন যেন অন্যায় করছে ও, ধরা পড়লে কি যে শাস্তি হবে কে জানে! আপাদের কাজের ছুঁতো বের করে মক্তব ফাঁকি দেওয়া, একটা বাহানা খুজে সন্ধ্যায় মাষ্টার সাহেবের পড়াটা ফাঁকি দেওয়া, এ যেন তেমনি কোন অন্যায়, শাস্তি যার ভীষণ। তাই রাবুর সুমুখেও কেমন এক লজ্জায় এতটুকু হয়ে থাকে মালু।

ইস্ সরমে যে মরে যাস। শুধু বলেই কি ক্ষ্যান্ত হয় রাবু? মালুর থুঁতনিটা টিপে দেয়। তারপর যেন আকাশ থেকে পড়েছে তেমনি করে আবার বলে : ও মা। এ যে ডেং ডেংয়িয়ে বেড়ে উঠেছিস রে! আমাকেও তো ধরে ফেললি।

রাবু আপাটা যে কী! দেখছে লজ্জায় মরে যাচ্ছে মালু, তবু ওকে কাছে টেনে ওর মাথার সাথে নিজের মাথাটা মিলিয়ে রীতিমত মাপঝোঁক করতে লেগে যায়। না, এখনো আমি আধা ইঞ্চি লম্বা তোর থেকে। ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচল মালু।

কিন্তু, রাবু আপার হাত থেকে কি বাঁচার উপায় আছে মালুর? সেদিন তো একটা কাণ্ডই করে বসল রাবু। বলা নেই কওয়া নেই দুটো নতুন লুঙ্গি ওর হাতে দিয়ে বলল : সেয়ানা হয়েছিস, হাফপ্যাণ্ট পরতে লজ্জা করে না তোর? নে পর এগুলো। কথা শেষ করেও হাসি থামায় না রাবু। মুখ টিপে টিপে হেসেই চলে। কেন যে এত হাসে রাবু আপা! ছুটে পালাতে চেয়েছিল মালু। রাবুর সুমুখে সে সাহসটাও খুঁজে পায়নি ও। সত্যিই তো, কেমন বেড়ে উঠেছে ও। হাফপ্যাণ্টগুলো কেবলই ছোট হয়ে যাচ্ছে। গানের লজ্জা, বড় হওয়ার লজ্জা, দুয়ে মিলে কেমন যেন লাগে মালুর। ঠিক ঠিক

ধরতে পারে না ও, আঁচও করতে পারে না ব্যাপারটা। শুধু মনে হয় আশে-পাশের মানুষ, এই গোটা বাকুলিয়া আর সৈয়দ বাড়ির আপারা, ওদের কাছ থেকে কেমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে ও।

বড় হওয়াটা যে এত মুশকিলের, এত লজ্জার, মালু সেটা জানত না। অথচ মেজো ভাই যখন আসত শহর থেকে, মেজো ভাইকে দেখে ওর বড় হওয়ার সাধটা কি তীব্র ভাবেই না জাগত। কিন্তু এখন যেন আফসোস হয় ওর, যেন পারলে বড় হওয়াটা এখানেই বন্ধ করে দিত ও।

মায়ের অভিসম্পাতেও এই বড় হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কথায় কথায় শুধু বড় হওয়ার গঞ্জনা। 'দামড়ার' মতো বেড়ে উঠছে মালু। 'দামড়ার' মতোই নাকি গুঁতগুঁতিয়ে চলে ও। দেখতে দেখতে কেমন 'শালিট গাবুর' হয়ে চলেছে অথচ লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। মায়ের কথা সেই লাল কালো পিঁপড়েগুলোর মতোই এসে কামড়ে ধরে মালুকে। তবু যেন সহ্য হয়, রাবু আপার মতো লজ্জা দেয় না মায়ের এই গঞ্জনা।

কিন্তু ভেঙ্গে গেল মালুর লজ্জা, ভেঙ্গে দিল রাস্থ আর মেজো ভাই।

রাস্থদের বাড়ির পেছনের সেই ডোবা মতো পুকুরটা। বড় নির্জন। রাস্থদের ঘর থেকেও বেশ দূরে। একেবারে পশ্চিমের পাড়টায় বসে গুন্ গুন্ করে মালু। একটু বাদেই রাস্থ এসে পড়বে, ও জানে।

ও, তুই বুঝি বয়াতি হয়েছিস? একেবারে কানের কাছেই রাস্থর স্বরটা শুনতে পায় মালু। কেমন একটা নাকসিঁটকানো ভাব রাস্থর। অদম্য একটা ইচ্ছে জাগে মালুর একমণি একটা ঘুসি বসিয়ে দিক ওর থুতনিতে।

নাক সিঁটকালে কি হবে, 'রঙ্গমিবুয়ার' গান শুনে কেঁদে দেয় রাস্থ। কে না শুনেছে 'রঙ্গমিবুয়ার' গান! রাস্থও শুনেছে বই কি। তবু মালুর কণ্ঠে এ গান কলজেটাকে পানি করে চোখের ধারায় বইয়ে দেয়।

'রঙ্গমি বুয়ার' কাছে বাংলার বধূর সকরুণ মিনতি: বিবাগি খসমটাকে যেন পাঠিয়ে দেয় সহিসালামতে। 'রঙ্গমিবুয়ার' তো ঘর আছে, বেটা আছে, বেটি আছে। তার দিলে কি রহম হবে না? পথ চেয়ে চেয়ে যে বধূর চোখে ছানি পড়ে গেল! গাছের ফুল ঝরে গেল, আমের বোল থেকে আম এল। তবু তো খসম তার ফিরে আসে না। 'রঙ্গমিবুয়া' যাদুর বাহুটা এক দিনের জন্যও কি মুক্ত করতে পারে না?……

মালুর কণ্ঠে সুর তো নয়, এ যে সেই প্রতীক্ষারতা বধূর বিলাপ, বুক ভাঙ্গা কান্না। আর সেই সাথে 'রঙ্গম রঙ্গিলাকে' কত ধিক্কার।

রঙ্গম রঙ্গিলারে…
রঙ্গম রঙ্গিলার সনে
রঙ্গে দিছ মন,
সেইমত দেওয়ানা হইয়া
রইল কতজনরে…

চুপচাপ বয়ে যায় সময়। বিরহিনীর দীর্ঘশ্বাসটা বুঝি ওদের ঘিরে থাকে। সেই কল্পিত হতভাগিনীর দুঃখের সায়রে ওরাও ডুবে যায়। মন যখন কচি, বুদ্ধিটা যখন স্বার্থবোধে অপরিণত, হাত জোড়া নরম—বিপন্নের সাহায্য তো দূরের কথা, নিজের জন্যও বুঝি বিশেষ কাজে আসে না সে হাত; অথচ বুকে আকুলতা জাগে অন্যের দুঃখে, ঠিক সেই বয়স ওদের। 'রঙ্গমিবুয়ার' ফাঁদে পড়া খসমের শোকে অসহায় 'আবাগী' বধূর ব্যথাভরা বিলাপে ওদের ছোট্ট দুখানি বুক ভার হয়ে আসে।

হঠাৎ আঁচলটা মাথায় টেনে বাড়ির দিকে ছুট দেয় রাসু। রান্না ঘর থেকে বুঝি ওর মায়ের আওয়াজটা ভেসে আসছে। নির্নিমিষ চেয়ে থাকে মালু ওর ছুটে যাওয়া ছায়াটির দিকে। কেবলি দূরে যাচ্ছে রাসু।

সেদিন যে সারা সকাল বেলাটা ওদের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাল কই রাসুতো একবার এসে দেখল না ওকে! আর আজকাল তো ওকে চুপিসারে ডেকে-ডুকে আনতে হয়।

কিন্তু গানের শরমটা একেবারেই ভেঙে দিয়েছে রাসু। এখন আর ঠাট্টাও করে না ও বরং নিজ থেকেই সেধে শুনতে চায়। আর কেমন মিষ্টি করে বলে: মালু বয়াতি। মালু বায়তি, গান শোনাও না! ওর মুখের বয়াতি ডাকটি ভাল লাগে মালুর।

মেজো ভাই এসেছে, মেজো ভাই এসেছে। যেন মহাধুম পড়ে গেল সৈয়দ বাড়িতে। ইস্, প্রায় বছরটা কাবার করে এল মেজো ভাই! মালু তো রীতিমত ছটফটিয়ে মরছে সেই থেকে, কবে আসবে মেজো ভাই।

কী মজায়ই না কাটল রাত্তিরটা। মালুর জন্য সুন্দর একটা সার্ট এনেছে মেজো ভাই, আর বিস্কুট। সার্টটা তক্ষুণি পরে ফেলল মালু। তারপর রাত ভর চলল কত কিস্সা, কত গল্প। রাবু-আরিফারও তো দেবার খবর কম নেই! সারা বছরের খবর সবই যেন এক নিঃশ্বাসেই শোনাতে হবে মেজো ভাইকে।

কিন্তু এমন মজার রাতটা শেষ হতে না হতেই শুরু হয় গেল মেজো ভাইর উৎপাত। সকালে উঠেই, শুধু মালুর নয়, রাবু-আরিফা, সকলের হাতের লেখা আর পড়া পরীক্ষা করতে লেগে গেল মেজো ভাই। ওইতো একটা দোষ মেজো ভাইর, যে দোষ কোনদিন শোধরাবে বলে মনে হয় না মালুর।

কিন্তু পড়া পরীক্ষার পর যে কথাটা বলল মেজো ভাই সে ঠিক মেজো ভাইর মতোই। বলল—চল তোকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি। কি রকম ধাড়ি হয়ে গেছিস খেয়াল আছে? মেজো ভাইর কথাতেও সেই বড় হওয়ার ধিক্কার। কিন্তু মেজো ভাইর ধিক্কার তো? গায়ে লাগে না মালুর।

নেচে ওঠে মালু। এত আনন্দ কোথায় ধরে রাখবে ও? ওই স্কুলটার সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে কতদিন কত কথা ভেবেছে মালু। ওই স্কুলকে ঘিরে ওর ছোট্ট বুক খানিতে কত ভয় বিস্ময়, কত স্বপ্ন জেগে উঠেছে, আবার মরে গেছে। সে স্কুলটিতেই প্রবেশ করবার অধিকার পাবে ও?

মেজো ভাইর সেই কথা কাজ। সেইদিনই তালতলির শ্যামাচরণ দত্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল মালু।

মানুষ আর আজরাইলে টানাটানি চলল গোটা একটি মাস। শেষ পর্যন্ত আজরাইলকেই পিঠটান দিতে হল। সেরে উঠল লেকু। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সেকান্দর।

উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে মামলার তদ্বিরে মন দিল সেকান্দর। কিন্তু কোর্ট আদালতের কারবার, সে এক অথৈ ব্যাপার। সেকান্দর মাষ্টারের দুটো 'পাশ' সেখানে একেবারেই অকেজো।

মামলা ওরা যথা সময়েই রুজু করল। কিন্তু দু দিন বাদেই টের পেল সেকান্দর, বুদ্ধির খেলায় রমজানের মুনিব ফেলু মিঞার কাছে ও নিতান্তই শিশু। কেননা ওদের মামলাটা রুজু হওয়ার আগেই আর একটা মামলা রুজু হয়ে গেছে ওদের বিরুদ্ধে। বাদী রমজান। আসামী সেকান্দর মাষ্টার এবং লেকু। অভিযোগ অনধিকার প্রবেশ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা। কোন্ কেরামতিতে এটা সম্ভব হল সেকান্দরের লেখাপড়া শেখা মাথায় সেটা কিছুতেই বোধগম্য হল না। নেহাৎ খাতির করেই অথবা অন্য কোন ইঙ্গিতে দারোগা আসছেনা ওকে চালান দিতে। গ্রেফতারি পরোয়ানাটা ঝুলিয়ে

রেখেছে। যে কোন দিন ধরে চালান দেবে কোর্টে। তা ছাড়া আইনেরও যে ফাঁক আছে, এ কথাটা সেকান্দর মাষ্টারের স্কুল কলেজে পড়া বিদ্যায় জানা ছিল না মোটেই। মেলা ফাঁক আইনের। ফাঁক সাক্ষী সাবুদের। যা ঘটে তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। যা ঘটে না তাই প্রমাণিত হয়ে পড়ে পেনাল কোডের ধুরন্ধরদের কেরামতিতে। থানা আর মিঞা বাড়ির যতটা নৈকট্য সেকান্দর আর থানার মাঝে বুঝি ঠিক ততটাই দূরত্ব। সে দূরত্বে সেতুবন্ধের সামর্থ কোথায় সেকান্দরের? অল্প দিনের মাঝেই এই রূঢ় সত্যটা আবিষ্কার করল সেকান্দর মাষ্টার।

সৈয়দদের সমস্ত সম্পত্তির দেখভালের ভার নিচ্ছে সেকান্দর। রমজানের মুখে খবরটা শুনে প্রথমে স্তম্ভিত পরে বিষম ক্রোধে ফেটে পড়েছে ফেলু মিঞা। ভগ্নিপতিরা গ্রামের পাট গুটিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে এ তথ্যটার উপর ভিত্তি করে অনেক হিসেব করে রেখেছে ফেলু মিঞা। সে হিসেব বানচাল করে দেবে দু কলম পড়ালেখা জাননেওয়ালা গোলামের বাচ্চাটা? ও, তাই শালার পিঠে এত তেল হয়েছে, দল পাকিয়েছে লেকুকে নিয়ে। তা আর বলতে স্যার: আগুনে বাতাস দেয় রমজান।

শম্বুক গতিতে চলে মামলা। কিছুদূর গড়াতেই দেখা গেল যারা ছিল মুখ্য অর্থাৎ লেকু রমজান, ওরা এখন গৌন। অনেক পেছনে সরে গেছে ওরা। আর যারা ছিল পেছনে তারাই এসে গেল সুমুখে। লড়াইটা শুরু হল সামনাসামনি, একদিকে তালতলি স্কুলের তিরিশ টাকা মাইনের জুনিয়ার মাষ্টার সেকান্দর অন্য দিকে মিঞার বেটা ফেলু মিঞা।

চোখে অন্ধকার দেখেও হাল ছাড়লনা সেকান্দর। আইন তার পক্ষে, ঘটনা দিবালোকে প্রকাশ্য জনসমক্ষে। কাজেই রমজানকে নিদেন পক্ষে দশ বছর ঠুকে দেয়া যাবে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সেকান্দর।

কিন্তু টাকা? টাকার দিকটা কেমন করে সামলাবে সেকান্দর? লেকুকে সারিয়ে তুলতে, মামলার প্রাথমিক দৌড়াদৌড়ির কাজে ওর স্বল্প সঞ্চয়টা যে ফুরিয়ে গেল। এখন? অথচ খরচ তো সবে শুরু। ওদিকে লেকু বেঁচে উঠলেও হাঁটা চলার মতো সুস্থ হতে আরো সময় নেবে। সে সময়টা ওষুধ খেতে হবে। ভাল পথ্য নিতে হবে ওকে। সে খরচটাই বা আসবে কোত্থেকে! লেকু তো জমিজমা রেহান দিয়ে ফতুর হয়ে বসে রয়েছে। উপায়?

ফেলু মিঞার হাত ধরে কেঁদে দেয় সেকান্দরের বুড়ি মা: আপনি মিঞার বেটা মিঞা। গ্রামের মাথা। ছেলেকে ডেকে শাসিয়ে দিন, শাসন করুন।

ঘুষা দিতে হয় আপনিই দেবেন, সে হক কি নেই আপনার ? কিন্তু দোহাই আপনার পুলিশে হাজতে বেইজ্জত করবেন না ছেলেটাকে।

ছেলের বিপদে ছুটে এসেছে মা।

হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় ফেলু মিঞা। আতরমাখা রুমালটা একবার নাকের কাছে ধরে আবার পাট করে রেখে দেয় বুক পকেটে। কাছারির দিকে পা বাড়িয়ে বলে, আচ্ছা দেখি।

শুধু ওইটুকু কথায় বুঝি নিশ্চিন্ত হতে পারে না উদ্বিগ্না মা। ফেলু মিঞার পিছু পিছু চলে আসে কাছারি তক। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়ান গলায় কত কথা বলে যায়ঃ 'পোলার' কথা শুনবেন না। ওর তো মাথাই খারাপ হয়েছে, নইলে আপনার মুখে মুখে কথা বলে ? আপনি ওকে মাফ করে দিন।

কাছারি ঘরটায় গিস গিস করছে লোক। খোদ বড়বাবু এসেছে তদন্তে। প্রাথমিক রিপোর্ট তো কবেই শেষ। সাক্ষী সাবুদও হয়েছে। তবু বড়বাবু আর একবার এসেছেন দেখতে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে কসিরের বাড়ি বলে কথিত ঘরগুলি মিঞাদের খাস দখলি যায়গায় মিঞাদেরই ঘর। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে অমুক তারিখে যে যায়গায় বলপূর্বক প্রবেশ করেছে সেকান্দর মাষ্টার এবং লেকু। লুঠ তরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার উদ্দেশ্যেই যে তাদের এই অনধিকার প্রবেশ এতেও কোন সন্দেহ নেই। কেননা প্রত্যেকটি অভিযোগের পক্ষেই প্রমাণ অকাট্য।

লেখাজোকার পর্ব শেষ করে কিঞ্চিৎ নাশতায় মন দিয়েছে বড়বাবু। হাবিলদার গেছে সেকান্দর মাষ্টার এবং লেকুকে ধরে আনতে। ওদের আজই চালান দেওয়া হবে মহকুমা শহরে। বাকুলিয়ার পক্ষে মস্ত বড় ঘটনা। তাই গোটা গ্রামটাই ভেঙ্গে পড়েছে মিঞা বাড়ির কাছারি ঘরে আর দহলিজে। ঘটনার অনিবার্য পরিণতিটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে লোকগুলো।

পাকা আশ্বাস না নিয়ে কিছুতেই বুঝি নড়বে না সেকান্দরের মা। ফেলু মিঞা শুনছে, কি শুনছে না সে খেয়াল নেই তার, কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই চলেছে নিজের কথাঃ আপনি খাওয়ালে পর গরীব বাঁচে, না খাওয়ালে গরীব মরে। আপনি আছেন বলেই তো গ্রামটা টিকে আছে। আপনি থাকতে আমার ছেলে ফাটক খাটবে ?

কথাগুলো মোটেই আস্তে বলছে না সেকান্দরের মা। কাছারি ঘরের

অনেক লোকই শুনতে পাচ্ছে। ফেলু মিঞা তো একেবারে ধারেই বসে আছে।

আচ্ছা আমি কথা দিলাম। আপনি খোদাপরাস্ত্ মুরুব্বীজন, আপনার কথা কেমন করে ঠেলি। তা ছাড়া প্রজার কল্যাণ অকল্যাণ চিরকালই দেখে এসেছে মিঞারা! আপনি পাঠিয়ে দিন সেকান্দরকে। গোটা কাছারি ঘরটাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল ফেলু মিঞা।

আমাকে অমন ছোট করলে মা? কথাটা গলা পর্যন্ত এনেও মুখ দিয়ে বের করতে পারল না সেকান্দর। এমন একটা রূঢ় কথা কেমন করে শোনাবে মাকে?

মা ততক্ষণে ওকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। দু দুটি ছেলেকে মাত্র দুটো দিনের জন্য দুনিয়াটা দেখিয়েই বেহেশতে টেনে নিয়ে নিলেন খোদা। তৃতীয় জন এসেছিল সেকান্দর। খোদার দরবারে কত মাথা কুটে, প্রার্থনায় প্রার্থনায় চোখের জলে কত বুক ভাসিয়ে তবে তো সেকান্দরকে ধরে রাখতে পেরেছে মা, বড করে তুলেছে। সেই সেকান্দর শুনবে না মায়ের কথা? তা ছাড়া সে হল সংসারের খুটি। অমন গোয়ার্তুমী দেখিয়ে সে যদি হাজতেই যায় তবে সংসারের কি হবে, আর ওকে ছেড়ে বুড়ি মা-টাই বা বাঁচবে কেমন করে?

ফেলিস না, ফেলিস না মায়ের কথা। ফেললে আমার মাথা খাস্ তুই। যা, তুই শুধু কাছারিতে যাবি। ফেলু মিঞার সুমুখে একবার দাঁড়াবি। কিচ্ছু করতে হবে না, কিচ্ছু বলতে বলতে হবে না তোকে। সেকান্দরকে অরাজী দেখে মায়ের কান্নাটা দ্বিগুণ হয়।

আহ্ মা, থাম তো। ঘর ছেডে বেরিয়ে আসে সেকান্দর। কিন্তু করবে কি ও? না হয় আমল দিলনা মাকে, সদরে চালান গেল, তারপর যা থাকে কপালে। কিন্তু লেকু? মাত্র দুদিন হল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে লেকু, ভাল করে বসতেও পারে না। সে কী ভাবে সইবে হাজতের ধকল?

আরো কত কি ভাববার আছে। হাজতে গিয়ে পডে থাকবে ওরা। কে করবে মামলার তদ্বির, কে করবে জামিনের ব্যবস্থা! না হয় সুলতানই কয়েকদিন লেখাপডা ক্ষ্যান্ত দিয়ে পড়ে থাকল শহরে। কিন্তু টাকা? কোর্টের অবস্থাটা নিজের চোখেই তো দেখে এসেছে সেকান্দর। পায়ে পায়ে ট্যাকের কাড়ি ফেলে চলতে হয় সেখানে, নইলে এক পা এগুবার

জো নেই। সত্যি সত্যি যখন শুরু হয়ে যাবে দু দিকের দুটো মামলা তখন খরচের কি আর কোন মা বাপ থাকবে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মিঞা বাড়ির দিকেই এগোয় সেকান্দর।

হ্যাঁ, স্কুল ফাণ্ডে কিছু টাকা জমিয়েছে ও। সে আর কত! পুরোদমে যখন চলবে মামলা উকিল মোক্তার পেশকারের হাজারো বায়নাক্কা মিটোতে গিয়ে সে তো দু দিনেই উড়ে যাবে। তখন? তা ছাড়া ও টাকায় হাত দেবার কোন অধিকার নেই সেকান্দরের। বিরাট একটা স্বপ্নকে সুমুখে রেখে জমানো এ টাকা। আর কতকষ্টে, এদিক টানে তো ওদিক ছেঁড়ে এমনি করে সংসার চালিয়ে, মাসে মাসে বছরে বছরে তিল তিল বঞ্চনায় গড়ে উঠেছে ওই সঞ্চয়।

হঠাৎ কি এক ধাক্কা খেয়ে যেন জেগে উঠল সেকান্দর। সমস্ত চিন্তা কখন সরে গিয়ে বুকের পর্দায় ভেসে উঠেছে বিলাপকাতর মায়ের মুখখানি। চারিদিকের কত টান এ সংসারে! কথাটা যে আজই প্রথম মনে পড়ল সেকান্দরের।

ওকি? লেকুকে অমনভাবে বেঁধে নিয়ে আসছে? হাঁটতে পারছেনা। পা দুটো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছে ও। না, হাবিলদারটার বিবেচনা আছে। দড়িটা লেকুর কোমরে বাঁধা ঠিকই, তবে হাতটা হাবিলদারের কাঁধে রেখে কিছুটা কষ্ট লাঘব হয়েছে ওর। ওর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সেকান্দর। অমন থলথলে স্বাস্থ্য জোয়ান মরদটার একী চেহারা। এক মাসেই যেন দশ বছর বুড়িয়ে গেছে ও।

চেনা হাবিলদার। সেকান্দরকে দেখে হেসে বলল, চলেন, আপনার ও এত্তেলা আছে।

লেকুর সুবিধের জন্য আস্তে আস্তে হাঁটে ওরা।

ওদিকে এক কাছারি লোক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

কি করতে বলেন? পেস্তাবাদামের কুচি ছড়ান জাফরানী শরবতের এক ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করে বড় দারোগা।

বুড়িটা অমন করে কেঁদে কেটে গেল। রেখেই যান আজ। পরে অবস্থা বুঝে খবর দেব আপনাকে, এক কাছারি মানুষকে বুঝি অবাক করে দেয় ফেলু মিঞা।

দুটোকেই?

হ্যাঁ, দুজনকেই।

সকলের দিকে একবার তাকাল ফেলু মিঞা। তারপর দারগাকে উদ্দেশ্য করে বলল আবার, এই জন্যই তো প্রজা শাসন আমাকে দিয়ে হলনা দারোগা বাবু। কেঁদে পড়ল পায়ের উপর অমনি সব রাগ আমার পানি। তা ছাড়া ভাবি বেয়াদবি বে-তমিজি যাই করুক মাফ চাইলে মাফ যে আমাকে করতেই হবে। বাপদাদা চৌদ্দ গুষ্টি আমাদেরই খেয়ে মানুষ, আমি যদি ফেরাই তবে ওরা যাবে কোথায়? একটু হাসল ফেলু মিঞা। চোখ জোড়া তার আর একবার কাছারি ঘরটা প্রদক্ষিণ করে এল।

সে আর বলতে?

মারহাবা মারহাবা।

এই তো মিঞার 'পুত' মিঞার মতো কথা!

হাফেজ সাহেব, খতিব সাহেব, কারি সাহেব, কত মানুষের কত তারিফ আর বাহবার গুঞ্জন। ঘর ভর্তি মানুষগুলোও বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, মাষ্টারকে তাহলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না।

শুধু কিছু বলে না রমজান। বরাবর দেখে আসছে, আজও দেখল মুনিবের বিচিত্র স্বভাব। নীল রক্তের রাগটাই বুঝি ও রকম। যখন চড়ে রাগটা ফেলু মিঞা তখর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য, আত্মবিস্মৃত, যাই তখন গেলানো যাবে তাই গিলবে। কিন্তু একটু তোষামোদ পেয়ে সে রাগটা যখন পড়ে যাবে তখন বুঝি দিল্লীর বাদশা ফেলু মিঞা, দিলটা তার দরিয়ার মতো দরাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাছে তুলে মইটা কি কেড়েই নেবে ফেলু মিঞা? কী এক আতঙ্কত্রাসে ঘরভর্তি লোকের মাঝেও যেন গায়ে তার কাঁটা দিয়ে যায়।

মিথ্যা মামলা লাগিয়ে আবার মেহেরবাণী দেখান হচ্ছে? ঠোঁটের গোড়ায় এসেও কেমন করে যেন রুখে গেল কথাটা। লেকুর উপর চোখ পড়তেই নিজেকে সামলে নিল সেকান্দর। মাতবর মোসাহেব পরিবেষ্টিত ফেলু মিঞার দিকে একবার নজরটা বুলিয়ে দহলিজে নেমে এল ও।

ক্রিং ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে ওর পাশ ঘেঁসেই চলে গেল বড় দারোগা। ইচ্ছে হল সেকান্দরের দারোগাকে থামিয়ে শুধু একটি কথা শুধায়, আইনটা কি তার পকেটে? কিন্তু সে প্রশ্নটা উচ্চারণ করার আগেই কাঁধের উপর কার যেন স্পর্শ অনুভব করল। পেছন ফিরে দেখল সৈয়দ বাড়ির মেজো ছেলে জাহেদ।

কি হে, দারোগার পিঠে কি বঙ্গদেশের মানচিত্র দেখছ নাকি? হাসছে জাহেদ।

ও, জাহেদ? তুমি এসেছ, খবর পেয়েছি। কিন্তু, বড় ঝামেলায় পড়েছি ভাই, যেতে পারিনি। কিছু মনে করনি তো?

আহা-হা, ভদ্দরলোকি বিনয়ে যে একেবারে ভেঙ্গে পড়ছ। জীবন থাকলেই ঝামেলা। আমি তো বেশ বড়রকমের একটা ঝামেলা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য! চল, বসা যাক কোথাও।

মিঞা পুকুরের ঘাটলার পাশে লিচু গাছটার তলায় গিয়ে বসল ওরা। জাহেদের প্রত্যাশী চোখজোড়া স্থির হয়ে থাকে সেকান্দরের মুখের উপর, বুঝি ওর কাছ থেকে শুনতে চায় গ্রামের হালফিল অবস্থাটা।

সেকান্দরের মনে হল ওর মাথাটায় যেন ঝিঁঝিঁ লেগেছে। সেই সকাল থেকে মা-টি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, ফেলু মিঞার হাত ধরে ছেলের মুক্তি কিনে এনেছে। ইস্ কেমন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাঁটল লেকুটা! ওকি আর কোনদিন গতর খাটিয়ে রোজগার করতে পারবে? এসব ভাবনা কেমন দুমড়ে দিয়ে যায় সেকান্দরের মনটা। কিন্তু, এ সবের চেয়েও বুঝি অসহ্য ফেলু মিঞার উদারতার চাবুক। না, এসময় জাহেদের সাথে দেখাটা না হলেই ভাল হত। নিজেকে নিয়ে একটু নিরিবিলি বসতে পারত ও।

সেকান্দরকে নীরব দেখে জাহেদই মুখ খুলল, বলল, আমি সব শুনেছি। শুনেছ? ও, মালু-রাবু দুই গেজেট তো তোমার আছেই।

ফিক করে হেসে দেয় মালু। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি সেকান্দর, পেছনে নখ কেটে কেটে লিচুগাছটার গুঁড়িতে নাম লিখছিল মালু।

ও, শ্রীমান দেখি পিছে পিছেই। মালুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সেকান্দর। হ্যাঁ, সেই আসার পর থেকেই। জাহেদের মুখেও একটা প্রশ্রয়ের হাসি। আবহাওয়াটা বুঝি আলাপের উপযোগী হয়ে আসছে। সেকান্দর তাকায় জাহেদের দিকে, তার কাছ থেকেই তো শুনবে ও।

তিন কুলে যার নেই কেউ সেই মেয়েটাকে ধরে অমন একটা বর্বর শাস্তি দিলে? বলিহারি তোমাদের বাহাদুরি! অথচ রমজানের গায়ে একটা আঁচড়ও বসাতে পারলেনা। হঠাৎ বলল জাহেদ।

মিঞা-বাড়ির নায়েব-সরকার, তার আবার অপরাধ কি? ব্যঙ্গের স্বরে বলল সেকান্দর। থামল, বুঝি গুছিয়ে নিল পরের কথাটা। বলল আবার, অবিচার অনাচার যে কি ভাবে বেড়ে চলেছে গ্রামে, শুনলে আঁতকে উঠবে। লেখা পড়া শিখে তোমরা হলে দেশান্তরী, নইলে এমন হয় গাঁয়ের অবস্থা? অভিযোগের স্বর সেকান্দরের।

একটু ভুল বললে মাষ্টার। লেখাপড়া শিখে নয়, লেখাপড়া শেখবার জন্য গ্রাম ছেড়েছি। সে উদ্দেশ্যে যদি গোটা বাকুলিয়াটা বিরানা হয়ে যায়, আমি তাকে স্বাগতম জানাব।

বল কি? তা হলে ওই যে আমরা বলি গ্রাম বাংলা, জাতির প্রাণ কেন্দ্র, সে সব কথার কোন দাম নেই তোমার কাছে?

এক পাইওনা। গ্রামের মানুষগুলো যাতে শহরে বাবুসায়েবদের বিলাস দুর্গে হানা না দেয় তাই গাঁয়ে ফিরে যাও বলে তারস্বরে চীৎকার জুড়েছে তারা।

গ্রাম কি তাহলে বাঁচবেনা? গ্রামের কোন ভবিষ্যৎ নেই? কেমন কাতর শোনায় সেকান্দরের গলাটা।

না। যেভাবে আছে ওভাবে বাঁচবেনা। তার জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ আছে বৈকি। তবে সে হবে অন্য গ্রাম।

কি রকম?

ওই যে দেখছ দখিনের ক্ষেত? অজস্র গুলগুলির খোপের মতো, হাজার আলের কাটাকুটি, ও সব থাকবেনা। গোটা দখিন ক্ষেতে থাকবে বড় জোর চারপাঁচটা সীমানা। চাষ চলবে কলের লাঙ্গলে। ফসল উঠবে যারা চাষ করবে তাদেরই ঘরে। জমিদার-তালুকদার-মহাজনের বখরাদারি চলবেনা। ডায়নামো বসবে। বিজলী বাতি জ্বলবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। ক্লাব থাকবে, রেডিও থাকবে গাঁয়ে গাঁয়ে। স্কুল থাকবে প্রতি গ্রামে, কৃষকের মেয়েরা লেখা পড়া শিখবে বিনে মাইনেয়। বলতে বলতে অনাগত সেই স্বপ্নটা যেন ছায়া ফেলে যায় জাহেদের চোখের কোলে। তা কি সম্ভব? জাহেদের কল্পিত ছবিটি এত সুন্দর আর আকর্ষণীয় বলেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না সেকান্দরের।

সম্ভব নয় মানে? সেকান্দরের অবিশ্বাসটা যেন মহাপাপ, চোখের দৃষ্টিটাকে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ করে তাই বুঝিয়ে দিল জাহেদ।

শোননি কিছু? পত্রিকা পড়না? দেশ জুড়ে যে বেজে উঠেছে স্বাধীনতার ডংকা। দিকে দিকে আজাদীর বুলন্দ্ আওয়াজ। দেশ আর কতদিন সহ্য করবে গোলামীর জিঞ্জির? ইংরেজের যাবার দিন এসে গেছে হে, এসে গেছে। স্বাধীনতা না দিয়ে আর উপায় নেই ইংরেজের। আর স্বাধীনতার মানে—

মানে ওই নতুন গ্রাম?

আলবত।

কি বিশ্বাস, কি দৃঢ়তা জাহেদের কথায়। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে সেকান্দর। জাহেদের থেকে বয়সে ও বছর পাঁচেকের বড়। তবু সেই স্কুলে পড়বার

সময় থেকেই দু জনের মাঝে গড়ে উঠেছে একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক। বয়স বাড়বার সাথে সাথে সেটা বন্ধুত্বে উন্নত হয়েছে। বাকুলিয়ার গেরস্ত ঘরের একমাত্র শিক্ষিত ছেলে বলেই হয়ত সে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল আর তারই সূত্র ধরে সৈয়দবাড়ির অন্দর মহলেও যাতায়াতের সুযোগ পেয়েছিল সেকান্দর। কিন্তু আজ মনে হল ওর, বন্ধুত্বের আর বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে জাহেদ। আজ শুধু বন্ধুত্বের দাবী নয় ওর, দাবী শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের।

কিন্তু, স্বাধীনতা মানে স্বরাজ নয়—

স্বরাজ নয়? কেন? শুধাল সেকান্দর।

স্বরাজ মানে তো 'হিন্দুরাজ। ওতে মুসলমানদের কি হবে? প্রায় দুশো বছর তো ইংরেজের গুঁতো খেয়ে খেয়ে কাটল। স্বরাজ এলে পর শুরু হবে বেনে-মুৎসুদ্দির গুঁতো। এখনি কি তার নমুনা দেখতে পাচ্ছনা?

অবাক না হয়ে পারেনা সেকান্দর, ফেলু মিঞার কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনবে জাহেদের মুখে, কখনো ভাবতে পারেনি ও। কি যেন বলতে চাইল ও কিন্তু, ততক্ষণ রীতিমত বক্তৃতা শুরু করেছে জাহেদ।

জানো মাষ্টার? আলিগড়ে আমি একটি বিরাট সত্যকে উপলব্ধি করেছি। বই বন্ধকরে জাগরণের বাণী নিয়ে ঘুরলাম গোটা উত্তর ভারত।

দেখলাম সারা দেশ জাগছে, হয়ত এগুচ্ছেও। কিন্তু মুসলিম জনতা?

কেবলি যেন পিছিয়ে পড়ছে, কেবলি যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। শতাব্দীর উপর লড়ে লড়ে অত্যাচার সয়ে সয়ে ওরা যেন রণক্লান্ত, অশিক্ষা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ক্ষণ-স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠেছিল যে জেহাদ সেও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। কেন, কেন এই অবস্থাটা জান?

কেন? ওর প্রশ্নটা ফিরে ওকেই শুধাল সেকান্দর।

কারণ আগত সেই স্বাধীন দেশে, স্বাধীন মর্যাদায় ওরা যে বাঁচতে পারবে সে নিশ্চয়তাটা খুঁজে পাচ্ছেনা মনের ভেতর। গলাটা সাফ করে আবার শুরু করল জাহেদ: বাংলা দেশের ছবি তো আরো মর্মান্তিক। কয়েকটা জিলা ঘুরে এলাম। দেখলাম, সেই অন্নহীন বস্ত্রহীন শিক্ষাহীন মুসলিম প্রজাকুলের ব্যর্থ হাহাকার। কেউ কাঁদেনা ওদের দুঃখে, কেউ শোনেনা ওদের ফরিয়াদ। বুঝি ওই অভাগাজনদেরই দুঃখে ধরে আসে জাহেদের গলাটা। মিঞা পুকুরের টলটলে পানিটার দিকে তাকিয়ে কেমন উন্মনা হয়ে যায় ও। কিন্তু, মুহূর্তের মাঝেই কি এক আলো ঝিলিক খেলে

যায় ওর চোখে, উদ্ভাসিত মুখে বলে চলেও : কিন্তু শহরে? লক্ষ্ণৌ আলিগড়, কানপুর, দিল্লী, কোলকাতায়? সে এক আশ্চর্য উন্মাদনা। জেহাদী প্রাণ যেন টগবগিয়ে উঠছে সেখানে! হাজার হাজার মুসলিম তরুণ আজ এক নতুন স্বপ্নে মেতে উঠেছে, নয়া জাগরণের বাণী ওদের মুখে মুখে। আজ বাকুলিয়ার সে বাণী আর সে স্বপ্নের ডাক নিয়েই তো এসেছি আমি। সেকান্দর আমি তোমার মদদ চাই। সে বাণী তোমাকেও যে শুনতে হবে, শোনাতে হবে লক্ষ হাজার মানুষকে। তুমি রাজী?

কি যেন এক শক্তি আছে জাহেদের কথায়। আর সে শক্তিটা ওর তরুণ বয়সের আবেগের সাথে মিশে ঝংকার তোলে বাতাসে। উত্তরের প্রত্যাশায় ও চেয়ে থাকে সেকান্দারের মুখের দিকে।

ইংরেজ হিন্দুমুসলমান জন্মভূমি স্বাধীনতা, এ সব নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি বাকুলিয়ার সেকান্দর মাষ্টার। তালতলির জোয়ান মাষ্টাররা এ সব নিয়ে কত তর্কের তুফান তুলেছে, স্কুলের ময়দানে মিটিংও করেছে ওরা। কেউ কেউ জেল খেটে এসেছে, এখনো খাটছে। পত্রিকাগুলোও নিত্যদিন ছাপার অক্ষরে আগুন ঝরিয়ে চলেছে। দূর থেকে এসব দেখেছে সেকান্দর। শুনেছে আরো অনেক বেশি। কিন্তু নিজে কখনো উৎসাহ বোধ করেনি ও, হাঙ্গামা হুজ্জত বলে এড়িয়েই চলেছে। কেউ ওকে টানতেও আসেনি। তাই ও জগৎটা ওর কাছে এক রকম অজানা, যেমন অজানা ছিল নিজের গ্রাম এই বাকুলিয়াটা। ও তো সবে চিনতে শুরু করেছে বাকুলিয়াকে। তবু সেকান্দরের কথাটা পুরোপুরি জানবার ইচ্ছে হল ওর, শুধাল, তোমার স্বপ্নই বা কি, বাণীই বা কি, আর একটু খোলাসা করে বলনা কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল জাহেদের : গোটা ভারতের মুসলমানকে আজ এক হতে হবে, এক জমাতে এক আওয়াজে এক নিশানে। গোটা বাংলায়, সারা ভারতে শুরু হয়ে গেছে সে কাজ। এ অঞ্চলে সে কাজের দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।

আমাকে? যেন আঁতকে উঠল সেকান্দর। না না ও সব রাজনীতি ফাজনীতির মধ্যে আমায় টেনোনা জাহেদ, ওসব আমি বুঝিনা।

বোঝনা? যেন ব্যঙ্গের সুরেই বলল জাহেদ আর দৃষ্টিটাকে শলার মত তীক্ষ্ণ করে গেঁথে রাখল ওর মুখের উপর।

নাসুর কথা মনে আছে তোমার? সেকান্দরের মুখের উপর দৃষ্টিটাকে তেমনি গেঁথে রেখেই শুধাল জাহেদ।

হাঁ, মনে থাকবেনা কেন ?

নান্নুর সাথে যে তোমার আব্বাও কারাবরণ করেছিলেন সেই একুশ সালে, জান সেটা ?

বারে, জানবনা কেন ? আবছা আবছা মনেও রয়েছে আমার।

তবে ? তবে কোন লজ্জায় তুমি আজ বল রাজনীতি বোঝনা ?

তর্কে বুঝি কোনঠাসা হয় সেকান্দর। কিন্তু তর্কে হারা আর সত্যি সত্যি বুঝে নেয়া, দুটোতে অনেক তফাত। দেশ জাতি জন্মভূমি জনসাধারণ, একান্তভাবেই কতগুলো বাংলাশব্দ সেকান্দরের কাছে। তবু ওর পরিবেশ ওর দেখা এবং শোনা, সে সব কি কখনও কোন ছাপ ফেলতে পারিনি ওর মনে ? ছাপ যে ফেলেছে এবং মনে মনে ওর নিজস্ব একটা মত ও যে গড়ে উঠেছে সেটাই প্রকাশ পেল ওর দ্বিধা জড়ান কথায়! হিন্দুমুসলমান আলাদা আলাদা জামাত গড়বে, আলাদা রাজনীতি করবে, এটা কেমন ধারা কথা বলছ তুমি ?

জাহেদের চোখ জোড়া নেচে যায়, যেন বলে, তবে যে বলছ রাজনীতি বোঝনা ? বলল জাহেদ, সে কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছি তোমায়। দেশ জাগছে, স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে এদেশের মানুষ। কিন্তু সে স্বাধীনতার মন্ত্রে স্বাধিকার চেতনায় মুসলিম সমাজ এখুনি যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তারা যে শুধু পড়ে পড়ে মারই খাবে, অশিক্ষার দারিদ্র্যের অভিশাপ কোন দিনই যে ঘুচবেনা তাদের, এ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে তোমার ?

ঠিক ঠিক। ভাল করে সমঝিয়ে দাও তো মাষ্টারকে! হিন্দু স্কুলে চাকরি করে আর দিনরাত হিন্দুদের সঙ্গে উঠে বসে ওর মগজটাও হিন্দু ধাঁচের হয়ে গেছে।

ওরা চমকে ওঠে ফেলু মিঞার কণ্ঠস্বরে।

আসরের নামায সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ফেলু মিঞা। পরনে লাল সিল্কের উপর হলুদ ডোরা কাটা বর্মি লুঙ্গি। গায়ে সাদা মলমলের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর বুক পকেটে সেই আতর মাখা রুমাল। হাতে ছড়ি। নামায সেরে মাথার কিস্তি টুপিটা পাশের পকেটে রেখে দিয়েছে ফেলু মিঞা। একটু পরে ফেলু মিঞা চলে যাবে পুকুরের পূর্ব পারে। সেখানে মিঞাদের পারিবারিক গোরস্থান। পূর্বপুরুষদের কবরগুলো জিয়ারত করে ফেলু মিঞা নেবে পড়বে দক্ষিন ক্ষেতের রাস্তায়। ছড়িটা ঘুরোতে ঘুরোতে

সোজা চলে যাবে বড় খাল অবধি। তারপর ফিরে আসবে। বিকেল বেলায় এই কবর জিয়ারত আর ভ্রমণের সৌখিনতাটা ফেলু মিঞার নিয়মিত অভ্যাসের অঙ্গ।

হঠাৎ কেন যে চুপ মেয়ে গেল ওরা, বুঝতে না পেরে কাজের কথায় এল ফেলু মিঞা: শোন জাহেদ। পরশুদিন মিটিং দিয়েছি। তুমি তৈরী থেকো কিন্তু।

পরশু? এত জলদির কি ছিল? আমি তো থাকব অনেকদিন।

না না এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। ইলেকশানের দিন আসছে ঘনিয়ে। ওদিকে কংগ্রেসীরা তো রীতিমত বড় গোছের একটা মোল্লার দলকে কিনে নিয়েছে।

কিনে নিয়েছে? সমস্বরেই যেন চেঁচিয়ে উঠলে ওরা।

ওই কেনারই সামিল। বাইরে কি আর সে কথা বলে? তারপর কোত্থেকে পাঠিয়েছে এক মাওলানা, সে তো চষে বেড়াচ্ছে গোটা অঞ্চল। যা তা বলছে লীগের বিরুদ্ধে।

কিন্তু মামা মিটিংয়ের আগে আমি তো কিছু আলাপ সালাপ করে নিতে চেয়েছিলাম, মাঝে সময় যে রইল মোটে একটা দিন। ইতস্তত জাহেদের কথায়।

চকচকিয়ে ওঠে ফেলু মিঞার চোখ জোড়া। এক কদম এগিয়ে এসে জাহেদের কাছে ঘেঁসে দাড়ায়, কি এক আগ্রহে ঝুঁকিয়ে আনে মুখটা। বলে: হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ভাবছিলাম ঘরোয়া পরামর্শটা হয়ে যাওয়া দরকার।

এইটুকু বলে কেমন লাজুক গোছের একটা হাসি ছাড়ল ফেলু মিঞা। ঢোক গিলল। বলল আবার, অবশ্য আমি যা ভেবেছি সেটা তোমাকে এখুনি জানিয়ে দিতে পারি। আমি ভেবেছি, সেক্রেটারী হিসেবে মাষ্টারই হবে উত্তম ব্যক্তি, তুমি শুধু ওর মাথাটা টাইট করে দেবে। আর প্রেসিডেণ্ট? সে দায়িত্বটা না হয় আমিই নিলাম।

প্রেসিডেণ্ট আপনি? ও, কাজের নেই দেখা, আর এখুনি গদি ভাগাভাগি? মামা, আপনার মতলবটা তো বড় খারাপ! বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ জাহেদের কণ্ঠ।

ভাগনের অতর্কিত স্পষ্টবাদিতায় অপ্রস্তুত হয় ফেলু মিঞা। ঠোঁটের কোণে একটা হাসি টেনে বলে: আরে যাহ্, কী ফজুল বকছ তুমি।

শুনুন ফেলু মামা। দুশো বছরের ইংরেজ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য লড়ছি আমরা। সে মুক্তির রূপ অতি স্পষ্ট: দেশের মাটি আমার, দেশের

সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোটাবে হাসির ছটা। আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখ্‌তে জেঁতে বসবেন সেটি হচ্ছেনা কিন্তু। তীরের মত কথাগুলো ছুঁড়ে মারল জাহেদ।

দেখেছ মাষ্টার? আলিগড় থেকে কেমন চমৎকার বক্তৃতা শিখে এসেছে আমার ভাগ্নেটি! সাবাস, পরশুর মিটিংয়ের এমন তেজী জবান আর গরম সামুচার মতো বক্তৃতা চাই কিন্তু।

ফেলু মিঞা হেসেই উড়িয়ে দিল জাহেদের কথার তীর। কিন্তু এই কৃত্রিম হাসিটা বুঝি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়না, তাই ছড়িটাকে এক চককর ঘুরিয়ে কবরস্থানের দিকে পা তুলল ফেলু মিঞা। যেতে যেতে বলল, তোমরা সবাই মিলে যা ঠিক করবে তাতেই আমার সায়।

দেখেছ? কি রকম নিশ্চিত বিশ্বাস আমার মামুটির? যেন সে ছাড়া লীগের প্রেসিডেণ্ট হবার মত আর কেউ নেই এ তল্লাটে।

ক্ষতি কি? হিন্দুদের সাথে লড়তে হলে তো ও রকম লোকই দরকার। ফস করে বলল সেকান্দর।

আহ্‌ চুপ কর তো। ফেলু মামা স্বপ্ন দেখছে কবে আবার মোগল বাদশাহীটা ফিরে আসবে হিন্দুস্তানে! তার হাতে পড়ে লীগের দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো? হঠাৎ জাহেদ হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের হাত জোড়া ধরে নেয়, বলে, না না সেকান্দর। রাজী হয়ে যাও তুমি। সব দায়িত্ব তুলে নাও তোমার কাঁধে। তুমি, একমাত্র তুমিই পারবে ধনী নির্ধন সকল মুসলমানকে এক পতাকার নীচে সামিল করতে। তোমায় গরীবরা কত ভালবাসে সে কি আমি জানিনা? গভীর আবেগ নিঙড়ান স্বর জাহেদের। আর সে আবেগটা যেন ওর স্পর্শ বয়ে সেকান্দারের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে কি এক বিদ্যুৎ সঞ্চারণে।

চট করে কোন কথা যোগায়না সেকান্দরের মুখে।

ওরা উঠে পড়ে। আস্তে আস্তে হাঁটে।

পরিচিত পথ। চেনাজানা ঘরবাড়ি। তবু অনেকদিন পর এসেছে বলেই যেন নতুন মনে হয় জাহেদের। কিন্তু সেই নতুনত্বে নেই এতটুকু ভাল লাগার আকর্ষণ।

বেপারি বাড়ির ঘরের সুমুখের আম গাছটা এই এক বছরেই কত বেড়ে গেছে। চৌকিদার বাড়ির বুড়ো পাকুড় গাছটা ভেংগে পড়েছে। তবু একটা চিকন

ডাল বুকে নয়ে মোটা গুঁড়িটা হেলে পড়েও ভাংগেনি এখনো, মাটির মায়া কাটাতে পারছেনা বুঝি। চৌকিদার বাড়ি থেকে মৃধা বাড়ি অবধি রাস্তাটায় শুধু 'ভাংনা' আর 'ভাংনা', যেন আস্ত একটা মানব শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নেয়া হয়েছে। কত বছর মাটি পড়েনি এ রাস্তায় কে জানে! গেল বর্ষায় যে পড়ে গেছিল হাসমত মৃধার ঘরখানা সেটা ডানা ভাংগা মোরগের মত তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তবু তারই মাঝে বসত চলছে ওর এক বৌ তিন ছেলে মেয়ের।

ঘিনঘিন করে জাহেদের গাটা। গায়ের পাতলা চামড়াটায় যেন বালি পড়ে খস খস অস্বস্তি ছড়িয়ে যায়। দিনে দিনে নগ্ন হয়ে উঠছে বাকুলিয়ার দারিদ্র্য আর শ্রীহীনতা।

রাস্তাঘাটের মেরামতই বল, আর পয়পরিষ্কারই বল, এ সব কারও মাথা ব্যথা নয়। কেই বা একটু নজর দেয় গরীব দুঃখীর দিকে। তোমরাও সব রইলে বিদেশে। বুঝি জাহেদের চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলল সেকান্দর। অভিযোগ-ম্লান ওর স্বর।

আড়চোখে একবার তাকায় জাহেদ। নীরবে পথ চলে।

অথচ তালতলিতে কিন্তু এমন হয়না কখনো। উদ্যোগি লোকের অভাব নেই সেখানে। নিজের কথাটাই চালু রাখল সেকান্দর।

শুধু উদ্যোগ কেন, অর্থ বিদ্যা সামর্থ দেশপ্রেম কোনটায় ওদের কমতি? তোমাদের সামর্থ ও নেই তাই উদ্যোগ ও নেই। কেমন ঝাঁঝিয়ে ওঠে জাহেদের গলাটা।

আবার পলিটিক্স টানছ তুমি? আমি বলি, বেশি নয়, তোমার মত লেখা পড়া জাননেওয়ালা যদি চারটি ছেলে থাকে এই বাকুলিয়ায়, পারেনা তারা এই গ্রামের চেহারাটা বদলে দিতে? নিশ্চয় পারে। অথচ সে দিকে না না গিয়ে শুধু বুক চাপড়াও, যত ধন দৌলত শান শওকত ওই হিন্দু জমিদার মহাজন বাবুমশায়দের, হায় হায় কি হবে আমাদের। কেন, কেন অমন সংকীর্ণ ঈর্ষায় ছোট করি নিজেকে? তার চেয়ে জ্ঞানে গরিমায় সততায় ত্যাগে ওদেরকেও ছাড়িয়ে যাব, এমন একটা প্রতিজ্ঞা কি নিতে পারিনা আমরা? আমি তো বলি এই সুস্থ প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার পথটাই একমাত্র সত্য পথ, ওকে উভয়েরই মঙ্গল।

হঠাৎ যেন কথার বাঁধ ভেংগে দিয়েছে সেকান্দর। আর জাহেদের কাছে ও বুঝি ওর মনের কথাটা স্পষ্ট হয় এতক্ষণে।

ওহে মাষ্টার, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতছ তুমি। অসমানে কখনো প্রতিযোগিতা চলে? গ্রামগুলোর যেমন দেখছ, গ্রাম হাটবাজার সব কিছুর মালিক ওরা, তেম্নি অবস্থা শহরেও, চাকরি বল ব্যবসা বল—সবই তো ওদের খপ্পরে। সাধ্য আছে সেখানে দাঁত ফুটাও তুমি? নতুন পথ করে নেবে তুমি সে সুবিধেই বা তোমায় দিচ্ছে কে? আর যতদিন সেই সুবিধেটা আদায় না করতে পাচ্ছে নিজের জন্য তদ্দিন ওই হাসমত মৃধা অমনিই থাকবে, এই বাকুলিয়ায় এমনি দৈন্যের হাহাকার ছাড়বে।

এতএব ফেলু মিঞা রমজান সবাইকে নিয়ে জমাত কর! কেমন ভেংচিয়ে ওঠে মাষ্টার।

আহা, জমাত তো করতেই হবে। সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দিলে চলবেনা। কিন্তু সে জমাত তো একটা নীতিহীন সুবিধাবাদীর জোট নয়। তার থাকবে সুস্পষ্ট নীতি। সে নীতি হল স্বাধীন দেশে আমাদের স্বাধীন বিকাশ আর উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান, তার জন্য সংগ্রাম। আমি ভেবে পাইনা এই সহজ কথাটা তুমি বুঝছনা কেন? এবার অহিষ্ণু নয় জাহেদ, যুক্তি আর ন্যায়নীতির আবেদন দিয়ে বোঝাতে চায় সেকান্দরকে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা পৌঁছে যায় গ্রামের উল্টো সীমানা সৈয়দবাড়ির দরজায়।

আসবে না? দাঁড়িয়ে পড়ে শুধাল জাহেদ।

না। সন্ধ্যার পরই তো আসছি। বাড়ির পথ নেয় সেকান্দর।

আমার কথাগুলো আরো ভাল করে ভেবে দেখ কিন্তু। পেছন থেকে ভেসে আসে জাহেদের গলা।

কোনদিনই তো চিন্তা ভাবনার অনুকূল ছিলনা সেকান্দরের স্বভাবটা। সেই মজলিসের দিন থেকেই বুঝি রাজ্যের যত জটিলতা একে ছেঁকে ধরছে ওকে আর সেই পথে চিন্তা। কিন্তু চৈতি হাওয়ায় উড়িয়ে আনা রাশি রাশি পাতার মত এই যে ভাবনাগুলো এনে দিল জাহেদ তার কোন আগা মাথা যেন খুঁজে পায়না ও। প্রশ্ন তুলেছে, মুখে মুখে তর্কও করেছে। কিন্তু মনে? মনের ভেতরে যে দ্বন্দ্বের দোলা দিয়ে গেল জাহেদ তার মীমাংসা কি অত সহজ?

লেকুর বাড়ির পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় সেকান্দর। চিঁ চিঁ করে কাঁদছে ওর মেয়েটা। আম্বরির খেঁকানো গলাটা ভেসে আসছে—খালি খাই খাই। পেটে যেন দোজখের আগুন লেগেছে। কাল তো গিলেছিস এক খোরা ভাত। তবু চিল্লাস? সঙ্গে সঙ্গে ধুপ ধুপ করে বুঝি কয়েকটা কিল বসিয়ে

দেয় আম্বরি। হঠাৎ কিল খেয়ে একেবারে থ মেরে যায় মেয়েটি, চিঁচিঁ কান্নাটা যায় থেমে। তার পরই তারস্বরে কান্না জোড়ে অবুঝ মেয়ে। ক্ষিধের উত্তরে কিল, এতটা হয়ত সহতে পারেনা ও।

যা না তোর বাপের 'ঠাউরের' কাছে। বাপ তো চলেছে কবরে। ভুনির কান্নাকেও ছড়িয়ে যায় আম্বরির গলা।

কথাটা হয়ত সেকান্দরকে উদ্দেশ্য করে নয়, তবু মাটির সাথে মিইয়ে যায় ও। খেজুর পাতার দরজাটা ঠেলে ও আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়, ডাক দেয় ভুনি, শুনে যা।

ঘোমটা তুলে বেরিয়ে আসে আম্বরি। আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে পিঁড়িটা পেতে দেয় দাওয়ায়। দাওয়াজ পেয়ে চোখ মুজতে মুছতে ভুনিও বেরিয়ে আসে।

সেকু কোথায়?

ঘুমায়।

এই অবেলায় ঘুম? থাক থাক ডাকতে হবেনা। চল ভুনি।

ভুনির হাতখানা ধরে বেরিয়ে আসে সেকান্দর। দরজার এপারে এসে আম্বরিকে উদ্দেশ্য করেই বলল: ঘরে চাল নেই, খবর পাঠাতে হয়? ভুনির হাতে সের দুই চাল পাঠাচ্ছি। কাল আসব আবার।

রাস্তায় পড়ে কেন যেন একটি প্রশ্নই জাগল ওর মনে। জাহেদ কি ভাবে এদের কথা? যতটুকু বলে ওর তার মাঝে সত্যই বা কতটুকু?

ঝড় বইয়ে দিল জাহেদ।

মিটিং বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলল মানুষগুলোকে।

অন্ন নেই বস্ত্র নেই মর্যাদা নেই, এর নাম কি বাঁচা? কামালের তুর্কি, জগলুলের মিশর, বোখারা-সমরকন্দ, বোগদাদ-দামেস্ক সর্বত্র মানুষের বুকে নতুন বল, নতুন জাগরণ। সারা মুসলিম জাহান জাগছে। স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গে ফুঁসে উঠেছে নীল নদ, ফোরাত-তাইগ্রীসের তীরে তীরে জেহাদের ডাক। ভারতের দশ কোটি মুসলমান কি ঘুমিয়ে থাকবে? কাফের বিদেশী ইংরেজের হুকুমত আর কতদিন বরদাশত্ করবে ওরা?

কথা তো নয়, যেন আগুনের ফুলকি। আর মানুষের মুখে মুখে সে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ঘর থেকে ঘরে। আগুনের আঁচ পেয়ে সহসা বুঝি জেগে ওঠে ঘুমন্ত মানুষ।

ঝড়ের মত গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়ায় জাহেদ।

গাঁয়ের মানুষ, মসজিদের সুমুখে বসে তর্কের অছিলায় একটু গরম হয় ওরা। সেও কালে-ভদ্রে। সহজে যেমন বিশ্বাস করেনা ওরা, তেমনি সহজে রা বের হয়না ওদের মুখ দিয়ে, হুজুগ হাঙ্গামাকে বাপদাদার পরামর্শ মতো দূরে রেখেই চলে ওরা। কিন্তু মনের বাতাসটা যখন দোল দিয়ে ওঠে, ওরা তখন কালবৈশাখী, কোন বাধা মানেনা ওরা। এমনিতে ঠাণ্ডা রক্ত, কিন্তু সে রক্ত যখন চনচনিয়ে গরম হয়ে ওঠে ওরা তখন বে-দিশা।

সেই ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কি এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলি। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ সে গাঁ। দুর্বল লেকু, সেও বসে থাকতে পারেনা ঘরে। দূরে যেতে পারে না ও। কিন্তু মসজিদে আর জাহেদের বাড়ির বৈঠকে হাজিরা না দিয়ে থাকতে পারেনা। উরুর জখমটাই ওর সারছেনা, পাটা সোজা করতে পারেনা। তাই একটা লাঠি নিয়েছেও। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে সৈয়দ বাড়ি।

সেকান্দরও থাকতে পারলনা এই উত্তেজনার বাইরে। দুর্বার এক স্রোতের টান ওকে যেন ভাসিয়ে নিল। জাহেদের সাথেই হাটে বাজারে ঘুরল, বক্তৃতা দিল, চাঁদা তুলল। আর এমনি করে বাকুলিয়ার বাইরে আরো কত সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়ল মাকড়সা যেমন জড়িয়ে পড়ে আপনার তৈরী জালে। কিন্তু, এত উত্তেজনার মাঝেও নিজের সেই ছোট স্বপ্নটুকু স্তিমিত হতে দিলনা ও, মানুষ করবে ছোট ভাইটিকে। তাই এগাঁ সে গাঁ ঘুরে এসেও সুলতানের পড়া নেয়, বসে থাকে পাশে যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছেলেটা।

থাক। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তুমিও ভুলে যাও সব; রমজানকেও মাফ করে দাও। সেকান্দরের দিকে চেয়ে বলল ফেলু মিঞা।

হাত কচলিয়ে এগিয়ে আসে রমজান। সেও আপোষ চায়।

হাঁ, হাঁ সেকান্দর। মিটিয়ে ফেল, এসব ঝগড়া বিবাদ এখন ভুলে যেতে হবে, ওদের কথায় সায় দেয় জাহেদ।

ঝগড়া কি বলছ? এ তো স্রেফ হার্মাদি, ডাকাতী, অন্যায়, জুলুম। এর বিচার হবেনা? ঝাঁঝিয়ে ওঠে সেকান্দর।

অন্যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভাই এসবের বিচার যে মুলতুবি রাখতে হবে আমাদের। আজাদীর মনজিলে না পৌঁছে এ সবের কোন মীমাংসা আছে বল? চটে যায়না জাহেদ। শান্ত ভাবেই বোঝাতে চায় ওকে।

তাই বলে একটা কি দুটো লোক যা খুসি তাই করে বেড়াবে? আর গোটা গ্রামকে সেটা সয়ে যেতে হবে? এ তোমার কি ধরণের কথা আমি বুঝিনা। স্বরটা এবার উঁচুতে উঠে যায় সেকান্দরের।

ওহ্, তুমি এখনো বুঝছনা সেকান্দর। কার একটা ভিটি গেল, কার এক টুকরো জমি বেহাত হল সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন? তা ছাড়া একলা তুমি কার, কয়টা সমস্যার সমাধান করবে বল তো? সমস্যা কি একা লেকুর, একা ফজর আলির? সব সমস্যার যে মূল সে মূলেই তো হাত দিয়েছি আমরা। এবার বুঝি অসহিষ্ণুতায় জাহেদের গলাটা ও উঁচুতে উঠে আসে।

বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ কর। হাল ছেড়ে দেয় সেকান্দর।

আমি দারোগাকে খবর দিয়ে দিয়েছি। এসে পড়ল বলে। মামলাগুলো তুলে নেওয়া হবে। কি বল? মওকা বুঝে সার কথাটা ছেড়ে দেয় ফেলু মিঞা।

হ্যাঁ, তাই করুন। কথাটা বলে আর বসলনা জাহেদ। সেকান্দরের হাত ধরে ফেলু মিঞার কাছারি ছেড়ে নেমে এল দহলিজে। চল, মেলা কাজ পড়ে রয়েছে। হুরমতির ছেলেটাকে কবর দিয়ে আবার ছুটতে হবে সুলতানপুর। হাঁটতে হাঁটতে বলল জাহেদ।

নিরুত্তর সেকান্দর। ও ভাবছে, কি বলবে লেকুকে। সেদিন সেকান্দরকে না বলে, কারো সাথে কোন পরামর্শ না করে লেকু জমি রেহান দিয়ে ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা শোধ দিয়েছিল বলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেকান্দর। আর আজ? লেকুর কাছে কি অর্থ এই আপোষের? থলথলে সেই স্বাস্থ্যটা কি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে কেউ? নাকি মুছিয়ে দিতে পারবে ওর গা-ভরা সেই দায়ের কোপগুলো?

যে 'যারবা' শিশুটিকে নিয়ে এত দুর্ভোগ হুরমতির, তারজন্য এত কান্না? গতকাল সেই সাঁঝ রাতে মরে গেছে ওর বাচ্চাটা। সেই থেকে বাচ্চা ছেলেটিকে আগলে ধরে কাঁদছে হুরমতি। লাঠিটা পায়ের তলায় রেখে বেলগাছে হেলান দিয়ে আঙ্গিনায় বসে আছে লেকু। কি যে করবে সেও যেন ভেবে উঠতে পারছে না।

হুরমতির নাকি ইচ্ছে মোল্লা আসুক, কারি আসুক। কারি অথবা খতিব সাহেব নিজের হাতেই মুর্দাকে গোসল করিয়ে দিক। একটু দোয়া দরুদ পড়ুক। তার জন্য যা পয়সা দেবার রেওয়াজ তার চেয়ে বেশিই খরচ করবে হুরমতি। কিন্তু কে আসবে ওর ডাকে? ও তো এক ঘরে। ওর 'পাপের সন্তান'কে কোন্ মোল্লা গোসল করাবে? কেউ রাজী হয়নি। লেকু, আম্বরি কত বার গেছে ঘরের ভেতর। বলেছে, দাও, গোসল টোসল করিয়ে রাখি, মাষ্টার এলেই দাফন করতে নিয়ে যাবে। কিন্তু, মুর্দাকে ছুঁতেও দেয়না হুরমতি। হটিয়ে দিয়েছে ওদের। রাবু এসেছিল সকাল বেলায়। ওর কথায়ও কান দেয়নি হুরমতি।

দে তো হুরমতি, ওকে আমার কোলে দে। জাহেদ ওর সম্মতির জন্য অপেক্ষা করে না। মরা ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আসে উঠোনে।

কোলের উপর রেখেই ওকে গোসল করায় জাহেদ। সেকান্দর ঘড়া করে পানি ঢালে আস্তে আস্তে।

দেখেছ। কি নাদুস নুদুস বাচ্চাটা, কেমন টকটকে গায়ের রং? পানি ঢালতে ঢালতে বলে সেকান্দর।

হ্যাঁ, ছোট বেলায় আমিও নাকি এ রকম ছিলাম, আম্মার মুখে শুনেছি। দেখ দেখ, নাক চোখ গোটা মুখের আদলটা যেন আমার সাথেই মিলে যায়। শুকনা গামছা দিয়ে মরা ছেলেটির গায়ের পানি মুছতে মুছতে বলে জাহেদ।

কি ইঙ্গিত করছে জাহেদ সেটা বোঝে সেকান্দর। কিন্তু বুঝেও চুপ করে থাকে সেকান্দর, কেননা এ ধরনের রসিকতায় অভ্যস্ত নয় ও।

কবর খুঁড়ে অপেক্ষা করছিল ফজর আলি।

বাচ্চাটাকে কবরের শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বলল জাহেদ: যাক একদিক দিয়ে রেহাই পেল হুরমতি।

ছোট্ট একটা হুঁ বলে নীরবে মাটি ফেলে যায় সেকান্দর।

কার ছেলেকে কবর দিয়ে এলে মাষ্টার? ফিরবার পথে হঠাৎ শুধাল জাহেদ।

কেন, রমজানের? হুরমতি নাকি তাই বলে।

ফেলু মামার নয় তো? কে জানে!

কিছু দূর এসে রাস্তাটা দুখান হয়ে যায়। জাহেদকে বিদায় দিয়ে বাঁ-মুখী হয় সেকান্দর। ওর পেছনে লেকু আর ফজর আলি।

ওরা আপোষ চায়। তাই আপোষই করে ফেললাম। দুদিকের মামলাই তুলে নেয়া হবে। কি বল? হঠাৎ লেকুর দিকে ফিরে বলল সেকান্দর।

কি বলবে লেকু! কোন অর্থ হয় না ওকে জিজ্ঞেস করার। কেননা কথা তো দিয়েই দিয়েছে সেকান্দর। তবু যেন ওর মতামতের উপরই নির্ভর করছে সব কিছু তেমনি ভাবে লেকুর মুখের দিকে চেয়ে রইল সেকান্দর।

কিছুই বলল না লেকু। চোখ জোড়া ওর পথের উপর স্থির। যেন পথটাকেই শুধু দেখছে ও। আর লাঠিতে ভর দিয়ে ডান পাটাকে একটু টেনে টেনে চলেছে ও। আরও কাছে এসে সেকান্দর যেন তন্ন তন্ন করে জরীপ করল ওর মুখটা। আশ্চর্য হয় সেকান্দর। লেকুর মুখে কোন ভাব নেই, ভাষা নেই। বাড়ির কাছটিতে এসে একবার চোখ তুলে ও দেখল সেকান্দর মাষ্টারকে। সে চোখে রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, কেমন যেন ভৎর্সনা। তারপর খেজুর পাতার দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে যায় লেকু। লাঠিটা চাঙের উপর ছুঁড়ে রেখে সটান শুয়ে পড়ে চৌকিতে।

এই চৌকিটার গায়ে বিচিত্র এক গন্ধ, মৃত পিতার সেই বার্দ্ধক্যের আর ওর নিজের কৈশোরের গন্ধ যেন। সে গন্ধের সাথে লেপা মাটি, তেলচিটে বালিস, আম্বরির সেলাই করা কাঁথা, আম্বরির গায়ের গন্ধ, সব মিলে এমন এক বাস যাকে কিছুতেই সুবাস বলা চলে না। তবু উপুড় হয়ে শুয়ে জাম কাঠের গায়ে এক আস্তর চিটচিটে ময়লা জড়ান আর ভুনির কত পেচ্ছাব গড়িয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন চৌকিটার সাথে মধুর এক আত্মীয়তা অনুভব করে লেকু। আর সব গন্ধ মিলিয়ে সেই যে এক বিচিত্র গন্ধ, নাক ভরে সে গন্ধ টানে লেকু।

শরীরে বল আছে, মনেও যেন জোর পাচ্ছে লেকু। আজ তো গোটা সকাল আর এই দুপুর অবধি একবারও শোবার কথা ভাবেনি ও। হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে, জাহেদ সাহেবের কথা—সুদিন আসছে, সুদিন আসবেই—সে কথাগুলো শোনার পর থেকেই একটু একটু করে যেন শক্তি পাচ্ছে ও।

সেই 'সুদিনের' কথাটা যেদিন থেকে গেঁথে গেছে ওর মনে সেদিন থেকে উরুর ওই ব্যথাটাও যেন ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে অনেক কিছু। সেই রাগ, সেই আক্রোশ রমজানের বিরুদ্ধে, ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে, তেমন করে যেন উন্মাদ করেনা ওকে। ওর সেই 'সুদিনের' স্বপ্নের কাছে ওরা যেন কিছুই না ওদের গ্রাহ্য করে না লেকু।

ও ভাবে, থলথলে সেই শরীরখানি আর সেই তাকত, সে ফিরে পাবেই। আবার সে পাহাড়ে যাবে, বাঁশ কাটবে, ছন কাটবে। একটার পর একটা এমনি করে বারটা কি ষোলটা, বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বাঁশের ভেলা বাঁধবে।

সে ভেলায় চাপিয়ে দেবে ছনের আঁটিগুলো, নিজেও চেপে বসবে। বাঁশের ভেলা ভাসিয়ে দেবে নদীর বানে। সেই বাঁশ আর ছনের সম্পদ এসে ভীড়বে তালতলির হাটে। নগদ পয়সা আসবে লেকুর হাতে। পয়লা কিস্তির টাকা দিয়েই একটা রাঙ্গা সাড়ি কিনবে আম্বরির জন্য। তারপর বর্ষা নাববার আগেই চলে যাবে দক্ষিণে ধান কাটতে, 'বদলা' খাটতে। কার্তিকে যদি না গিয়ে পারে তবে যাবে না কোথাও, বাড়িতেই থাকবে। আর ওই জমিগুলো? সে তো ফিরে পাবেই। 'সুদিনে' সে সব কি আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ভালই হল। রমজানের দার কোপ খেয়ে শরীরটা জখমী হয়েছিল বলেই তো বন্ধ হল বিদেশ যাওয়া।

আঃ। বোজা চোখে তন্দ্রার মাঝেও বুঝতে পারে লেকু, জোর আসছে ওর বুকে, ওর মনে। তাকত আসছে ফিরে, শক্তি আসছে ধমনীতে। আবার সেই জোয়ান মরদের থলথল শরীরটা যখন চলবে মাটি কাঁপবে, থর থর করে মাটি কাঁপবে।

লেকু ঘুমিয়ে পড়ে।

স্কুল। গান। নতুন নতুন সব বইখাতা। কত যে খুসি। বাকুলিয়ার মালু, ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা মালু, এত খুসি কোথায় ধরে রাখবে ও?

এত খুসির খবর পেয়ে আপাদের কথাও যেন খেয়াল থাকে না ওর।

খেয়াল থাকে না রাহুদি যে বলে দিয়েছে—রোজ টিফিনের ঘণ্টায় জলখাবার খেয়ে যাবি। আর সেই বড় হবার লজ্জা, গানের লজ্জা, সব লজ্জাই যেন চাপা পড়ে যায় এই খুসির তলায়।

কিন্তু এত খুসির মাঝেও কি যেন হয়ে গেল।

তালুর পেছন দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে মালু।

কি হলরে মালু? শুধায় মাষ্টার সাহেব।

সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে মালু।

আহা কি হয়েছে বল না। কাঁদছিস কেন? আবার শুধায় সেকান্দর মাষ্টার।

ওই যতীন, আমায় পয়লা বেঞ্চি থেকে তুলে দিয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল মালু।

ভট্‌চাযি্য বাড়ির যতীন ?

হাঁ। বলে, ব্যাটা ম্লেচ্ছ, ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছিস কেন ? ঠেলে দিল সেকেণ্ড বেঞ্চে। উথলে ওঠে মালুর কান্না। সার্টের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে শুধাল ও, মাষ্টার সাহেব, ম্লেচ্ছ কাকে বলে ? ম্লেচ্ছ শব্দটা এর আগে শোনেনি ও।

হো হো করে হেসে দেয় সেকান্দর মাষ্টার। মানেই জানিস না। আর ফোঁপ ফোঁপ করে কাঁদছিস ?

বা রে। আমাকে উঠিয়ে দিল যে ! প্রথম বেঞ্চি থেকে উঠিয়ে দেয়ার মত এতবড় অপমানটার মাঝে হাসির কি আছে বুঝতে পারল না মালু। আর একবার উথলে ওঠে মালুর কান্না।

আচ্ছা ঘণ্টাটা শেষ হলেই মাষ্টারদের ঘরে আসবি তুই। আমি যতীনকে ডাকছি। সেখানেই ফয়সলা হবে। সেকান্দর মাষ্টার চলে যায়।

কিন্তু ঘণ্টার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না মালু। ওর ছোট্ট বুকটা যেন ভেঙ্গে গেছে। ভয় বিস্ময় সম্ভ্রম মিলিয়ে ওর মনে যে স্কুলটির কল্পনা সে স্কুল যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। এ স্কুলটি অন্য স্কুল যেখানে ওর কোন আব্দার খাটে না।

শব্দটার অর্থ সে বোঝেনা, কিন্তু যতীনের বলার ঢংয়ে আর ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে-গুলোর বিদঘুটে হাসিতে বুঝে নিয়েছে মালু, ওটা একটা গালি ছাড়া আর কিছুই নয়। যায়গা থেকে জোর করে তুলে দিয়ে আবার একটা গালিও দিল ছেলেটা ? অনেক দিন আগের সেই সুগ্রীবের কথাটা মনে পড়ল মালুর। 'নেড়ে' না কি একটা শব্দ সেদিন বেরিয়েছিল সুগ্রীবের মুখ থেকে। কিন্তু সেদিন তো সেটা গালি বলে মনে হয়নি মালুর ? মালুর সমস্ত রাগটা কেন যেন যতীনের পরিবর্তে স্কুলের উপরই এসে পড়ল। স্কুলটাই খারাপ। এই স্কুলে পড়বে না মালু।

আস্তে আস্তে বাকুলিয়ার দিকে পা বাড়ায় মালু।

রাসুদের বাড়ির কাছটিতে এসেই খুসি হয়ে ওঠে ও। কে যে কি বলেছে, আর কখন যে কেঁদেছে ও সে যেন অনেক কাল আগেকার কথা।

সেই হাজামত পুকুরটার পানি আরো কমে গেছে। পানির উপর থেকেই হাত দুয়েক নীচের পাঁক নজরে পড়ে। ঘাটের গুঁড়িতে পা ঠেকিয়ে এদিক ওদিক পলো ফেলছে রাসু। ঝপ ঝপ শব্দ তুলছে। আজও বুঝি মাছ ধরবার দরকার পড়েছে ওর।

সাড়িটা যেন রপতো হয়ে গেছে রাসুর। পরেছে গায়ের সাথে বেশ

এঁটেসেঁটে। আঁচলটাকে প্যাঁচিয়ে এনে শক্ত করে কোমর বেঁধেছে। ওকে দেখে মালুর মনে পড়ে যায় তালতলির জেলে পাড়ার জালুনিনের কথা। যখন মাছ ধরতে যায় তখন এমনি করে পেঁচিয়ে সাড়ি পরে ওরা। ছন্দ মিলিয়ে কথা বানায় মালু :

ও জালুনী
ঠেলা জালে যা ই বি ?
বড় গাঙে না ই বি ?
সেই সাত পানির তলে
ঘাই মারে বোয়ালে,
জাল যে গেছে ঠেইক্যা
ডুব মারবি এইক্যা ?

ও জালুনী
সাত নাইয়ের ঠাঁই
সেই গাঙে যাই,
জাল টানমু হেঁইচকা
মাছ তুলমু ছেঁইক্যা,
বিহান বাজার ধরমু
নুন মরিচ কিনমু
ঘরে আবার ফিরমু।

সুর করে বলা কথাগুলো শেষ করতে পারে না মালু। পলো ছেড়ে রাস্থ কাদা তুলে নিচ্ছে হাতে। সে কাদা ছুঁড়ে মেরেছে মালুর দিকে। জামাটা বুঝি নষ্টই হয়ে গেল মালুর।
চটেমটে থকথকে পাঁক ছুঁড়ে ওর জামাটা একসার করে দেবার মত কি যে কারণ পেল রাস্থ, বুঝতে পারে না মালু। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ও। জামাটার দশা দেখে রেখে উঠতে চায়। কিন্তু রাস্থর মুখের দিকে তাকিয়ে ঢিপ ঢিপ করে ওর বুকটা।
গোঁ গোঁ করে উঠে আসছে রাস্থ। ঘাটের গাছের গুঁড়িগুলোর উপর অযথা থপ থপ করে পা ফেলছে। রেগে বুঝি টং হয়েছে ও।
গোসা করলি কেন রে ? ওর পথ আগলে জিজ্ঞেস করল মালু।
জালুনী বললি কেন ? যেন মহা অন্যায় করেছে মালু তেমনি রোষভরা চোখে তাকায় রাস্থ।

বা রে, জালুনী তো সুন্দর। ওই তোর মত এঁটে শক্ত গিরো দিয়ে সাড়ি পরে ওরা। কত দেখি আমি বড় খালে। রাস্থর ভুল ধারণাটা ভাঙ্গাবার জন্য রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠে মালু।

বেয়াদব কোথাকার। ফের বলবি তোর ঠুঁসিয়ে থুতনি ভেঙ্গে দেব তোর। জালুনী না ছোটজাত ?

মালু দেখল বলতে বলতে আরও লাল হয়ে উঠেছে রাস্থর মুখখানা।

অন্য দিনের মত চিকণ চাকণ শরীরটাকে নাচিয়ে ছুট দিলনা রাস্থ। পলোটাকে হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল বাড়ির দিকে।

ওর ব্যবহারে, ওর কথায় ঢংয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় মালু। বোলে চলনে কেমন সেয়ানা ঢং। কেমন সেয়ানা রাগ।

মনটা আবার খারাপ হয়ে যায় মালুর। হঠাৎ স্কুলে যতীনের সাথে সেই ঝগড়ার কথাটাও মনে পড়ে গেল। পানিতে ভরে গেল মালুর দুটো চোখ। একটু আগেও কেঁদেছে ও। এখুনি আবার কান্না পেল। ছোট্ট বুকে কোথায় যে এত কান্নার বাসা আর একটুতেই কেন যে ঠেলে আসে সে কান্না বুঝতে পারে না মালু।

জামাটা গা থেকে খুলে উল্টে নিল মালু। উল্টো দিকে মাটির দাগটা চোখে পড়ে না। জামাটা তা করে বইয়ের সাথে বগলে পুরে হাঁটা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবে মালু। ওদের মতো নয় মেজো ভাই ? মালুর গান শোনার জন্য কত হাত বুলানো ওর পিঠে, কত মিষ্টি কথার আদর মেজো ভাইয়ের। সেদিনের কথাটা মনে হতে আজও খুসিতে ফুলে ওঠে মালুর বুক।

ও যে গান করে, কথাটা কেমন করে যেন জেনে ফেলেছে জাহেদ। ওকে কাছে ডেকে বলল, তুই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে গান করিস ?

আমাদের একটা শোনা তো ?

দুনিয়ার লজ্জা এসে ঘিরে ধরে মালুকে। ও বলে, না।

মিথ্যে কথা বলছিস ? বলেছি না তোকে, মিথ্যে বলা অন্যায় ?

তিরস্কার পেয়ে যেন এতটুকু হয়ে যায় মালু। কিন্তু, লজ্জাটা কেমন করে কাটাবে ও ! রেলিঙে ঠেস দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে রাবু আপা। বড় আপা তো যেন আকাশ থেকে পড়েছে। মালু বুঝতে পারে মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে, কান দুটো গরম হয়ে আসছে।

অত লজ্জা কিসের ? গা। এবার নরম আদরমাখা স্বরে বলে জাহেদ। হাতের জোড়া তালু দিয়ে মুখটাকে বুঝি আড়াল করল মালু। চোখ বুজল।

মরিবাঁচি করে গেয়ে ফেলল গণি বয়াতির মুখে শোনা একটি প্রেমের গান। চিরন্তন যে প্রেমের ধারায় সিঞ্চিত মানুষের মন, এ বুঝি তারই বন্দনা। জীবনের নিষ্ঠুর যাঁতাকালে পিষ্ঠ গাঁয়ের মানুষ যুগে যুগে যে প্রেমের স্বপ্ন দেখে, যে প্রেমের কল্পনা দিয়ে অভাব জর্জর জীবনের নগ্নতাকে ঢেকে দেয়, ভক্তির রসে সিক্ত হয়ে খুঁজে পেতে চায় বাঁচার কোন অর্থ। স্মরণাতীত কাল থেকে বুঝি এই প্রেম-আকুলতাই সহনীয় করে রেখেছে ওদের দৈন্য ভরা নিরানন্দের দিনগুলোকে।

প্রথমে একটু আড়ষ্ট শোনায় মালুর স্বর। এক লাইন দু লাইন গেয়েই সহজ হয়, স্পষ্ট হয়। তার পর সুর ঝরে ওর কচি কণ্ঠে।

শোনরে আশেকগণ
প্রেমেরই বিধান—
প্রেম বিনা বেহেশতো নসিব
না হয় মন।
প্রেমের মরা জলে ডুবে না।
যে না জানে প্রেমের মরমো
তার সনে প্রেম কইরো না
আহা প্রেমের মরা জলে ডুবে না।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারা যে প্রেমের শিরোমণি—গো
আরে বারো বছর বাইলো বরশি
তবু আদার গিলে না,
আহা এমন প্রেমিক কয়জনা
প্রেমের মরা জলে ডুবে না।

গণি বয়াতির গানটা অনেক লম্বা। লাইলি মজনু ইয়ুসুফ নবী আর জোলেখা বিবি আরো কত কিস্‌সার বয়ান আছে গণি বয়াতির গানে। কিন্তু মালু এটুকু গেয়েই থেমেছিল।

সাবাশ সাবাশ, মালুকে বুকের কাছে টেনে এনেছিল জাহেদ।

আর রাবু আপা ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলেছিল, বাহ্, খাসা গলা তো তোর। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি?

ইস্ রাহু যদি দেখত সে সব! রাহুর অকারণ গোসাটার কথা মনে পড়ে আবারও বড় খারাপ লাগে মালুর।

কিন্তু জাহেদকে সেদিন গান শুনিয়ে কি যে বিপদে পড়েছে মালু।

তক্ষুণি তক্ষুণি ওকে নিয়ে বসে পড়ল জাহেদ। যেমন স্কুলের সবক দিয়ে যথেষ্ট হচ্ছে না, গানেরও সবক দিতে হবে।

শোন্ মালু, ওসব গান বাদ দে তুই। আমি তোকে নতুন গান শেখাব।

বাহ্, মেজো ভাই গানও শেখাবে? মালু তো আহ্লাদে আটখানা। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল ও।

কিন্তু আসল কাজে আসবার আগে কত যে বক্তৃতা শুনিতা মেজো ভাইয়ের। সে এক জ্বালা আর কি। এক বর্ণ না বুঝেও শুনে গিয়েছিল মালু : নতুন গান তোর ওই প্রেমের গান নয়। নতুন গানে থাকবে তলোয়ারের মত ধার, বিদ্যুতের মত ঝিলিক আর বজ্রের মতো হুংকার। সে গানে ঘুম ভাংবে মানুষের, জড়তা কাটবে; জেগে উঠবে মানুষ।

সে আবার কি? মালুর চক্ষু চড়কগাছ।

তারপর নিজেই গেয়ে গেছিল জাহেদ। 'চলরে চল্—উর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরনীতল...' আজ সেই "শিকল পূজার পাষাণ বেদী...কারার ওই লৌহ কপাট..." গানগুলো গেয়ে আবার এক চোট বক্তৃতা দিয়েছিল জাহেদ। নজরুলের গান। জেহাদের গান, জেহাদী সুর। সেই রক্ত টগবগান সুরে প্রলয় নাচন তুলবি মানুষের বুকে, মানুষের রক্ত কোষে, শিরায় শিরায়। মালুকে এই নতুন গানগুলো শিখিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি জাহেদ, মিটিংয়ে সভায় নিয়ে গেছে ওকে। হাজার হাজার মানুষের সুমুখে দাড় করিয়ে দিয়ে বলেছে—নে গলা ছেড়ে গা।

মালুর ছোট্ট মন অভিভূত হয়েছে এই নতুন সুরের দমকে। কোন অগ্নি-ঝলকে ওর কচি শিরাগুলো গানের সাথে জ্বলে ওঠে, সুরের সাথে তাল মিলিয়ে টন টন করে বেজে উঠে ওর ভেতরটা। ওর রক্তেও যেন প্রলয় ডাকে, জেহাদী সুরে কি এক নাচন জাগে ওর শিরায় শিরায়। বেশুমার লোক। ওর গান শুনে হাততালি আর বাহবায় ফেটে পড়ে মানুষগুলো। সাবাস, জিতা রহো, ওর পিঠ চাপড়ায় জাহেদ। সেই থেকে মালুতো প্রায়ই এদিক সেদিক ঘুরে আসছে জাহেদের সাথে। আর তা নিয়ে সেকান্দর মাষ্টার আর জাহেদের কথা কাটাকাটির অন্ত নেই।

এতে স্বভাব নষ্ট হবে, পড়া শোনারও ক্ষতি হচ্ছে ওর। বলে সেকান্দর। পড়ার একটু ক্ষতি হবে বৈ কি? তা পুষিয়ে নেবে মালু। তাই না রে? সেকান্দরের কথাটা গায়ে না মেখে যেন মালুরই সম্মতি চায় জাহেদ।

মেজো ভাইয়ের ডাকে মালু তো হরদম এক পা। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ও। মাষ্টার সাহেব যেন কী! গান গাইলে স্বভাব নষ্ট হয়, এ কোন্ধারা কথা? মাষ্টার সাহেবের কথাগুলো একটুও পছন্দ হয় না মালুর। কত লোক। কাতারে কাতার। সবগুলো চোখ চেয়ে থাকে মালুর দিকে। মালুর স্বরে ওদের রক্তও বুঝি নেচে ওঠে। ইস্ একদিন যদি দেখত রাম্বু। তা হলে অমন করে নাক সিঁটকাতে পারত? বলতে পারত 'বেয়াদব'? তাই সই। মালু যদি 'বেয়াদব'ই হয় তবে আর কোন দিনই মালু যাবে না ওদের বাড়িতে। আর যদি বা যায়ই হাজার তোষামোদ করলেও রাম্বুর সাথে কখনও কথা বলবে না মালু। আর কথা দু একটা যদিই বা বলে গান আর শোনাচ্ছে না মালু। এটা মালুর কসম।

রাম্বুকে এমন কঠিন শাস্তি দিতে দিতে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গেছে মালু, সেটা খেয়াল পড়েনি। খেয়াল হল জাহেদের ডাকে: জামা লুঙ্গি গামছা সব পরিষ্কার করে রাখ মালু। আসছে কাল বিকেলেই সাম্পান ধরব। এবার যেতে হবে অনেক দূর।

কাদা ভরা জামা আর বইগুলো টেবিলের উপর রেখে ছুটে যায় মালু। অনেক দূর? কত দূর মোজো ভাই?

এ হাট থেকে সে হাট। এ বাজার থেকে সে বাজার। সাম্পান কূলে ভিড়ে। ওরা উঠে যায় পারে। জাহেদ, সেকান্দর মাষ্টার ফেলু মিঞা বক্তৃতা দেয়। মালু গান করে। আবার সাম্পান ছাড়ে। আর এক হাটে গিয়ে ভিড়ে। মাঝে মাঝে রমজানও এসে যোগ দেয় ওদের সাথে। কত কিছু দেখে মালু। নতুন নদী, নতুন নতুন গাঙ, খাল। নতুন যায়গা। দুনিয়াটা যে এত বড় কোনদিন ভাবতে পেরেছিল মালু।

সাম্পানে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় মালুর, ওর ভেতরে ভেতরে কে যেন সারাক্ষণ গান গেয়ে চলেছে। সে গানের বিরাম নেই, যতি নেই। ঘুমের মাঝেও সে গান যেন গুন গুন করে বাজে। মালু ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না সে গানের সুর।

সাম্পান তীরে বেঁধে কখনো বা ওদের হেঁটে যেতে হয় অনেক দূর। হাঁটতে হাঁটতেও নিজের ভেতর সেই নিঃশব্দ তান শুনতে পায় মালু, বুকটা যেন ওর ভরে যায় কথায়, সুরে, গানে। কত যে কথা। কত যে সুর। সবটার হদিস করতে গিয়ে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায় মালুর। এইটুকু বয়সে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ওর কৈশোরটা যেন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জানা অজানা

অনেক কিছুকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু ছোট্ট সে হাতের বেড়ি, সামান্য তার শক্তি, তাই সবটাকে ধরে রাখতে পারছে না ও।

এই তো খাসা খুলেছে তোর গলা। ইস্পাতের ধার, বজ্রের ডাক, 'অগ্নিবীণার' ঝংকার, এই তো আসল সুর। প্রাণ মাতানো জীবন জাগানো সুর। মালুর পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত হয় জাহেদ।

ঠিক এই সময়টিতেই মালুর মনে পড়ে যায় রাস্থ আর রাবু আপার কথা। রান্নুদির কথাও।

কেমন যে দেমাক দেখায় রাস্থ-টা। অথচ ঠিক তার উল্টো রাবু। মুচকি মুচকি হাসে রাবু আর বলে, তুই বুঝি শেষ পর্যন্ত গায়েন হবি রে? তার পরই হয়ত বলে বসল রাবু, শোনা তো একটা নতুন কিছু। সেই মুহূর্তেই হয়ত প্রস্তুত নয় মালু। না করে বসল ও। আর যায় কোথায়, অমনি রাবু বলবে, বেশ আমিও বলে দিচ্ছি মুন্সিজীকে।

মুন্সিজী অর্থাৎ মালুর আব্বাকে জানানোর অর্থ তো ভয়াবহ। প্রথমেই বেত্রাঘাত, অতঃপর যে কী, ভাবতেও গাটা বরফ হয়ে যায় মালুর। মালুকে যে মৌলভী বানাবেন এ আশা এখনো ছাড়েননি তিনি। তাই যে দু চারদিন জাহেদের সাথে বাইরে কাটায় সে কয়টা দিন বাদ দিয়ে সকাল বেলায় আরবী ফারসী সবকের জালাতনটা নিত্যদিন সয়ে যেতে হচ্ছে মালুকে।

মুচকি মুচকি হেসে মজা দেখে রাবু। শেষ পর্যন্ত গান শুনিয়ে তবে রেহাই পায় মালু।

কেমন করে যেন রান্নুর কানেও পৌঁছে গেছে খবরটা। ভারি খুসি রান্নু। বলেছে, আসিস হারমোনিয়ামটা শিখিয়ে দেব তোকে। ভাল কথা। দু একদিন গিয়ে যন্ত্রটা যে টিপে টুপে দেখেনি মালু তা নয়। কিন্তু কেমন যেন ওটা ধাতে আসে না মালুর। তা ছাড়া বসে বসে প্যাঁপুঁ করবার সময়ই বা কোথায় তার? দু দিনেই হারমোনিয়ামের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছিল মালুর।

কিন্তু, সেদিন অমন গম্ভীর হয়ে গেছিল কেন রান্নু? অমন রূঢ় আর কর্কশ গলায় ধমকেই বা দিল কেন মালুকে?

জাহেদের সাথে সফরে বেরুবার দিন টিফিনের ঘণ্টায় রান্নুদের বাড়ি গেছিল মালু। প্রথম কথাই শুধিয়েছিল মালু: আচ্ছা রান্নুদি, ম্লেচ্ছটা কি গাল? কে বলেছে? গম্ভীর হয়ে শুধিয়েছিল রান্নু।

ওই ভটচায্যিদের ছেলে যতীন। রান্নুর অকারণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়েই বলেছিল মালু।

ওসব পাজী ছেলেদের থেকে দূরে থাকলেই পারিস? ওদের সাথে না ঢলাঢলি না করলে কি চলেনা তোর?

শোন রান্নুদির কথা। এক ক্লাসে পড়ে, পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে আবার দূরে থাকা যায় কেমন করে?

আচ্ছা, মালু না হয় দূরেই থাকল। কিন্তু অমন করে খেঁকিয়ে উঠবার কি কারণ ঘটল রান্নুদির? সভা সমিতি বক্তৃতার এত হুল্লোড় আর ওর মনের ভেতর এত যে গানের উত্তেজনা, তার মাঝেও কথাটা মনে পড়ে মালুর। রান্নুদির সেই গম্ভীর মুখখানি যেন উড়ে উড়ে চলেছে ওর পাশে পাশে।

নদী ছেড়ে গাঙ, এ গাঙ সে গাঙ ঘুরে আবার উল্টোমুখী হয় ওরা।

চাটখিলে এসে নেবে পড়ে জাহেদ আর সেকান্দর মাষ্টার।

এখানে তোর দরকার নেই। আমরা হেঁটে হেঁটেই কয়েকটা বাড়ি ঘুরনী দিয়ে চলে আসছি। তুই যা।

জাহেদের কথা মত সাম্পানে চড়ে একলাই ফিরে এল মালু। বড় খালে সাম্পানটাকে বিদায় দিয়ে কোনাকুণি দখিন ক্ষেতটা পেরিয়ে এল। মিঞা-দের সুপুরি বাগানটা আড়াআড়ি কেটে ভুঁইঞা বাড়ির পাটিপাতার বাগানটা ফুঁক ফাঁক করে একটু ডান ঘেঁসে রান্নুদের বাড়ির পেছনের সেই না-ডোবা না-পুকুরটির পাড়ে উঠে আসে মালু। রান্নুদের সীমানা পার হলেই পর পর সৈয়দদের কয়েকটা গড়। সে গড়গুলোর পর সৈয়দ বাড়ির অন্দর মহলের পাড়-উঁচু পুকুর। সেদিকেই পা বাড়ায় মালু। কিন্তু পাটা একটুখানি উঠেই থমকে থাকে মাটিতে পড়ে না। ওর কানে আসছে:

মালু বয়াতি! মালু বয়াতি!
যাও কই?
উধমপুর!
রান্ধ কি?
কইতরের ঠ্যাং!
খাও কি?
কচুর শাক!

রান্নুর গলা। একটুও ভুল নেই তাতে। পশ্চিমের পাড়টা কচুর জঙ্গলে

ভরে গেছে। সেখানে লতি তুলছে রাসু। মাথাটা উঁচু করেই একটা বড় রকমের কচু গাছের আড়াল নিয়ে বসে পড়ে রাসু।

মুহূর্তে কয়েকদিন আগের কসমটি ভুলে গেল মালু। এক দৌড়ে রাসুকে ধরে ফেলল। হাতটি ধরে ঝটকা টানে নিয়ে এল কচু পাতার জঙ্গলের বাইরে। একটুও বাধা দিল না রাসু। পথের ধারে পড়ে থাকা ঝুমকো লতার মতোই মালুর হাতের সাথে পেঁচিয়ে চলে এল ও। একটু ফর্সা যায়গা দেখে বসে পড়ল ওরা।

কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মালু যেন বোকা বনে যায়। মিঞাদের বড় পুকুরটার অথৈ জলের মত কেমন শান্ত আর গভীর রাসুর চোখ। এমন চোখ আগে কখনো দেখেনি মালু। এতদিন কোথায় ছিল রাসুর এই চোখ? ছাড় বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় রাসু। আর হাসে ও, যে হাসিটা সেই সাড়ি পরার দিন থেকেই জায়গা পেয়েছে রাসুর ঠোঁটের কোলে।

একি হল মালুর? কথা বানিয়ে সে সুর দেয়। কথা তার গান হয়ে বাতাসে ভাসে। সেই মালুর সব কথা গুলিয়ে যায়? এমনটি তো কোনদিন হয়নি মালুর? অথচ কত কথাই তো শোনাবার রয়েছে রাসুকে। মালুকে সত্যি সত্যি বোকা বানিয়ে আরও একবার হাসল রাসু। দুষ্টুমীর রেস নেই, কেমন বাঁকা টানের, আলাদা কিসিমের হাসি। অনেক বড় হয়ে গেছে রাসু। রাসু সবই বোঝে সবই জানে। ওই হাসিতে আর একটু রাংগা রাংগা মুখের আদলে সে কথাই তো লেখা আছে। কিন্তু মালু বয়াতি, যতই গান জানুক সে, রাংগা মুখ আর চোখের ঠারে ফুটে ওঠে যে সব কথা সে সব কথার যে কি জবাব, সে তো শেখা নেই তার।

মিঞা পুকুরের অথৈ জলের মত শান্ত আর গভীর চোখ জোড়া রাসু সোজা তুলে ধরল মালুর দিকে। ওর মুখের সেই সেয়ানা হাসিটা যেন এখন ঠাঁই নিয়েছে ওর চোখের ক্ষেতে। হেসে খেলে যেন নেচে উঠল সেই শান্ত চোখ। ছড়ার মিলে বলল রাসু:

ইস, মুরোদ নাই দুই আনা
বউ চাই সেয়ানা?

এতক্ষণ কথা আসেনি মুখে, এবার মাথাটাও বুঝি গুলিয়ে গেল মালুর।

এর পর আর এক অবাক কাণ্ড করল রাসু। হঠাৎ মুখখানি গুঁজে দিল মালুর কোলে। নিথর পড়ে থাকল যেন ঘুমিয়ে গেছে।

কোলের উপর রাখা মালুর হাতখানি রাসুর বুকের তলায় ত্রস্ত শালিকের ডানার

মতো কেঁপে উঠল। সে কাঁপুনিটা যেন আচমকা ঝিলিক তুলে ছড়িয়ে পড়ল ওর গোটা শরীরে। অবাক! অবাক মানে মালু। এমন করে তো কোনদিন কাঁপেনি ও? তারপর ওর মনে হল কোত্থেকে যেন এক দমক গরম হাওয়া ছুটে এল। সে হাওয়ার আঁচ লেগে যেন পুড়ে গেল ওর মুখ, গলা, হাত, ওর সমস্ত শরীর।

রাস্থর খোঁপায় এক জোড়া কদম ফুল। কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো কেমন উদাসীন আলসেমিতে পড়ে থাকা খোঁপার দুধারে ঝুলে রয়েছে ফুল-গুলো। আস্তে করে নাকটা ওর খোঁপার চুলে ডুবিয়ে দিল মালু। কদমের গন্ধ আর ওর চুলের খোসবু টানল বুক ভরে। যেন ফিসফিসিয়ে বলতে চাইল মালু: মুরোদ আমার আছে রে, মিছে ভয় পাচ্ছিস তুই। আচমকা উঠে দাঁড়ায় রাস্থ। মালুর হাত দুটো অকারণ জোরে ছুঁড়ে দেয়। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে, যেন দারুণ অপমানিত হয়েছে ও! মালু দেখল অথৈ পানির শান্ত গভীরতা হারিয়ে চোখ দুটো রাস্থর জোনাকির মতো জ্বলে উঠেছে।

কী আমার মুরোদ রে! ফোঁসফোঁসিয়েই বলল রাস্থ আর কি যে ঝাঁঝ ছড়াল। কোথা থেকে এত ঝাঁঝ এল রাস্থর গলায়? ওর দিকে তাকিয়ে যেন দিশে হারায় মালু।

আর কিছু বলল না রাস্থ। মালুর দিকে চাইলও না একটিবার।

লতির আঁটিটা হাতে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কচু পাতার জঙ্গলের ওপারে। মালুর বুকটা কেন যেন ভারি হয়ে গেল। মনে হল ওর কি এক কান্না জমেছে সেখানে। কিন্তু চোখ দুটো ওর জ্যৈষ্ঠের ক্ষেতের মতই শুকনো। এতদিন মালুর শরীরটাই বুঝি ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছিল। আজ হঠাৎ করে ওর মনটাও যেন বয়সের ছোঁয়া পেল, এক লাফে যেন বেড়ে গেল মালু অনেকখানি।

সূর্যটা লাল হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নাববে এক্ষুণি। গড়গুলো পেরিয়ে সৈয়দ-বাড়ির অন্দর মহলের পুকুর পাড়ে উঠে এল মালু। হঠাৎ ঢোলের আওয়াজ শুনে কানটা ওর খাড়া হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরেই ঢোলের আওয়াজ আসছিল, কিন্তু সে দিকে কান ছিলনা মালুর।

বাকুলিয়ায় ঢাক ঢোলের রেওয়াজ নেই। বছরে শুধু এক দিনই ঢোল বাজে এ গাঁয়ে, মিঞাদের পুইন্যার সময়। কয়েক পা এগিয়েই মালুর আর সন্দেহ রইল না, সৈয়দ বাড়ি থেকেই ভেসে আসছে ঢোলের আওয়াজ।

ঢোলকের তালের সাথে সাথে টুং টুং কী এক বাজনাও বাজছে যেন। সৈয়দ বাড়িতে বাজনা? সূর্যের পশ্চিম দিকে ওঠার মতোই এ এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। ঢাক ঢোল বাজনা ও সব হল শেরেকী ব্যাপার, হিন্দুয়ানী কারবার। তাই সব রকমের বাজনাই নিষিদ্ধ এ বাড়িতে। পুইন্যার সময়ও কোন ঢোল বাজতে পারে না সৈয়দ বাড়িতে। পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেয় মালু।

কাছারি বাড়ি পৌঁছে চক্ষু স্থির মালুর। এলাহি কাণ্ড কাছারি বাড়ির ময়দানে। কারা যেন মাতম জুড়েছে। অদ্ভুত ওদের ভাব ভঙ্গি। সংখ্যায় ওরা তিরিশ কি চল্লিশ হবে, কিন্তু গোটা মাঠ জুড়ে ওদের বিচিত্র তাণ্ডব। কেউ বা এলোপাথাড়ি লাফঝাঁপ দিয়ে চলেছে। কেউ বা বুক চাপড়ে কপাল থাপড়ে মাতম করছে। গায়ে ওদের জামা নেই কারও। পরনে শুধু কম্বল, তাও মাতমের ঘোরে কখন যে কোমর থেকে খসে পড়ছে। খেয়াল নেই ওদের। কেউবা কোন রকমে আঙ্গুল দিয়ে কম্বলটাকে ধরে রেখেছে মাত্র।
ওরা যে যিকির করছে তাতে সন্দেহ নেই মালুর। কেননা মুখে ওদের আল্লার কালাম। কিন্তু, এ কোন্ ধারা যিকির! এমন তো কখনো দেখেনি মালু? ওদের চোখ বোজা, মুখে বিচিত্র তন্ময়তা। ওরা যেন বেহুঁশ, দেওয়ানা।
কিন্তু হাত পায়ের সঞ্চালন কেমন উগ্র। সে উগ্রতাকে ছাড়িয়ে হঠাৎ কি এক করুণ বিলাপের সুরে ভেঙ্গে পড়ছে ওরা, পর মুহূর্তেই যেন লড়াইয়ের হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে, ধপ করে পড়ছে মাটিতে। একই সাথে হু হু বিলাপ আর হুংকার মিলিয়ে বিচিত্র এক শব্দ নির্ঘোষ বাতাস দুলিয়ে মাটি কাঁপিয়ে কোন ভিন্ন জগতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে কাছারি বাড়ির মাঠে। কেমন ভয় ভয় করে মালুর। গায়ের লোকগুলো ওর দাঁড়িয়ে যায়। পর মুহূর্তেই আবার ওদের ঢোলকের তাল দেহের শিরায় কি এক নাচন তুলে 'যায়, ওদের দেওয়ানা নৃত্য বুঝি দর্শকদেরও ডাক দিয়ে যায়। বড় গোছের একটা ভীড় জমেছে ওই মস্তানাদের ঘিরে।
কিছু দূরে কয়েকজন কম্বলধারী একান্ত বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত। কেউ হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে, কেউ শান দিচ্ছে ছুরিতে। কয়েকজন মাটি খুঁড়ে ইট বসিয়ে কাজ-চালান-উনুন বানাচ্ছে। এক পাশে গোটা তিন জবাই করা খাসি ছাগল ছটফট করছে এখনো। আরও একটা খাসি বাঁধা রয়েছে মাঠের

কোণে নারকেল গাছটার সাথে। চমকে উটল মালু, এযে রাবু আপার খাসিটা! রক্ত জবজব মাটিতে ছটফটিয়ে কি কাতর গোঙানী তুলছে জবাই করা খাসিগুলো, রাবুর খাসিটা সেদিকে চেয়ে রয়েছে, করুণ ভয়ার্ত ওর চোখ জোড়া। কাছারি ঘরের পেছন দিযে ঘুরে সেই নারকেল গাছটার কাছে পৌঁছে গেল মালু। চটপট খুলে দিল দড়িটা। পরিচিত লোক দেখে চোখ তুলে তাকাল খাসিটা। গলা দিয়ে কেমন অস্ফুট একটা শব্দ করল। গভীর এক অন্তরঙ্গতায় মাথাটা বার দুই ঘসে দিল মালুর পায়ের সাথে। তার পর ছাড়া পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের গেওারী খেতের নিরাপত্তায়। মস্তানারা জিকিরে ব্যস্ত। এদিকে কম্বলধারিরা ব্যস্ত রান্নার আয়োজনে। কেউ লক্ষ্য করল না মালুকে।

মস্তানাদের কাছাকাছি সরে এল মালু। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখগুলো ওদের ঢাকা। বাবরি চুলের গোছা তেল সাবানের অভাবে জট পাকিয়েছে, যেন অনেক যুগের কালিঝুলি মাথার চাঁদি থেকে ঝুলে রয়েছে। খতিয়ে খতিয়ে দেখেও একটা চেনা লোক বের করতে পারলনা মালু। অবাক হয় মালু। দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে লোকগুলো যেন ওদেরই ঘর বাড়ি। অথচ বাড়ির লোক মালু চিনতে পারছেনা কাউকে।

সহসা যিকির থেমে গেল। ঢোলের আওয়াজ স্তব্ধ হল। মস্তে মাওলারা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পডেছে। গোল হয়ে বসে পড়েছে সবাই। শুধু জনা দুই হাঁটু গেড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড হয়ে পডে রয়েছে। থর থর কাঁপছে ওদের শরীর। ওদের ক্লান্ত কণ্ঠ ভেঙ্গে নিঃসরিত হচ্ছে ক্ষীণ আওয়াজ— আল্লাহু আল্লাহু। এখনি হয়ত যযবা উঠবে ওদের। এটা তারই পূর্বলক্ষণ। হঠাৎ সন্ধ্যার আনমনা বাতাসকে চমক দিয়ে ঝংকার তোলে দোতারার মিষ্টি বোল। আর যেন মন্ত্র নির্দেশে থেমে যায় সমস্ত কোলাহল। যারা খাসির ছাল ছড়াচ্ছিল, যারা রাণ আর সিনার গোশ্‌তগুলো কেটে কেটে পৃথক পৃথক ভাণ্ডে রাখছিল তারাও ছুরিটাকে পাশে রেখে উৎকর্ণ হয়। যারা তামাসা দেখছিল তারাও কান খাড়া করে।

নিবিষ্ট দোতারার মারফতী সুর পাখা মেলে দেয় সন্ধ্যার মিঠে বাতাসে। এক মনে অনেকক্ষণ ধরে তারের গায়ে আঙ্গুল চালিয়ে যায় মস্তানা শিল্পী। সুরের দমকে শিল্পি বুঝি মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মাটির উর্দ্ধে, কোন দূরের দুনিয়ায়। হঠাৎ সুর পাল্টায় ও, গান ধরে। সকল মস্তানা কণ্ঠ মিলায়। গানের প্রথম কলিটা কানে যেতেই চোখ যেন খুলে গেল মালুর।

মস্তানাদের পরিচয় পেয়ে খুশিই হল ও। রাবু আপার আব্বার কীর্তিই। তা না হলে সৈয়দ বাড়িতে এমন শেরেকী তাণ্ডব অনুষ্ঠানের দুঃসাহসটা কারই বা হবে! কিন্তু, কোথায় তিনি? সেই কবে একদিন কি দু দিনের জন্য তাকে দেখেছিল মালু। ছোট্টটি ছিল ও, মনেও নেই তার মুখ। তবু ওর মনে হয় সমবেত গানে যার ভূমিকাটা প্রধান, তিনিই হবেন রাবু আপার আব্বা। হ্যাঁ নাকে চোখে আর কপালে ঠিক রাবু আপার মুখের ঢক তার পাশেই উপুড় হয়ে যে মস্তানা যিকিরের ক্ষীণ আওয়াজ তুলে চলেছে তার শরীরের কাঁপুনিটা যেন বেড়ে গেছে।

ঢোলকের মৃদু তালে, এক তারার ঝংকারে শির দুলিয়ে দুলিয়ে গেছে চলেছে মস্তানার দল!

ভাণ্ডারিতে আজবী কারবার
ওহো কী চমৎকার।
সাজাইল মারফতের তরী
দেখবি যদি আয়
চড়বি যদি আয়—আহা মাইজ ভাণ্ডার,
ওহো কী চমৎকার।
ভাণ্ডারীতে আজবী কারবার।
ওকে হিন্দু মুসলমান
তোরা দেশে দশে এক প্রাণ
তোরা ভক্তি কর আওলিয়ার চরণ
ওরে চিন্তা ভবে নাই আর
ওহো কী চমৎকার,
ভাণ্ডারীতে আজবী কারবার।

কি-ই বা গানের কথা, কি-ই বা তার ভাব। তবু অন্তর নিসৃত ভক্তির রস ঢেলে ওরা সৃষ্টি করে অপূর্ব এক সুর দ্যোতনা। ওরা বুঝি জাত-শিল্পী। মজহু হৃদয়ের গভীর অনুভূতি আর ভাবজগতের কোন অদৃশ্য অপার্থিবকে স্পর্শ করার আকুলতা, বুঝি গানের সুরে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব চরাচরে, কাঁদিয়ে তুলেছে এই সাঁঝ রাতের মৌন প্রকৃতিটাকে। মালু দেখল, মস্তানাদের চোখ ভাসিয়ে দর দর বেগে নেবে আসছে পানির ধারা।

কাছারি ঘরের দোর গোড়ায় এসে মালুর চোখটা যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। সেখানেই বুঝি আজকের এই মস্তানা দঙ্গলের সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

ঘন নীল পশমী গালিচা বিছিয়ে বসে রয়েছেন ফর্সা নুরানী চেহারার এক বুজুরগ্। মেহেদী রঞ্জিত দাড়ির ঢলে বুক তার ঢাকা। তেল চকচকে মসৃণ কলপ দেওয়া বাবরি। মেয়েদের মতো মাথার মাঝ বরাবার সিঁথি কাটা। দুটি পুষ্প স্তবকের মতো কোকড়ানো বাবরি দুভাগ হয়ে ঝুলে পড়েছে দু পাশে, কান জোড়া ঢেকে রেখেছে। অন্যদের অঙ্গাবরণের অভাবটি তিনি একলাই যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। জামা জোব্বায় ভরা তার গা। পরনে তার পাজামা। গায়ে আচকান। আচকানের উপর পাতলা চীনা সিল্কের ঢিলা চোগা। চোগায় গায়ে বিচিত্র বুটি, বুকের পাড়ে, বোতামের ঘরে জরি সুতোর সূক্ষ্ম কারুকার্য। হ্যাজাকের আলো পড়ে ঝিকিমিকি ছড়ায় তার জরি চুমকির রেশমি পোষাক, ঝিলিক দিয়ে যায় চেহারার নুরানী চমক। গানের সুরে তিনিও হেলছেন দুলছেন, কখনো বা চোখ বুজছেন ধ্যানের তন্ময়তায়।

এক সময় থেমে যায় দোতরার ঝংকার।

পূর্ণবেশ বুজুরগ্ একটু নড়ে চড়ে আচকানের খুঁটটা টেনে, চোগার ছড়ান প্রান্তটাকে আর একটু মেলে দিলেন। পর পর তিনটে হাত তালি দিলেন। মেহেদীরাঙ্গা দাড়ির অরণ্যে ঘনঘন আঙ্গুল চালিয়ে একটু কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর আবৃত্তি আর কাওয়ালির মাঝামাঝি এক বিচিত্র ঢংয়ে গলা ছাড়লেন :

লাইলাহা ইল্লেল্লাহ
মাফিকলমা গায়রুল্লাহ
হাসতে রাব্বি সাল্লেল্লাহ

বিস্ময়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় মালুর চোখ জোড়া। এমন কণ্ঠ কখনো শোনেনি ও। মিহিও নয়, দরাজও নয়। মিষ্টিও বলা চলেনা। অথচ কান পেতে শুনতে ইচ্ছে জাগে। কি এক মরমী আবেগ যেন যাদুময় এ কণ্ঠে।

লোকটির পোশাক আশাক চেহারার চমক দেখে আগেই ধরে নিয়েছিল মালু এ-ই মস্তানাদলের নায়ক।

এবার বুঝি নিঃসন্দেহ হল ও। কেননা গোটা মস্তানার দল গভীর এক ভক্তির সাথে শুনে গেল তার বচন। দলপতির শেষ হবার সাথে সাথেই ওরা বাকীটা ধরে। সুর তুলে, তাল ঠুকে গেয়ে চলে। বিচিত্র এক সুরের সাথে পরিচয় হল মালুর। মাতমের উন্মত্ততা নেই। মারফতী টানের অন্তর

নিঙড়ান আবেগ নেই। কখনো উচ্চতানে, কখনো নীচু খাদে একটি শান্ত পবিত্রতা যেন ধীরে ধীরে শব্দ তরঙ্গে উৎসারিত হয়ে চলেছে।

ভাল লাগে মালুর। ওদের সাথে মালুও তাল ঠোকে।

এ পর্বও শেষ হয়ে গেল।

তারপর যে অবাক কাণ্ডটি ঘটল তাতে মালুর গায়ের লোমগুলো সজারুর কাটার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের রক্ত হল হিম।

যে দুজন মস্তানা বেহুঁশের মতো এতক্ষণ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, তার একজন এই নবকাণ্ডের নায়ক। উপুড হয়ে পডে আছে তা পড়েই আছে লোকটি। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে মুখের বোল। মনে হয় যেন বিকারের ঘোরে কঁকাছে একজন নেতিয়ে পড়া মানুষ। হঠাৎ বুঝি দৈত্য দানোর শক্তি ভর করল ওর গায়ে। হাতপা তেমনি গোটানো আবস্থায়ই বিকট চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল ও। এতক্ষণে বুঝি যযবা এসেছে ওর। শক্ত মাটির আঘাতে নিশ্চয় চামড়া ফেটে একাকার হয়েছে লোকটার, চোখা চোখা ঘাসের কামড় নিশ্চয় ঘা তুলেছে ওর সর্বাঙ্গে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। ডাঙ্গায়পড়া মাছের মত কি এক অস্থিরতায় লাফিয়ে লাফিয়ে ও চলে যায় অনেকদূর। তারপর পুকুর পাড়ের বেত ঝোঁপে আটক পড়ে কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়। একটু পরেই হাত পা ছেড়ে দেয়। বোধ হয় পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়েছে লোকটি। সাথীরা গিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এল ওর দিগম্বর দেহটা। একমাত্র পরিধেয় সেই কম্বলখানি রয়ে গেল বেতের ঝোপে।

এমনি করেই চলে ওদের মারফত লাভের সাধনা, পুলসারাতের পুলটা পার হবার শক্তি আরাধনা। এমনিভাবে দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ওরা। পথের উপরে মাইজভাণ্ডারী কোন শিষ্যের আতিথ্য নিয়ে যিকির করে, বিশ্রামও করে।

মালুর মনে হল স্বরেশ বুজরগ্ বোধ হয় মারফতের তরীটা পেয়ে গেছেন। অন্যদের এখনো সাধন-ভজনের পালা চলেছে। তাই বুজরগ্ দলপতি। সেই কারণেই বুঝি তার এই আভিজাতিক দূরত্ব, ওই চমকদার লেবাস।

রাবুর আব্বা বলে যাকে স্থির করে নিয়েছে মালু সেই দেওয়ানা দঙ্গল ছেড়ে অন্দর বাড়ির দিকে পা ফেলল। মালু তার পিছু নিল।

অন্দর বাড়িতে বেধেছে হুলুস্থূল কাণ্ড। বাক্স তোরঙ্গ আর মাল টানাটানির ঘড় ঘড় শব্দের মুখর দালানঘর। ছুটোছুটি করছে চাকরাণীর দল। আরিফা কাঁদছে।

হুরমতি মেহদী মাখছে রাবুর হাতে আর গজ গজ করছে : পাগলের কাঁথা আর বলেছে কাকে ? বউটাকেও খেয়েছে, এখন মেয়েটাকেও খেতে এসেছে।

সৈয়দ গিন্নী শুয়ে রয়েছেন নামাযের চৌকিতে। গোটা ব্যাপারটায় তার যেন কিছুই বলার বা করার নেই।

এই রাবু খবরদার বলছি—ঘর থেকে এক পা নড়েছিস কি কখনো তোর মুখ দেখব না। কান্না থামিয়ে চিৎকার করে ওঠে আরিফা।

দরবেশ, রাবুর আব্বাকে এই নামেই ডাকে সবাই, ঘরে ঢুকেই উঠে দাঁড়ায় রাবু।

যাও এবার গোসল করে এস—বলেই আবার বেরিয়ে যায় দরবেশ।

রাবু আপার বিয়ে ? বুঝি একটি আর্তচীৎকার বেরিয়ে এল মালুর গলা ছিঁড়ে। রাবু একবার চোখ তুলে চাইল, যেন বলল—চুপ।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এল রাবু। গোসলখানার দিকে মোড় নিল। দুহাত মেলে ওর পথটা আগলে দাঁড়াল আরিফা। উন্মাদ ব্যাকুলতায় চেঁচিয়ে উঠল আরিফা : তুইও কি পাগল হলি রাবু ? ওই বুড়োটাকে বিয়ে করবি তুই ? চালচুলো আছে ওর ? আর আমি হলফ করে বলছি ও ব্যাটার নিশ্চয় বউ রয়েছে কয়েক জোড়া। শেষে কি সতীনের পানি টানবি তুই ? রাবুর কোমরটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আরিফা।

ছাড় বড় আপা। কেমন বিরক্তমাখা রাবুর কণ্ঠ।

না কথ্‌খনো না। চল্‌, ঘরে খিল এঁটে শুয়ে পড়ি আমরা। তুই রাজী না থাকলে কখনো হতে পারে বিয়ে ?

তুই তো বলছিস বড় আপা। কিন্তু আব্বা ক্ষেপলে কি কাণ্ড বাধাবে ভেবে দেখেছিস ?

ক্ষিপ্ত দরবেশ যে কি অনর্থ ঘটাতে পারে যে কাহিনী শুনেছে ওরা। এত শুনেছে যে মনে হয় ওদেরই চোখের দেখা ঘটনা। সে বছর দশ আগের কথা। রাবু আরিফা ছোট্টটি তখন ঘর ছাড়া হয়েও দরবেশ তখন বার দুই ঘুরে গেছে বাকুলিয়ায়।

সেই উন্মত্ত রাতে দরবেশের রাগের কি যে কারণ ঘটেছিল জানেনা কেউ। শুধু কয়েকটা কথা কাটাকাটি, তারপর গোটা দুই লাথি। পরদিন একটি মরা ভাই এল রাবুর। দুদিন বাদ রাবুর আম্মাকেও গোর দেয়া হয়েছিল। সে কাহিনী স্মরণ করে আজও রাবু আরিফা শিউরে ওঠে।

তবু বলল আরিফা : যা খুসি দরবেশ চাচা করুকগে। তুই শুধু বলবি—না, আর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবি চল। আরিফা ওকে টেনে নিয়ে যায় ঘরের দিকে।

আহা, ছাড় বড় আপা। এক ঝটকায় ছুটে যায় রাবু।

তবে মর হতভাগী। থপ থপ করে পা ফেলে চলে যায় আরিফা। তারপর কাঁদতে বসে। অনেকক্ষণ থেকেই রাবুকে বিরত করার চেষ্টা করেছে আরিফা। ব্যর্থ হয়েছে। ও আর পারে না। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরবে বলে যে কৃতসংকল্প তাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে ও। কিন্তু রাবু কি জানে কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে ও?

মাঝ রাতে কলেমা পড়ে নিকাহ্ হয়ে গেল রাবুর।

শুধু ঢিপ ঢিপ করে মালুর বুকটা। একি কাণ্ড ওর চোখের সুমুখে।

দেওয়ানা হলেও বৈষয়িক বুদ্ধিতে বুঝি কম যায় না ওরা। খবর দিয়ে কাজী আনিয়েছে। কাজির দস্তখতে পাকাপোক্ত হয়েছে বিয়ে। কাবিন তৈার হল। রসুলে করিমের অনুকরণে দেনমোহর ধার্য্য হল নামমাত্র, এক টাকা পাঁচ পয়সা।

নামাযের চৌকিতে সেই যে শুয়ে ছিলেন, শুয়েই ছিলেন সৈয়দ গিন্নী। অবাক হচ্ছিল মালু। ইচ্ছে করলে তিনি, একমাত্র তিনিই দরবেশকে ধমকে দিতে পারেন, দুঘর প্রজাকে খবর পাঠিয়ে ওই মস্তানাগুলোকে খেদিয়ে দিতে পারেন বাড়ি থেকে। অথচ তিনি নির্বাক। রাবু না হয়ে যদি হত আরিফা, অমন নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন সৈয়দ গিন্নী? কথাটা হঠাৎ মনে হল মালুর আর সৈয়দ গিন্নীর উপরই ওর মনের যত রাগ গিয়ে স্তূপাকৃত হল।

কিন্তু কাবিনের কথা শুনেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন সৈয়দ গিন্নী। যেন বলক খেয়ে উঠল তার খানদানী রক্তটা। দেওঁরের কাছে রীতিমত কৈফিয়ত চেয়ে বসলেন : এ সব বিয়ে সাদির ব্যাপার, ফাজলামো, না ইয়ার্কি? কোন্ কালে, কে শুনেছে সৈয়দ বাড়ির মেয়েদের কাবিন তিরিশ হাজারের নীচে? দেওর নিরুত্তর। অতএব দেওরকে ছেড়ে বুজুরগ্‌কে নিয়ে পড়লেন সৈয়দ গিন্নী।

বুজুরগ্ নির্বিকার। কাবিনের অংক নিয়ে এমন ঠেলাঠেলি, বাদানুবাদের ঝামেলা অনেকবারই হয়ত পোহাতে হয়েছে তাকে। মিঞা-বিবির কবুল যখন হয়েই গেছে তখন আর ভাবনা কি!

চল্লিশ হাজারের কম দেন মোহরে সৈয়দ বাড়ির মেয়ে কেউ ছুঁতে পারবেনা, পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আমি। বুঝি চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন সৈয়দ গিন্নী।

কিন্তু কলেমা খতম। উভয় পক্ষেরই সই পড়ে গেছে কাবিন নামায়। দেওয়ানারা তাই একটুও বিচলিত হল না সৈয়দ গিন্নীর চরম নোটিশে। দস্তখত করা কাবিননামাটা ভাবীর চোখের সুমুখে মেলে ধরলেন দরবেশ দেওর। একবার দস্তখত করা কাবিনের উপর চোখ বুলিয়ে সেই নামাযের চৌকিতেই আবার শয্যা নিলেন সৈয়দ গিন্নী।

মুখ টিপে টিপে মিষ্টি মিষ্টি হাসত সেই মেয়েটি। চৌদ্দ বছরের রাবু। মৃতা মায়ের বিয়ের সাড়ি বেনারসী আর বিয়ের হার বিছে হারখানা পরে ও এল বাসর ঘরে। পিতার বৃদ্ধ পীরের আলিঙ্গনে ও পেল নারীত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা। হয়ত শেষ। পুরুষ অভিজ্ঞতা হয়ত আর কখনো আসবে না ওর জীবনে। হয়ত চিরকালের জন্যই ওর অচেনা থেকে গেল পুরুষের সেরা সম্পদ, যৌবন নামের সেই পরম বিস্ময়।

সবে সকাল হয়েছে।

সূর্যটা মাটি ছেড়ে মাত্র কয়েক হাত উপরে উঠে এসেছে।

আল ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় উঠল ওরা।

ইস্, ধকল কি কম গেল? হাঁটাই বা কম হল কি! আমার তো গা হাত পা টনটন করছে। দিন দুই কোন কথা নয়, স্রেফ ঘুম। কথাটা শেষ করে সেকান্দরের মুখের দিকে তাকায় জাহেদ। বলে আবার: মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে নাও তুমি, নইলে স্কুল কামাই করছি, ছেলেদের ক্ষতি হচ্ছে; এসব খুঁতখুঁতি যাবেনা তোমার মন থেকে। ছুটি নিলে বিবেকটাও তোমার সাফ থাকবে, কাজও হবে ভাল।

আচ্ছা দেখি, সংক্ষেপে বলল সেকান্দর।

কি দেখবে, সে সম্পর্কে বুঝি নিশ্চিন্ত হবার জন্যই ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জাহেদ। তার পর পাল্টিয়ে দিল প্রসঙ্গটা। যাই বল বড় জাঁহাবাজ ওই কংগ্রেসী মৌলভিগুলো। ওদের বোঝায় কার সাধ্য। কিন্তু এখনো ওদের মিটিংয়ে লোক জমে এটা যে কেমন করে সম্ভব হয় আমি বুঝতে পারি না!

ওদের কেউ কেউ সেই খেলাফতে, তারপর সেই তিরিশের যুগে জেল-ফেল খেটেছে। হয়ত তাই। তোমাদের তো সে সব বালাই নেই। কেমন বাঁকা শোনাল সেকান্দরের স্বর।

আরে রাখ। বানের তোড়ে কোথায় সব ভেসে যাবে, দেখ না?

মুশকিল হল লীগের নামটা এখনো পৌঁছায়নি অনেকের কাছেই। কিন্তু, আমি তো যতই ঘুরছি ততই উৎসাহিত হচ্ছি। আমাদের শত্রু যে একনয়, আমাদের শত্রু যে দুই—এক ইংরেজ, দোসরা হিন্দু বেনিয়া মহাজন, তুমি কি মনে কর এ কথাটা বুঝতে মুসলিম সমাজের খুব দেরী লাগবে? ওই গাদ্দার গুলোকে চিনতে খুব বেশী সময় লাগবে?

তা তোমার মত লোকেরা যখন উঠে পড়ে লেগেছে তখন বেশি দেরি হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সেকান্দরের উত্তরটা একটুও ভাল লাগে না জাহেদের। এখনো কোথায় যেন ওর দ্বিধা, সংকোচ। আর ফাঁক পেলেই একটু তেড়া কথার খোঁচা মেরে জাহেদকে আঘাত দিতে বাধেনা ওর। কেন? ওর গ্রাম বাকুলিয়ার আর সমাজের নাড়ির স্পন্দনটা কি এখনো পড়তে পারছে না সেকান্দর মাষ্টার?

কেন যে এত সন্দেহ তোমার, আমি বুঝি না। শুধাল জাহেদ।

উত্তরে শুধু বোঁচকাটা বগল বদলে নিল সেকান্দর। বলল না কিছুই।

এই সকাল বেলায় মাটির রাস্তাটা কেমন নরম আর ঠাণ্ডা। রাতের বিশ্রাম পাওয়া পথের উপর যেন লেপে রয়েছে কি এক কোমল শ্রী। সেই কোমলতাটা পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চলতে সুন্দর একটি ভাল লাগায় রোমাঞ্চিত হতে চায় শরীরটা, মনটা। মাটির সাথে গভীর এক অন্তরঙ্গতা-বোধ স্বর তুলতে চায় নাড়িতে, গান হয়ে বাজতে চায় কণ্ঠে। কিন্তু মাঠটার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিমেষের মাঝেই উধাও হয়ে যায় জাহেদের সেই ভাল লাগার অনুভূতিটা।

খাঁ খাঁ করছে মাঠ। এখানে সেখানে পোড়া সবুজের মর্মন্তুদ কান্না।

এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি। যাদের তাড়াহুড়ো তারা তখুনি জলদি জলদি দুটো চাষ দিয়ে ধান ছিঁটিয়েছিল। কিন্তু, অন্যরা জানে—প্রথম বৃষ্টিতে একটা চাষ দিয়ে মাটির বাঁধুনী দাও খুলে, পরের বৃষ্টিতে পানি খেয়ে মাটি যখন ভুর ভুর করবে তখন ছিঁটোবে ধান, ফসল পাবে দ্বিগুণ। তাই অপেক্ষা করে আছে ওরা।

কিন্তু বৃষ্টি আর কৃপা করেনি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুধু তেঁতে চলেছে ক্ষেতের মাটি। যারা ধান বুনেছিল তাদের ক্ষেতের দগ্ধ সবুজ আতংক জাগায় মনে। আর যারা প্রথম বর্ষাতে লাঙ্গলের ফলায় মাটিটাকে শুধু উল্টে রেখেছে তাদের বন্ধ্যা ক্ষেতগুলো তপ্ত ধুলো আর ধূসর রুক্ষতা মাখিয়ে

অমঙ্গলের ছাওয়া ছাড়ছে লোকালয়ের দিকে। একেবারে আ-চষা ক্ষেত-গুলো ফাটল তুলেছে বিরাট, যেন বিদীর্ণ বক্ষের কোন আকুতি মেলে চেয়ে রয়েছে নির্দয় আকাশের দিকে। কখন দয়া হবে আকাশের, কখন পানি পাঠাবে ফাটলের পিপাসা মিটবে।

সেকান্দরের চোখেও দগ্ধ সবুজের আতংক। ও বলল, দেখেছ? এখানো বৃষ্টি হলনা। লোকগুলো এবছরও উপোস মরবে।

কী যে হয়েছে জাহেদের। রোদপোড়া দীর্ণবুক ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যে আশংকা ওর মনে জেগেছে তাই তো প্রকাশ পেয়েছে সেকান্দরের কণ্ঠে, অথচ খিঁচিয়ে উঠল জাহেদ: গত বছর মরেছে, তার আগের বছর, তারও আগের বছর, সব সময়ই এরা মরছে। এ বছরও মরবে, সামনের বছরও মরবে। দ্যাট ইজ হোয়াট দে ডিসার্ভ, ইউ ডিসার্ভ। নির্বিবাদে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোন্ কাজটা করতে পার তোমরা?

সেকান্দর বুঝল একটু আগে যে খোঁচাটা দিয়েছে সে, এ তারই পাল্টা বিস্ফোরণ। ক্ষুণ্ণ হল সেকান্দর। কিন্তু ভেতরটা ওর কী এক অপমান বোধে জ্বলে উঠল। বলল, এ মৃত্যুকে আমি রুখব। অমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণ-জয়ের ডঙ্কা বাজাব, সবাইকে শোনাব মৃত্যুহীনের ডাক। যেন ঠোক্কর খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জাহেদ। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সেকান্দরের দিকে। এমন সংকল্পের দৃঢ়তা, এমন প্রত্যয়ের ডাক কখনো শোনা যাবে তালতলির স্কুলের জুনিয়ার মাষ্টার সেকান্দরের কণ্ঠে, জাহেদের কাছে এ ছিল অভাবনীয়। কিন্তু যতটা খুশি হল তার চেয়ে বেশি শংকিত হল জাহেদ। কেননা ও জানে অনুভূতির এই তীব্রতা মাষ্টারকে নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও, স্বদেশীদের খপ্পরে, নতুবা শ্রেণী সংগ্রামের পথে। আর দু দুটোকেই পরিহার করে চলে জাহেদ।

মরণজয়ের ডংকা বাজাও, সে তো আমারও কথা। কিন্তু কিসের জন্য? মুক্তির জন্য।

কার মুক্তি? শুধাল জাহেদ।

রোদে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকালমৃত্যু যাদের কপালের লিখন, তাদের মুক্তি।

হিন্দুস্তানের সকল মুসলমানই কি তোমার এই সংজ্ঞায় পড়েনা?

না। বলেই কি এক কৌতুকে হেসে দিল সেকান্দর। হাসতে হাসতেই বলল, আবার, অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার। তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, সৈয়দপুত্র তুমি,

মাতুল ফেলু মিঞা আর লেকু, ফজর আলী তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে, বঞ্চিতের দলে, হা হা হা।

চুপ কর। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ।

ওর চীৎকারে চমকে দুপা পিছিয়ে গেল সেকান্দর। ভয় পেল। জাহেদের এমন ক্রুদ্ধ মূর্তি আগে কখনো দেখেনি ও।

ওরা নিঃশব্দে হাঁটছে, রাস্তার দুপাশ ধরে, পরস্পর থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে। ওরা এখন বন্ধু নয়, ওরা যেন দুই শত্রু শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, মুখোমুখী মোকাবিলার পূর্বে নীরব প্রস্তুতি চলছে ওদের।

সেকান্দরের দৃষ্টিটা নীচে মাটির দিকে। জাহেদের চোখ সেকান্দরের দিকে। চোখ নয় যেন দুটো বিশ মাখা তীরের ফলা, বিধেঁ ফুঁড়ে একাকার করে চলেছে সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠা এককালের নিরীহ মাষ্টারকে।

তুমি জান কি করে এ জমি গড়ে উঠেছিল? আবার ঝলসানো ক্ষেতের দিকে চোখ ফেরাল জাহেদ। জান? যাদের হাতের মায়া আর শ্রমের ছোঁয়া পেয়ে এ জমি শস্যময়ী হয়েছিল তারা আর এ জমির কেউ নয়? জানি।

জান ইংরেজ আসবার আগে এ অবস্থা ছিলনা?

উল্টো দিক থেকে এবারও ভেসে আসে সেই ক্ষুদ্র কিন্তু আক্রমণাত্মক জবাব, জানি।

দিনে দিনে ক্ষয় পাচ্ছে জমির উর্বরা শক্তি। অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টির খামখেয়ালী তাণ্ডবে হাহাকার জাগছে ঘরে ঘরে। জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য নেই দেশে। সর্বত্র এই অভিযোগ। কিন্তু আমি বলি এটাই তো স্বাভাবিক, এ-ই তো বিদেশী শাসন আর শোষণের পরিণতি। ইংরেজ কি তবে বেহেশ্‌ত বানাবার জন্য এসেছে এদেশে? ঠুক ঠুক পেরেক ঠোকার মতো করেই যেন কথাগুলো সেকান্দরের মাথায় ঢোকাতে চাইল জাহেদ।

সে তো বুঝলাম—

বুঝেছ কচু। বুঝলেই যদি তবে কেন গোটা জাতির কথা ভাবছনা। বুঝতে পারছ না, পরপদানত কোন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা, আজাদী? কারণ তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজ বিতাড়ন। আমার কাছে তার অর্থ আরও ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জমি রুটি রুজি জীবনের নিরাপত্তা। চাপা দৃঢ়তায় উত্তর দিল সেকান্দর।

রাবিশ। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ আর ছিনিয়ে নিল সেকান্দরের বগলের বইগুলো, ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। চেঁচিয়ে চলল, এই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। তোমার

সাবধান করে দিচ্ছি সেকান্দর, তালতলির ওই হিন্দু মাষ্টারগুলো থেকে দূরে থেকো, রাজনীতিটা বুঝবার আগেই তোমার মাথায় একগাদা পোকা ঢুকিয়েছে ; এরপর আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

সেকান্দর নীরবে বইগুলো কুড়িয়ে নেয়। নীরবেই পথ চলে।

সহসা দু হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা। তারপর তীরের মত ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল, তুমি মুসলমান কিনা ?

না।

তবে তুমি কী !

মানুষ।

অপমান বোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই ?

না তুমি মুসলমান।

আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।

সে জন্যই কি অমন বর্বরের মত আচরণ করছ ? গলাটা ছাড় তো এবার। যেন বিরক্ত হয়েই বলল সেকান্দর।

আমি মুসলমান। আমি মুসলমান। এ পরিচয়ে আমার গৌরব, অগৌরব তো নয়ই। বলতে বলতে মাথাশুদ্ধ সেকান্দরের গলাটাকে দোলনার মত একবার পেছনে ঠেলল, আবার সামনে টানল, তারপর ছেড়ে দিল মুঠিটা। দুজনই ওরা পরিশ্রান্ত। রাস্তার মাঝেই ওরা বসে পড়ল। আর ফোঁস ফোঁস হাঁপিয়ে চলল।

ভুল করছ জাহেদ, ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

শ্রান্ত কিন্তু কি এক হিংস্র চোখে ওকে নিরীক্ষণ করল জাহেদ। মুখ খুলল না। মুখ খুলল অনেকক্ষণ পর।

তা হলে তুমি মুসলিম লীগ করছ না ?

করছি। সংক্ষেপে বলে উঠে দাঁড়াল সেকান্দর।

এখুনি তো তোমাকে স্কুলে ছুটতে হবে। চল আমাদের বাড়ি। গোসল করে কিছু খেয়ে নাও।

চল।

রাস্তা ছেড়ে বাড়ির উঁচু মাঠে উঠে এল ওরা।

কাছারি ঘরের ময়দানে উনুনের কয়লা তখনো জলছে। আধপোড়া কাঠ ধোঁয়া ছাড়ছে। একমণি দুমণি ডেগগুলো উনুনের চার পাশে, কোনটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, কোনটা বা ঢাকনি দেয়া। রাতের ভোজের ইতস্ততঃ ছড়ানো কলাপাতাগুলোর মতোই এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত মস্তানার দল। পুকুরের শান বাঁধাই চত্বরে কেউ ঘুমোচ্ছে অঘোরে, কেউ হাই তুলছে কাছারি বারান্দায়, কেউ বা সটান ঘরের লম্বা ফরাশে। কেউ চোখ বুজে হুঁকো টানছে।

ওদের চিনতে কষ্ট হল না জাহেদের। সেকান্দারের পিঠে একটা খুসির কিল বসিয়ে বলল ও: বরাত ভাল হে! বিরিয়ানী-ফিরিয়ানী, বাসি হলেও কিছু জুটে যাবে মনে হচ্ছে।

কাছারি ঘর ছেড়ে দেউড়ির কাছাকাছি এসে যেন আপন মনেই আবার বলল জাহেদ: চাচার সাঙ্গো পাঙ্গোর দলটা এবার বেজার ভারি। ব্যাপার কি? দেউড়িটা পেরিয়ে প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের উল্টোপার লম্বালম্বি বারান্দাটানা বড় দালান। জাহেদকে দেখেই বারান্দার কোন্ ঘুপচি থেকে ছুটে আসে মালু। এসেই ঝর ঝর কেঁদে দেয়।

কি রে, কি হল? ওর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করে জাহেদ।

আঙ্গুলের ইশারায় বারান্দার উত্তর কোন্‌টা দেখিয়ে দেয় মালু। সেখানে বদনার সরু নলে পানির চিকন চিকন ধারা ঢালছে বাড়ির চাকর। ওজু করছে নতুন জামাই। ভিজে হাতের তালুজোড়া কলপ দেয়া বাবরির উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে তায়াম্মুমের জন্য মাথাটা উঁচু করতেই চোখাচোখি হয়ে যায় জাহেদের সাথে।

কে রে? অবাক হয়ে শুধাল জাহেদ।

রাবু আপার বর। সংক্ষেপে বলে সার্টের খুঁটে চোখ মুছল মালু।

বর? রাবুর বর? কে বলেছে? বুঝি বিশ্বাস করতে চায় না জাহেদ। কান্নাটা সামলে নিয়েছে মালু। গড় গড় করে বলে গেল আজব রাতের কাহিনী।

নতুন জামাই এবার পাটা বাড়িয়ে দিয়েছে বদনার নলের নীচে। প্রত্যেকটি নখে আলাদা আলাদা করে পানির ধারা নিচ্ছে। আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হাতের আঙ্গুল চালিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে। ঠোঁট তার নড়ছে মৃদু মৃদু। ওজুর দোয়া

পড়ছে বুজুরগ্ জামাতা। সে ফাঁকেই চোখটা তার এদিক ওদিক ঘুরে জাহেদের মুখের উপর এসে ক্ষণকাল স্থির হয়ে রইল। নড়ল না। কাঁপল না। জাহেদের মনে হল ধূর্ত শৃগালের কোন চতুর ইঙ্গিত যেন হেসে উঠল সেই চোখে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। তারপরই কি এক অবজ্ঞার উদাসীনতা ছড়িয়ে সরে গেল চোখ জোড়া।

এবার বুঝি বিশ্বাস হয় জাহেদের। আর সেই মুহূর্তে ওরা শরীরের রক্ত ধারাটা যেন বলক খেয়ে টগবগিয়ে উঠল, সমস্ত রক্ত যেন উঠে এসেছে ওর মাথায়। লম্বা পায়ে উঠোন ডিঙিয়ে দাওয়ায় ওঠে এল জাহেদ।

কি আম্মা! কী সব শুনছি?

আম্মার যেন বলার কিছু নেই। নীরবে তসবির ছড়া গুনে চলেছেন তিনি।

কিরে আরিফা, কি হয়েছে বল্ না!

সবে ঘুম ভেঙ্গেছে আরিফার। চোখ কচলাচ্ছে। ভাল করে তাকাতে পারছে না ও। সেই অবস্থাতেই বলল, দরবেশ চাচা……শেষ করতে পারে না ও। কোথায় দরবেশ চাচা, খেঁকিয়ে উঠেছে জাহেদ।

যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর চেঁচামেচি করিসনে বাপু। ছেলে চাচার সন্ধান করছে দেখে অবশেষে মুখ খুললেন সৈয়দ গিন্নী।

হয়ে গেছে মানে? জাহেদের চড়া স্বরটা গুম গুম করে ঘরের দেওয়ালে। আমরা কত বললাম, মেজো ভাই। কিন্তু……আরো কিছু বলতে চায় আরিফা। তার আগেই ফেটে পড়েছে জাহেদের ক্রুদ্ধ গলাটা: কী করেছিস তোরা! লোকজনের কি অভাব ছিল গ্রামে? ঠেঙিয়ে বের করে দিতে পারলিনা বাড়ি থেকে?

ছিঃ। বলেনা ওসব কথা, নতুন জামাই শুনবে যে। প্রমাদ গোনেন সৈয়দ গিন্নী। নেমে আসেন নামাযের চৌকি ছেড়ে।

কাঁথা পুড়ি নতুন জামাইর। খিঁচিয়ে ওঠে জাহেদ। এদিক ওদিক কি যেন খোঁজে ও।

তা তার মেয়ে যদি সে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দেয় আমরা কেমন করে ঠেকাব? শুনলে ত আমাদের কথা? আর মেয়েটিও যেমন, বাপ বলতে এক পা। বাপ বলেছে, ব্যাস, কার কথা শোনে ও…

সৈয়দ গিন্নীর পুরো কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করেনা জাহেদ। দৌড়ে বেরিয়ে আসে উঠোনে। সেকান্দরকে টানতে টানতে চলে যায় দেউড়ির দিকে।

মুন্সিজী কোথায় ?

জি, উনি মসজিদে। মালুর হয়েই জবাব দিল বাড়ির চাকর।

মুন্সিজী গোঁড়া সুন্নী। সহি হাদিসের বাইরে এক কদম চলতে নারাজ তিনি। ফুঁকফাঁক তুকতাকের ঘোর বিরোধী। চিশতিয়া নকশ্‌বন্দিয়া মাইজভাণ্ডারি ইত্যাকার মত তরীকার তীব্র সমালোচক তিনি। তাই দরবেশ বাড়ি এলেই আপন মেজাজ এবং ইমান, দুটোরই নিরাপত্তার জন্য আত্মগোপন করেন তিনি। এবারও কম্বলধারীদের শোভাযাত্রাটা দূর থেকে দেখেই মিঞা বাড়ির মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মুন্সিজী।

বেশ, তুই এক কাজ কর। লেকু, ফজর আলী, রহমত, ট্যাণ্ডল বাড়ি আর সারেং বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, এক দৌড়ে। চাকরটাকে হুকুম দিয়ে এদিক ওদিক তাকায় জাহেদ, কি যেন খোঁজে। দেউড়ির পেছনে নজরে পড়ে চেলা কাঠের স্তূপ। তারই পাশে মাটির ঢেলা ভাংবার কয়েকটা মুগুর। দুটো মুগুর তুলে নিল জাহেদ। একটা সেকান্দরের হাতে দিয়ে বলল: শক্ত করে ধর। আমার দেখাদেখি ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলবে। শুধু প্রাণে মরবে না কাউকে।

আরে, মারামারি করবে নাকি ?

আরে, চল না। ওকে এক ধাক্কায় সামনের দিকে ঠেলে দেয় জাহেদ। বাবারা, খোদার খাসিরা—ওই যে সড়কটা দেখছ সোজা ওই পথে গিয়ে ওঠ। টুঁ টাঁ করেছ কি……। কি সেটা মুখে না বলে মুগুরটা ওদের মাথায় উপর দিয়ে বার কয় ঘুরিয়ে আনে জাহেদ।

হয়ত অসাবধানেই কারো কলকেতে লেগে যায় মুগুরের আগাটা। সাজান কলকেটা মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়। কারো বা হুঁকোটা কাত হয়ে পড়ে যায়। গল গল করে বেরিয়ে যায় বাসি হুঁকোর পিঙ্গল পানি। ভিজে যায় ওদের ফরাস।

এমন অতর্কিত অভদ্রতার জন্য প্রস্তুত ছিলনা ওরা। ভুরি ভোজনের পর যে ঘুম, সে ঘুমের মিঠে মৌতাত এখনো লেগে রয়েছে ওদের চোখে।

শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর, জলদি ভা-গো। একটু আড়মোড়া ভাংবার সময় দিতেও নারাজ জাহেদ।

টেবিল চেয়ারগুলো এক কোণে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। পর পর কয়েকটা চেয়ার তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারল জাহেদ।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মস্তানার দলে।

এরি মাঝে কে যেন প্রতিবাদ করে ওঠে। নিমেষের মাঝেই মুগুরটা নেমে আসে ওর গর্দানে। কোঁত করে বসে পড়ে অসহায় মস্তানা।

এঁ্যা আপনি পয়গম্বরের উম্মত নন? এ ভাবে অপমান করছেন মেহমানদের? বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে আর এক বেপরোয়া মস্তানা।

ও—রে আমার মেহমা—ন—রে! বে-রো, বে-রো, মুগুরটা উঁচিয়ে দৌড়ে যায় জাহেদ।

পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। ওরা ছুটে যায় রাস্তার দিকে। একমাত্র সম্বল কম্বলটাকে প্রাণপণে আকড়ে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে গিয়ে কেউবা হোঁচট খেয়ে বসে পড়েছে, কেউ বা গড়িয়ে পড়ছে পাশের শুকনো নালায়।

মালু, সেকান্দর, বিশ্বাস নেই ওদের, দৌড়াও পিছু পিছু। একেবারে গাঙ পার করিয়ে তবে ফিরবে। বাড়ির চাকরগুলোকেও মস্তানাদের ধাওয়া করতে বলে দিল জাহেদ। ততক্ষণে লেকুর দলটা এসে গেছে। ওদের নিয়ে অন্দর বাড়িতে ফিরে এল জাহেদ। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল কাছারি বাড়িতে তার খবরটা বুঝি পৌছায়নি এখানে। অথবা পৌছালেও অটল বুজুরগ্। বিভিন্ন শ্বশুর বাড়ির বিভিন্ন আর বিচিত্র আর বিচিত্র ধরণের আপ্যায়নের সাথে নিশ্চয় পরিচয় তার দীর্ঘদিনের।

দস্তরখান পাতা হয়েছে ঢাকা বারান্দায়। একটা একটা করে নাশতার রেকাবিগুলো এসে জমেছে সেখানে। রেশমি গালিচায় আসন নিয়ে দেওয়ালের দিকে ঈষৎ হেলে রয়েছে নতুন জামাই। চোখ বুজে মোগলাই ব্যঞ্জনের খোশবু টানছে হয়ত। বুজুরগ্ মানুষ। অতএব আহারটাও তার এবাদতের অঙ্গ। হয়ত তাই এতক্ষণ ধরে ওজুর ঘটা চলছিল।

ওই যে বসে আছে বাবাজী। পাঁজা কোলা করে তুলে ফেলবি। রহমতের গাড়িতে চড়িয়ে সোজা ষ্টেশনে নিয়ে যাবি। টিকেট কেটে চড়িয়ে দিবি রেল গাড়িতে। গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেলে তবে ফিরে আসবি। লেকুর দলকে হুকুমটা দিয়ে উঠোনেই অপেক্ষা করে জাহেদ।

যেন ছোঁ মেরে অত বড় শরীরখানা ওরা তুলে নিল কাঁধের উপর। সতর্ক হবার, একটু সজাগ হবার সামান্য সুযোগও পেল না বুজুরগ্। কিন্তু হলে কি হবে বুড়ো, বেশ ওজনী বুড়ো। রীতিমত শক্তি ধরে। দুই জোয়ানের অমন ভার-সওয়া কাঁধেও মট করে শব্দ হল, একটু ক্ষণের জন্য কুঁজো হয়ে এল ওদের পিঠ। ততক্ষণে বুঝি শ্বশুর বাড়ির এই বিচিত্র তামাসার অর্থ ধরে ফেলেছে

জামাতাজী। হাত পা ছোঁড়ে জামাতাজী। প্রায় ফসকে পড়ে যায় ওদের কাঁধ থেকে। কিন্তু পা আর গলার দিকটা ওরা শক্ত করে ধরে রেখেছে, পড়বার জো নেই। তবু গোটা শরীরটা কাঁপিয়ে তুলিয়ে গির গির আলোড়ন তুলে যায় জামাতাজী। শেষে প্রচণ্ড হিংস্রতায় কামড় বসিয়ে দেয় ফজর আলির কাঁধে। সেই হিংস্র কামড়ে বুঝি এক্ষুনি উঠে আসবে ফজর আলির কাঁধের মাংস। নিরুপায় হয়ে ডান হাতটাকে ঘুরিয়ে জামাতাজীর গালে জোর একটা ঘুসি বসিয়ে দেয় ফজর আলি।

কেয়া বাত জী, কেয়া বাত আ-জী। কেয়া কসুর, কেয়া কসুর। প্রথমে লঘু স্বরে, তারপর চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায় নতুন জামাই। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে তার প্রতিবাদ।

বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে আসে ওরা।

ছুটে আসে দরবেশ। এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ঘরের ভেতর। দরবেশ আগলে দাঁড়ায় ওদের পথটা—ছাড় ছাড়্, হারামজাদা বেতমিজ, শীগ্গীর ওনাকে ছেড়ে দে বলছি।

চাচা, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। বুঝি বজ্রের আওয়াজ জাহেদের কণ্ঠে। ভাইপোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তিম চোখ দুটো একবার শুধু ঘুরিয়ে আনল দরবেশ। বুঝি থমকে রইল মুহূর্ত খানিক। সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ গলায়—বেয়াদব বেতমিজ বেশরম বেলায়েক, এ বাড়ির কর্তা আমি না তুই ? তারপর এগিয়ে এসে এলোপাথাড়ী ঘুসি কিল থাপ্পড় বসিয়ে দিল লেকুর পিঠে। থর থর কাঁপছে দরবেশ। অন্ধের মত হাত পা চালাচ্ছে চলমান লেকুর পিঠে। সে আঘাতে আর কাঁধের উপর প্রায় চারমণি ওজনের জামাতা মিঞার দাপাদাপিতে বুঝি ভেঙ্গে যাবে লেকুর শিরদাঁড়াটা।

নিমেষের মাঝে একটা কারবালার কাণ্ড ঘটে গেল উঠোনে। দরবেশকে আড়াপিছা করে ধরে ফেলেছে জাহেদ। হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন সৈয়দ গিন্নী। রাবু এসে ওদের সুমুখে গড়িয়ে পড়ল, মাথা কুটতে লাগল উঠোনের মাটিতে : মেজো ভাই, পায়ে পড়ি তোমার। আব্বার দিলে কষ্ট দিও না। অনেক কষ্ট আব্বার। ছেড়ে দাও আব্বাকে, ছেড়ে দাও।

এই হুরমতি, দড়ি আন্ জলদি, চীৎকার করে উঠে জাহেদ।

দেখছ দেখছ শুয়োরের কাণ্ড। মুরুব্বীর গায়ে হাত দিলি তুই। জাহান্নামে যাবি, দোজখে পুড়বি তুই। জাহেদের শক্ত বাহুর বেষ্টনে ঝুটোপুটি খায় দরবেশ।

ওদিকে দরবেশের লাথির চোটে হাতের বাঁধনটা বুঝি একটু শিথিল হয়েছিল লেকুর। সেই ফাঁকে জামাতাজী মুক্ত করে নিয়েছে পা জোড়া। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ পদাঘাতে ছিটকে পড়েছে লেকু।

কিন্তু, জামাতাজীর মাথা আর গর্দানটা তখনো আটক ফজর আলির বাজুর বন্ধনে। পা জোড়া মাটিতে ঠেকিয়ে একবার পলট খেল জামাতাজী। সঙ্গে সঙ্গে আলগা হল ফজর আলীর হাত জোড়া। মাথাটা মুক্ত করে টান হয়ে দাঁড়াল নতুন জামাই।

ক্ষিপ্র হস্তে দরবেশের হাত দুটো পেছনে এনে বেঁধে ফেলল জাহেদ। মাটিতে শুইয়ে হাতে পিঠে জড়িয়ে দড়িটাকে তিন চারটি প্যাঁচ কষে শক্ত করে গিট বেঁধে দিল ও।

দোহাই তোমার মেজো ভাই, আব্বাকে বেঁধোনা অমন করে। এত নিষ্ঠুর তুমি? ও, মেজো ভাই। রাবু এসে ধরে ফেলল জেহাদেব হাত দুটো। ঠিক সেই মুহূর্তেই জামাতাজী কুড়িয়ে নিয়েছে জাহেদেরই ফেলে রাখা মুগুরটি। শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে দুর্বিনীত শ্যালকের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে জাহেদের কপাল ফেটে। বাঁ হাত দিয়ে রক্তের ফিনকিটা চেপে ধরে জাহেদ। চেঁচাতে গিয়ে ফাটা বাঁশের মতো শব্দ ওঠে ওর গলা দিয়ে। কোন রকমে বলে, ওহ্? ছেড়ে দিলি ভণ্ডটাকে? ধর শীগ্গীর। নিয়ে যা স্টেশনে। জল্দি কর।

বিমূঢ়, স্তব্ধ হয়ে যায় লেকু। ফজর আলি ও। জ্ঞানটা ওদের লোপ পেয়েছে যেন। জাহেদের রক্ত জবজব বাঁ কপালটার দিকে একবারটি তাকিয়ে লেকু যেন ওর হারান শক্তিরই আরাধনা করল। অমন জোয়ান মরদ সে, না হয় কয়েকটা কোপই পড়েছে গায়ে, কিছু রক্ত ঝরে পড়েছে, তা বলে আজ হার মানবে সে? দার কোপে খাঁজ পড়া ওর পেশীগুলো যেন কী এক মন্ত্রবলে ফুলে ফুলে উঠল। অস্ফুট এক চীৎকারে হিংস্র নেকড়ের মত ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। শূন্যে তুলে নিল অশিষ্ঠ জামাতাজীর শরীরখানি। ফজর আলি এসে কাঁধ দিল। ওরা ছুটে চলল।

মস্তানা বাহিনীকে গাঙ পার করিয়ে ফিরে এসেছে মালু, সেকান্দর আর সারেং বাড়ির লোকেরা।

বিধ্বস্ত রণাঙ্গনটির দিকে তাদিকে সেকান্দরের চোখ বুঝি চড়কে ওঠে। আরিফা হুরমতি এমন কি রাবুও কান্না থামিয়ে থ মেরে রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রষ্টের মত কেমন শূন্য দৃষ্টি ওদের। একটি রাতের মাঝে কত কী যে ঘটে গেল!

আর এত দ্রুত, কোন লোমহর্ষক নাটকের ঘটনার মত। এতে কারই বা হুঁশ থাকে, দিশা থাকে।

পাশে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত করে চলেছেন সৈয়দ গিন্নী। তাঁর চেতনাটা এখনো বুঝি লোপ পায় নি।

একটু তুলো। অনেক কষ্ট করেই যেন বলল জাহেদ। বুঝি হুঁশ এল মেয়েদের। আরিফা দৌড়ে গিয়ে তুলো আর আইডিনের শিশি নিয়ে এল। রক্তগুলো মুছে নিল সেকান্দর। মাথার চুল সরিয়ে ক্ষতের উপর আইডিন মেখে দিল। তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ওকে নিয়ে এল ঘরে। বিছানায় শুইযে দিতে দিতে আপন মনেই বলে ও: এত অসহিষ্ণু তুমি। হুট করে কোনদিন কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে মরে থাকবে, আল্লাই জানে।

ওর আব্বার বাঁধনটি খুলে দেয় রাবু। অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়ে দরবেশ। কম্বলটা ভাল করে এঁটে নেয় কোমরে। তারপর ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি বিঁধে যেন এ ফোঁড় ও ফোঁড় গেল লজ্জায় নুয়ে থাকা মেয়েটিকে। কহর দিল ওকে : জাহান্নামে যাবি, জাহান্নামে যাবি। দোজখের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হবি, খাক হবি।

শুধু মেয়েকে অভিশাপ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হল না দরবেশ। এ বাড়ির সকলের বিরুদ্ধেই তার নালিশ। মুনাজাতের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুলল দরবেশ, কাঁপা কাঁপা গলায় ফরিয়াদ পাঠাল আল্লার দরবারে : ইয়া আল্লাহ, গজব নাজেল কর, গজব নাজেল কর। গোনাহ্‌গার শয়তানগুলোকে শাস্তি দাও তুমি। লা-নত ঢাল তুমি, লা-নত ঢাল। ছারখার কর এই শয়তানের আড্‌ডা।

চমকে ওঠেন সৈয়দ গিন্নী। দরবেশ এমন অভিশাপ দিল সৈয়দ বাড়ির উপর? তওবা তওবা, উচ্চস্বরে তওবা পড়তে থাকেন সৈয়দ গিন্নী। আব্বা আব্বা, আমাকে ফেলে চলে যাবেন? পিছু পিছু ছুটে আসে রাবু। কাছারির পেছনে এসে লুটিয়ে পড়ে আব্বার পায়ে। জড়িয়ে ধরে তাঁর পা জোড়া।

ঝুঁকে আসে দরবেশ। রাবুর এলো খোঁপার এক গোছা চুল মুঠোয় ধরে টেনে তোলে ওকে। উহ: উহঃ, চেঁচিয়ে ওঠে রাবু।

যন্ত্রণায় নীল রাবুর মুখ। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই দরবেশের। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর সে মুখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, উন্মানা হয় দরবেশ। চুলের মুঠিটা ছেড়ে দিয়ে দু হাতের কোলে রাবুর মুখটা টেনে নিল দরবেশ। অশ্রুর ধারা নামছে রাবুর গাল বয়ে। অশ্রু ভরা সে মুখের দিকে

নিষ্পলক চেয়ে থাকে দরবেশ। কি এক কোমলতা এসে সহসা যেন মুছে নিয়েছে দরবেশ-মুখের সেই ক্রুর কঠিন রেখাগুলো। স্নেহ মায়া আর মমতা, পার্থিব দুনিয়ার একান্ত মানবিক দুর্বলতাগুলো যেন ঘন এক ছায়া ফেলেছে দেওয়ানা চোখের কোলে।

দুটি মুহূর্ত, বুঝি দূর অতীতের কোন স্মৃতির মাঝে খুয়ে গেছে সংসারত্যাগী স্ত্রী-ঘাতী দেওয়ানা। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যই। আচমকা ওকে ছেড়ে দেয় দরবেশ। ধপ করে পড়ে যায় রাবু। জীবনে এই প্রথম পিতৃ স্নেহের স্পর্শটি পেতে পেতে হারিয়ে ফেলল ও।

খবিস খবিস। নাপাক, নাপাক। চাপা গলায় ঘৃণা ছড়ায় দরবেশ। থুতু ফেলে, হাতের দশটা আঙ্গুল একই সঙ্গে বাতাসের দিকে ছুঁড়ে মারে, যেন কোন অস্পৃশ্য ছুঁয়ে আপনাকে অপবিত্র করেছে দরবেশ। তারপর মিলিয়ে যায় কাছারির ওপারে।

শাখায় পাতায় পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। বড় বাড়ির বড় খবর। আলোচনা তার মুখরোচক।

ছিঃ ছিঃ আল্লাওয়ালা মানুষ ওরা। মেজো মিঞা পিটিয়ে পুটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল ওদের? সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে, আলেমের ঘরে জালেমের পয়দাস! মাবিয়ার ঘরে না এজিদের জন্ম?

আহা কি বুজুরগ্ আদমি। হার্মাদ না হলে কেউ অমন ওলি-আল্লাহ মানুষের গায়ে হাত তোলে? মেজো মিঞাটা যে নাস্তিক এতে কোন সন্দেহ আছে? নির্ঘাত আল্লাফাল্লা মানে না ছোকরা।

আহা কি নূরানী চমক চেহারার! কত এলেমদার। যে সে আদমী? দেওবন্দের কামিল মোহাদ্দেস। তাকে এমন অপমান?

আরে অপমান কি বলছ হে! মেরে মুরে হাড্ডি মাংস একসার করে বড় গাঙে ভাসিয়ে দিয়েছে। হয়ত মরেই গেছে। বেপারী বাড়ির ফজু বেপারী যে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। বিশ্বাস না করে উপায় আছে?

রমজানের বৈঠকখানায় বসে এমনি সব কথার পিঠে কথা ভেংগে চলেছে ওরা।

মাস কয়েক আগে ছোট্ট গোছের এই বাইর ঘরটি বানিয়েছে রমজান। দেশী

পালার গায়ে এখনো পঁচা পানির গন্ধ লেগে রয়েছে। বৈঠকটাও চালু হয়েছে হালে। রাতের বেলায় নেহাৎ মুনিবের ডাক না পড়লে মিঞা কাছারিতে আর হাজিরা দেয়না রমজান। কুপি জ্বালিয়ে খালি চৌকিটায় বসে ও। দু চারজন মাতবর, পেয়াদা কালু, ওরা আসে। পানটা তামাকটা নিজের হাতেই বাড়িয়ে দেয় রমজান। নিজের বৈঠকখানা হবে, সেখানে আড্ডা জমবে, পান তামাক চলবে, এটা অনেক দিনের সখ রমজানের। এতদিনে সে সখটা বুঝি পূরণ হল রমজানের।

মুনিব ফেলু মিঞার সাথে টেক্কা দেবার ইচ্ছে নয় তার। ফেলু মিঞার ডান হাতের যে মর্যাদা আর স্বীকৃতিটুকু একান্তই প্রাপ্য তার, শুধু সেইটুকু। এর জন্য পান তামাকের খরচাটাকে মোটেই বাড়তি খরচ মনে করেনা ও। এ ছাড়া যারা খাতক তারাও এই সময়টিতেই আসে। যার যা দেবার থোবার, এই বাঁধা সময় কাছারিতে আসবে তারা। রাস্তা ঘাটে কায়কারবারের কথা বড় না-পছন্দ আমার—নিয়মটা চালু করে দিয়েছে রমজান। তাই লোকের অভাব হয়না রমজানের মর্যাদার আসরে।

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনে চলছিল রমজান। এবার গলাটা বাড়িয়ে বলল : আরে, আরো আছে ব্যাপার, রহস্য আছে অনেক।

কুঁতকুঁতে চোখ দুটো পাকিয়ে থুঁতনির নীচে গলগণ্ডের মত ফোলা মাংসের দলাটা কেমন করে কাঁপিয়ে তোলে রমজান।

'বেফার' কি ? বলেই ফেল না। জিজ্ঞেস করে গ্রামের একমাত্র হাফেয, মাতবরও বটে।

তক্ষুণি তক্ষুণি কিছু বলে না রমজান। কালো ব্যাঙের পিঠের মতো খরখরে আর মোটা ঠোঁটখানা কিম্ভূত বেঁকিয়ে কেমন এক শব্দ তোলে ও। তারপর মাথাটাকে একেবারে হাফেযের কানের কাছে নিয়ে আসে, যেন এখুনি সাংঘাতিক এক গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়ে চমকে দেবে ওদের।

আরে দরবেশের এই যে মেয়ে, এটার সাথেই তো আমাদের মেজো মিঞার, ওই যে আজকাল কি বলে—'এশকে' না 'আশনাই', কিনা বলে, সেই কাণ্ড আর কি ? অবশেষে বলেই ফেলল রমজান।

তোবা তোবা, নাউজুবিল্লা, নিজের গালেই চড় মারেন খতিব সাহেব। যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে, এক খিলি পানের আকর্ষণে উঠে এসেছিলেন। পরে কিস্‌সার রসটা না নিয়ে চলে যেতে পারেন নি।

কিন্তু, সৈয়দ গিন্নী—বাবা, মিঞার মেয়ে, গিঁটে গিঁটে তার বুদ্ধি। ছেলে

বাইরে, ব্যাস এ সুযোগে বিদেয় করে দিল আপদটা। ছেলে যে একেবারে 'এশকে' মশগুল তা কি আর জানত সৈয়দ গিন্নী? কথাগুলোকে কেমন চটকে চটকে বলে রমজান।

ও-ও, তলে তলে এত কারবার? তাই তো বলি সৈয়দ বাড়ির বিয়ে, নিশি রাতে চুপি চুপি? দাওয়াত নেই, যেয়াফত নেই? এই তো সেদিন, বছর চার হবে বড় জোর, জাহেদের ছোট ফুফুর বিয়ে হল, একশো খাসি জবাই হল, তিন গেরাম দাওয়াত খেল। দাওয়াতটা মারা গেল বলে বড় আফসোস হাফেয সাহেবের।

আরে হ্ হ, এতক্ষণে তাহলে বুঝলে আসল ব্যাপারটা। বেচারা বুজুরগ্, আমার বড় আফসোস তাঁর জন্য। সৈয়দ গিন্নী নাকি শুধু পায়ে ধরতেই বাকী রেখেছিল। শেষে এক রকম ধরে বেঁধেই গছিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে। কিন্তু, সৈয়দ গিন্নীরও তকদীর মন্দ, বেচারা বুজুরগ্, তারও শনির দশা। সমবেদনায় বুঝি কাতর হয়ে আসে রমজানের গলাটা।

এ সব গল্পে সুখ পায় রমজান। বলতে বলতে দিলটা বড় ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওর। বড় ছোট, বড় ছোট সে। অর্থে মর্যাদায় এত ছোট যে গাঁয়ের কমজাত মিসকিনগুলোও পথে যেতে সালাম দেয় না, বড়জোর এক পাশে সরে পথ করে দেয়। রেঙ্গুন ঘুরে এসে আরো তীব্র হয়েছে এই ছোট হওয়ার জ্বালাটা। আর উগ্র হয়েছে ওর মনের আকাঙ্খা। মিঞা সৈয়দদের আভিজাত্যের মিনারে একটুখানি কাদা লেপে অনেক খেদ মিটে যায় ওর। বুকের অনেক জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

কালু এসে খবর দিল এত্তেলা দিয়েছে ফেলু মিঞা।

আসরটা ভেঙ্গে যায়। একে একে উঠে যায় হাফেয সাহেব, খতিব সাহেব। উঠি উঠি করেও বসে থাকে সতুর বাপ।

সতুর বাপ, একটু থাক। কথা আছে। তারপর কালুকে উদ্দেশ্য করে বলল রমজান: যাতো কালু ভিতর বাড়ি, পান নিয়ে আয়।

কালু চলে গেলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সতুর বাপ। বলে, সব এন্তেজাম তো ঠিক। টাকা লাগবে আরও কয়টা।

আরে টাকার কথা ভাব কেন, সতুর বাপ। যা লাগে নিয়ে যাও। বলেই জিব কাটল রমজান। স্বরটা বে-আন্দাজ উঁচু হয়ে গেছে। ওই যে বাঁশের বেড়া আর টিনের চাল, ওদেরও তো কান আছে।

তা ব্যবস্থা সব ঠিক তো? শেষ সময় গিয়ে তোমার লোকজন সব বেঁকে

বসবে না তো? এবার একেবারে ওর কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে শুধাল রমজান।

আরে না, কি যে বল। বিশ্বাসী লোক, তায় আবার টাকা খেয়েছে।

কিছু বলা যায় না সতুর বাপ। বার্মা মল্লুকে এ সব খেল তো কম দেখে আসিনি আমি, টাকা খেয়ে শালারা কাম করে উল্টো। তা ছাড়া সৈয়দদের মেজো মিঞাটা বড় বেজাহান। আর শালার লোকগুলোও যেমন ক্ষেপেছে ওর পিছে। একেবারে শেষ সময়টিতেই হয়ত বলে বসবে, মেজ মিঞার মিটিংয়ে আমরা গোলমাল করতে পারব না। তখন? তাই বলছি সতুর বাপ, তৈরী থেকো সব দিক দিয়ে।

কিচ্ছু ভেবনা তুমি। যাদের ঠিক করেছি ওদের মাঝে কিছু লেঠেলও আছে।

লেঠেলের ভাবনা সুলতানপুরের। তুমি তোমারটা ভাব। মৃদু একটা ধমক দেয় রমজান। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে তেমনি ভাবে বলল: মেজো মিঞার দফা তো রফা করে গেছে তার ভগ্নিপতি। তোমাদের কামটা কিছু কমিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু, ওই মাষ্টার হারামিটা যেন আচ্ছা শিক্ষা পায়, এটা তোমাকে বিশেষ ভাবে দেখতে হবে।

সে আমার খেয়াল আছে।

নাও, এটা তোমার, এটা ওদের, যাকে যেমন মোনাসিব মনে কর দিয়ে দেবে। শুধু কাম চাই, পাকা কাম, বুঝলে? তবনের গেরোর নীচে থলি, সেই থলি থেকে কিছু নোট বের করে দুভাগে ওর হাতে তুলে দিল রমজান।

উঠে পড়ে সতুর বাপ।

এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে রমজান, বলে: কিন্তু ভাই সাবধান। ফেলু মিঞার পক্ষেও আছি আমরা, বিপক্ষেও আছি। এ বড় কঠিন খেইল।

জবাবে এক টুকরো রহস্য কুটিল হাসি ফেলে বেরিয়ে যায় সতুর বাপ।

পান নিয়ে এসে গেছে কালু। গোটা দুই তিন পান এক সাথে দলা পাকিয়ে মুখে পুরে নিল রমজান। সুপুরিটা হাতের চেটোয় ডলতে ডলতে শুধাল, কিরে, এই রাতের বেলায় কি আবার দরকার পড়ল তোর মুনিবের? কি এক দলিল নাকি খুঁজে পাচ্ছে না, বলল কালু।

তুই যেমন পেয়াদা, তেমন তোর মুনিব, দলিল দলিল করেই শালা মরবে।

কালু জিব কাটে। মুনিব সম্পর্কে এমন অসম্মানের কথা রমজানের মুখ থেকে ইদানিং শুনছে ও। এখনও অভ্যস্ত হতে পারছে না।

সুপুরিটা মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে রমজান। আয়েশ করে পান চিবোচ্ছে।

চলেন। তাড়া দেয় কালু।

তাড়া নেই রমজানের। বলে, এই তো চলছি, তা তুই কি করলি ?

মুখ নীচু করে মাথা চুলকায় কালু।

চোখ চালিয়ে এদিক ওদিক একবার দেখে নিল রমজান। আস্তে আস্তে খুলে ফেলল তবনের গিটটা। বের করল সেই থলেটা। সুতো দিয়ে প্যাঁচানো থলে। প্যাঁচ খুলে বের করল একখানি পাঁচ টাকার নোট। আর দুটো রূপোর টাকা। আবার সুতো পেঁচিয়ে থলির মুখ বন্ধ করে তহবনের নীচে লুকিয়ে রাখল থলেটা।

এটা তোর বখসিস। আর এই দুটো টাকা তোর পোলাকে মিঠাই কিনে খাওয়াবি। টাকাগুলো ওর আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিল রমজান।

তবু বুঝি দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্ততঃ ভাব কালুর। মুনিবের নিমক হারামি করতে বাধছে ওর। তাছাড়া, অমন জলজ্যান্ত জিনিসগুলো চুরি করে আনতে যদি ধরা পড়ে যায় ? হাতে নাতে না হয় ধরা না-ই পড়ল, কিন্তু যদি কোন রকমে টের পেয়ে যায় ফেলু মিঞা ? রমজানের বলার পর থেকে, এই পাঁচ সাত দিন ধরে সে কথাটাই তো ভাবছে কালু।

সাবেক আমলের একটা বাংলা ঘর। এককালে হয়ত দাসি বান্দিরা থাকত। এখন কোন কাজেই আসেনা। তাই ঘরটা ভেঙ্গে ফেলেছে ফেলু মিঞা। কিন্তু পুরোনো হলে কি হবে, কাঠগুলো তার এখনো আনকোরা মনে হয়। বিশেষ করে শাল কাঠের পালাগুলো তো একেবারে অক্ষত। সেই ঘরেরই দশটা লোহা কাঠের পালা আর এক বান টিন চেয়েছে রমজান। চুপিসারে পাচার করে দিতে হবে রমজানকে।

কাজটা তো তেমন কিছু না। তা ছাড়া রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্টই হবে অমন ভাল পালাগুলো। না কোন কামে আসবে ফেলু মিঞার, না তার মনে থাকবে। অথচ ওই আটটি লোহা কাঠের পালায় রমজানের বড় ঘরটা সত্যি মজবুত হবে। কালুরও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

সে তো বুঝলাম কিন্তু মুনিবকে না বলে···এই উত্তরটাই দিয়েছিল কালু আর এ কয়দিন ধরে সে দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে ও।

মুনিবকে না বলে তার জিনিসে হাত দেওয়া সে তো চুরিই হল।

বেশ বেশ, আমিই না হয় তুলে আনবার ব্যবস্থা করব। তুই শুধু ফাঁস করে দিবিনা ব্যাপারটা। তা হলে ?

তা হলে যে কি করবে কালু, এ কয়দিন ভেবে ভেবে সেটাও ঠিক করতে পারেনি ও।

ফেলু মিঞার পেয়াদাগিরি করে কয়টি টাকাই বা পায় ও। এমনিতেই মাঝে মাঝে হাত পাততে হয় রমজানের কাছে। তবু কি চলত সংসারটা মুনিব গিন্নীর যদি একটু দযা না থাকত। বড ভাল ফেলু মিঞার বেগম সাহেবা। চেয়ে কোনদিন তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে আসেনি কালু। না চাইতেও কতদিন চালটা, মাছটা ন্যাকডা বেঁধে তুলে দিয়েছে ওর হাতে, বলেছে, নিয়ে যাও।

সেই মুনিব গিন্নী যদি জেনে ফেলেন ব্যাপারটা, তা হলে? মুনিবের চেয়ে মুনিব গিন্নীর জন্যই বুঝি এত দ্বিধা কালুর।

শোন্ কালু তোকে আমি খুসি করে দেব। অকস্মাৎ বলল রমজান।

পাঁচ টাকার কাগজটা কালুর হাতের মুঠোয় কেমন কর কর আওয়াজ তুলছে। রূপোর টাকাগুলো কেমন গরম হয়ে এসেছে কালুর মুঠোর ভেতর। আচ্ছা। সরাবার ব্যবস্থা আপনার। উঠে দাঁডায় কালু।

কুঁতকুঁতিয়ে হাসে রমজান। ওর খুসির হাসিটাও কেমন বীভৎস। গায়ে যেন কাঁটা ফোটায়।

কামিজটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁডায় রমজান। আর সেই মুহূর্তেই একটি টিকটিকি টুপ করে লাফিয়ে পডে ওর খালি কাঁধটায়। ত্রস্তে ওর গা বেয়ে নেবে যায়। কোত্থেকে একটা ইঁদুর এসে ধাওয়া করে টিকটিকিটাকে।

হেসে দেয় কালু, বলে আপনি তোয়াঙ্গর হবেন।

তোয়াঙ্গর, মানে ধনী। টাকা পয়সা ধনদৌলতের মালিক?

কাঁধে টিকটিকি পডলে তোয়াঙ্গর হয় নাকি রে? আবারও শুধাল রমজান।

হয়। ডান কাঁধে। ওই যে রামদয়ালের বাপ। সেই অল্প বয়সে যখন ইস্কুলে যেত, তখন তারও ডান কাঁধে টিকটিকি পডেছিল। সেই থেকেই তো ইস্কুল ছেডে ব্যবসায় নামল দত্ত। আর এখন?

হাঁ, এখনকার কথা কে না জানে। কিন্তু সত্যি কি তাই হবে? তোয়াঙ্গর হবে রমজান? কথাটা ভাবতেও অদ্ভুত সুখ পায় রমজান। খুসির চোটে ওর বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে ওঠে। এ কী কথা শোনাল কালু! এ যে ওর মনের কথা। রাত দিন খতিব সাহেবের তসবি গোনার মত মনে মনে ও এই কথাটাই তো জপে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন সন্দেহ জাগে রমজানের মনে, বলে, আমি তো শুনেছি

টিকটিকি মাথায় পড়লে রাজা হয়, কাঁধে পড়লে কি হয় সে কথা তো শুনিনি ? ওই একই কথা। কাঁধ আর মাথার তফাত কতটুকু। বলেই ঘর ছেড়ে অন্ধকারে নেবে পড়ে কালু।

তা বটে। কাঁধ আর মাথায় তফাত কতটুকু। কালুর কথাটায় সায় দিয়ে খুসি হয় রমজান।

রাতটা বড় অন্ধকার। কিন্তু পথ ঠাহর করতে একটুও যেন কষ্ট হচ্ছে না রমজানের। আজ বুঝি চোখ বুজেই বাকুলিয়ার পথ চলতে পারবে ও।

চারিদিকে সবই সুসংবাদ আজ। সতুর বাপ যদি কামটা নির্বিঘ্নে সারতে পারে সে তো মোটা দাঁও। তা ছাড়া এতো সবে শুরু। ইলেকশনের বছর, এ পথ দিয়ে যে বিস্তর টাকা গড়িয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর। আর ওর হাত দিয়েই তো সব গড়াবে, অত টাকা ধরে রাখবার ব্যবস্থারই হয় তো অভাব পড়বে শেষ পর্যন্ত।

তিন নম্বর তালুকটাও গিলেছে ফেলু মিঞা। খুসিতে বাগ বাগ হয়ে কসিরের ছাড়া ভিঁটিটা পাঁচ বছরের জন্য মোফতে ভোগ করতে দিয়েছে রমজানকে। ইতিমধ্যেই ভিঁটিটাকে সমান করে ফেলেছে রমজান। কালোজিরা ধানের বীজ ফেলবে। হিসেব করে দেখেছে রমজান, হেলে ফেলেও অন্ততঃ বিশ মণ ধান উঠবে। সরু সুগন্ধি কালোজির, চালের দাম আছে বাজারে।

কথার মানুষ রামদয়াল। ঠকায়নি রমজানকে।

আরো খুসির খবর, সৈয়দদের সম্পত্তি সবই দেখ ভাল করবে ফেলু মিঞা। সৈয়দ সাহেব চিঠি লিখেছেন, জরুরী কাজের জন্য ছুটি তাঁর মঞ্জুর হয়নি। তাঁর সম্পত্তির ব্যবস্থাটা ওই চিঠিতেই জানিয়ে দিয়েছেন। রমজানকে বলেছে ফেলু মিঞা, তায়তদারক তুমিই তো করবে, ওদের চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে ফসলি জমিগুলো বুঝে নাও। অন্য সব তো দলিলেই রয়েছে। যা ভাবা যায়নি, চিন্তা করা যায়নি, তেমনি সব সুযোগ এসে ধরা দিচ্ছে রমজানের হাতে। এ বুঝি কোন মুরুব্বীর দোয়ার বরকতে আল্লার রহম। নইলে এক সাথে এত সুযোগ ?

তার উপর আজ টিকটিকি পড়ল ডান কাঁধে ? না, কালুর কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। সমস্ত আলামতই তো রমজানের পক্ষে। তোয়াঙ্গর সে হবেই। ধন দৌলত বালাখানা দাস-দাসি সবই হবে। সবই হবে। ইস্, বুকটা ফুলে ওঠে খুসির চোটে, ভেতরের কইলজাটা বুঝি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

খুঁজে না পাওয়া দলিলের বোস্তানিটা ফেলু মিঞার হাতে দিয়ে এমনি খুসির চোটে সারা গ্রামটাই যেন ঘুরে বেড়ায় রমজান। কখন ভুঁইঞা বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমের রাস্তায় চলে এসেছে ও, টের পায়নি। অথবা ওর মনের খুসিই ওকে টেনে এনেছে পশ্চিমের রাস্তায়, ওর অজানতেই।

কিন্তু ততক্ষণে ওর মনের ফুর্তিটা কি এক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়েছে। মনের ফুর্তি দেহের রাজ্যে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেহের রাজ্যে প্রচণ্ড এক ক্ষুধার আগুন। মোটা সোটা দেহের থল থল গোশত্ আর পুরু মেদের আস্তর পুড়িয়ে সে আগুনের জিহ্বা যেন রাতের আঁধারে লকলকিয়ে উঠছে। পা চলে তাড়াতাড়ি। শ্বাস পড়ে ভারি ভারি।

হুরমতির বাড়ির পেছনে যে সরু পায়ে কাটা পথ, সেখানে এসে থামল রমজান। সেই ছেঁকা দেবার পর থেকে এ তল্লাট মাড়ায়নি রমজান। সাহস পায়নি। তাই গোশতের চাহিদাটা যখন অসহ্য ঠেকেছে 'সব ডিভিশন' শহরে গিয়ে ক্ষিধেটা মিটিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ অন্য কোথাও যাবার কথাটা ভাবতে পারলনা রমজান।

তোয়াঙ্গর হতে চলেছে সে, তোয়াঙ্গরীর আয়োজন একটার পর একটা সুসম্পন্ন হতে চলেছে। ভাগ্যের শিকা একটার পর একটা ছিঁড়ছে আর ওর করায়ত্ব হতে চলেছে।

কিন্তু, হুরমতিকে বাদ দিয়ে তোয়াঙ্গরীর ছবিটা যেন অসম্পূর্ণ। হুরের মত সুন্দরী মুখ, চিকন মুলোর মত লাল আর তাজা সেই দেহখানি।

ঘন ঘন দুটো নিঃশ্বাস ছাড়ে রমজান। তবনের উপর হাত রেখে অনুভব করে থলেটা। শুকনো পাতার মত মর্মরিয়ে যেন কথা কয়ে গেল নোটগুলো। গোটা থলেটাই আজ তুলে দেবে হুরমতির হাতে। আর যদি নিকা বসতে রাজী হয় হুরমতি তবে তিন কানি জমি যা রমজানের সাকুল্য জমির অর্দ্ধেক সবটাই লিখে দেবে ওর নামে।

না না, সাদি-নিকার কথা আজ পাড়বেনা রমজান। এই নিকার ব্যাপার নিয়েই তো এত গণ্ডগোল। সাফ দিলেই কথাটা পেড়েছিল রমজান। কিন্তু, মুখিয়ে উঠেছিল হুরমতি, আবার বলবি তো জিব কেটে ফেলব। তবু আবার বলেছিল রমজান। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল হুরমতি। মাফ চেয়েও হুরমতির মনটা গলাতে পারেনি রমজান। তবেই না অমন চটেছিল রমজান। আজ শুধু মাফ চাইবে না, টাকার থলে দেবে না, আজ হুরমতির পায়ে ধরবে রমজান।

কিন্তু, আজব মেয়ে হুরমতি। ঢকে নক্সায় চেহারায় নমুনায় যেমন অবিকল মিঞা বাড়ির মেয়ে তেমনি ওর জিদটা। একেবারে খানদানী মেজাজ। কতদিন খবর দিল ফেলু মিঞা। গেলই না। শেষে মিঞার মান সম্মান সব বিসর্জন দিয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছিল ফেলু মিঞা। রা-ই করল না হুরমতি। অসুখ বিসুখ, তাও নয়। ঘন ঘন শহরে যাচ্ছে। যেদিন শহর কামাই সেদিন লেকুকে নিয়ে শুয়ে থাকছে ঘরে, এ সব খবর তো রাখত রমজান।

শাসিয়েছিল ফেলু মিঞা। সেই শাসানি আর সুপুরি বাগিচায় রাতের নিমন্ত্রণ দুটোই এক সাথে বহন করে এনেছিল রমজান। শুনে বলেছিল হুরমতি, আমি কি তার বাঁদি? জিজ্ঞেস করে এস তোমার মিঞাকে। আল্লা মালুম মিঞার উপর কেন যে অমন রুষ্ট হয়েছিল হুরমতি। অথচ লাভটা কি হল?

না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বেশি ইতস্তত: করছে রমজান। আর যা ওর ভাবার কথা নয়, সে সব কথা ভেবে মনের ভয় আর ইতস্ততটাকেই বাড়িয়ে তুলছে সে। ডান হাতের তালুটাকে নাকের ফুটোর নীচে ঠোঁটের উপর ঠিক ঢাকনীর মতো করে ধরল রমজান। আলাজিহ্বাটায় সামান্য চাপ দিয়ে আওয়াজ তুলল; কু-উ কু-উ। এটাই সংকেত।

অধীর রমজান। নালাটা পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে আসে। আবার দুপা এগিয়ে পিছিয়ে আসে। না, আজ যদি হুরমতি জবাব না দেয় সংকেতের, জোর করেই ওর ঘরে গিয়ে উঠবে রমজান। দেখে নেবে কত জোর আছে মেয়ে মানুষের গায়।

কুউ- কু-উ। আবার সংকেত পাঠাল রমজান। রাতের শিকারী পশুদের চোখের মতো জ্বলছে ওর চোখ, সে চোখ চেয়ে থাকে একটু দূরের গাছপালা ঘেরা ওই জমাট অন্ধকারটুকুর দিকে। গোটা শরীরের জ্বালাটা এবার যেন মাথায় উঠে এসেছে। মাথায় যেন পটকা ফাটছে।

সংকেতের জবাবটা কি আসবে না? উত্তেজনায় অধীর রমজান।

ফা-ৎ করে শব্দ হল। হ্যাঁ হ্যাঁ, হুরমতির ঘরেই, কাঠি জ্বালবার শব্দ। হ্যারিকেন ধরাল হুরমতি। ওর ঘরের বাঁশের বেড়ার খোপ দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। এবার খট খট খড়মের শব্দ হল। হ্যাঁ দরজা কি জানালার দিকে এগিয়ে আসছে হুরমতি। টুন টুন টুন। এক দুই তিন, হ্যাঁ তিনবারই টুন টুন শব্দ হল টিনের জানালায়।

সম্মতির সংকেত পেয়ে পলক ফেলল না রমজান। হুরমতির বাড়ির সীমানায়

নালা। এক লাফে নালাকে ডিঙ্গিয়ে হুরমতির দাওয়ায় উঠে এল ও। দরজার উপর হাতটি রাখতেই পিছন দিকে সরে গেল কপাট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে হুরমতি।

কোন রকমে কপাটটা ভেজিয়ে দিল রমজান। মুহূর্তের অবকাশ না দিয়েই লুফে নিল হুরমতির হুরের মতো শরীরখানি। লোমশ গরিলা বাহুর যাঁতায় এক দলা মাংসের মত ওকে পিষে চলে রমজান। হিংস্র পশুর আঁচড় কেটে যায় ওর মুখে গলায় বুকে। হিস হিস গরম নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয় ওর ফুলেল তেলের গন্ধ, ওর দেহের সুবাস। কোথাও পায়নি রমজান এমন দিল মাতোয়ারা সুবাস, শহরের রণ্ডী পাড়ায় না, রঙ্গমেও না। শুনেছে মিঞা-সৈয়দদের নীলরক্তের মেয়েদেরই গায়ের গন্ধ এটা। তাই তো এত লোভ, এত আকর্ষণ রমজানের।

ওর ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দেয় রমজান। সাড়ির বাঁধনটা দেয় শিথিল করে। পাট আর কৃত্রিম রেশমের মিশেলী মসৃণ সাড়ি। ঈষৎ ভারি। টুক করে খসে পড়ে ওর কোমর থেকে। নগ্ন দেহটা কোলে তুলে নেয় রমজান, আস্তে করে শুইয়ে দেয় চৌকির বিছানায়।

পা গুটিয়ে উঠে বসে হুরমতি। রমজানের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

হ্যারিকেনের মৃদু আলোর আভায় হুরমতির সোনা বাটা শরীরের নিরাবরণ রেখাগুলো কি এক আগুনের শিখার মতো নেচে নেচে ওঠে। আগুনের তীরের মত এসে বিঁধে যায় রমজানের সর্বাঙ্গে।

হুরমতি হাসে। ছিনালী হাসি। ছিনালী কটাক্ষ। একী রহস্য হুরমতির! তবে কি এমনি করেই আজ ওকে বিদায় দিয়ে দেবে হুরমতি?

চৌকি ছেড়ে একপা দুপা এগিয়ে আসে রমজান। ট্যাঁক খুলে থলেটা তুলে দেয় হুরমতির হাতে। নোটের চাপে ফোলা থলে, হুরমতির তালু গড়িয়ে পড়ে যায় মেঝেতে।

আবারও হাসে হুরমতি।

অসহ্য। অসহ্য এ বিলম্ব। এতক্ষণের যে উত্তেজনা, ভেতরে ভেতরে যে অস্থির দাপাদাপি এ যেন তার চেয়েও ভয়ংকর। আপনার হিংস্র পশুত্বটাকে আর তো সামলাতে পারছেনা রমজান। আবারও হাত বাড়ায় ও।

হেসে এক পাশে সরে যায় হুরমতি। হ্যারিকেনটা প্রায় নেভানোর মতো করে বুঁজিয়ে দেয়।

আধো অন্ধকারে ঠাহর করে ওকে স্পর্শ করে রমজান। আর এতক্ষণ সামলে

রাখা পশুত্বটা যেন চেরাগের উপর ধরে রাখা গালার মতো গলে গলে ঝরে পড়ে।

হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। তীব্র তীক্ষ্ণ এক চীৎকারে বাজ খাওয়া কাকের মতো ছিটকে পড়ল রমজান। বন্ধ দরজায় টুঁ খেয়ে মাথা ফাটাল। যন্ত্রণার চীৎকারে রাত্রির নীরবতা চিরে বেরিয়ে গেল রমজান আর হুরমতির খিল খিল হাসিটা যেন বিষ মাখা তীরের মতো ওর পিছু ধাওয়া করল।

প্রতিশোধ নিয়েছে হুরমতি।

হাসতে হাসতেই রমজানের কানটা কেটে রেখেছে ও।

সাড়ি পরে লণ্ঠনের আধবোজা আলোটা তুলে দিল হুরমতি। শিথানময় ছোপ ছোপ রক্ত। বালিশের এক কোনে বড় এক চাক রক্ত। সে রক্তের চাক থেকে মাংসের দলাটা আলাদা করে তুলে নিল হুরমতি। বালিশের তলা থেকে ন্যাকড়া বের করল। সে ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে নিল রমজানের কানটা। তার পর মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল রমজানের টাকার থলেটা। থলে আর ন্যাকড়ার পুঁটলিটা এক সাথে বেঁধে বেরিয়ে এল হুরমতি।

লেকুর ঘরের দরজায় একটু চাপ দিতেই চৌকাঠের দিকটা ফাঁক হয়ে গেল। সে ফাঁক দিয়ে পুঁটুলি আর থলেটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল হুরমতি। বুঝি ভোরের উপহার রেখে গেল লেকুর জন্য।

ঘরে ফিরে হুড়কো দিল হুরমতি। হুড়কোর গায়ে লোহার শিকলিটা পেঁচিয়ে তালা মারল। তালাটা একবার ভাল করে টেনে দেখল। তার পর চাবিটা আঁচলে বেঁধে শুয়ে পড়ল।

তারুণ্যের রংমোড়া সুন্দর একটি আবেগ। সেই আবেগের টানেই যেন ওর চলা। যুক্তিটা যে একেবারে অনুপস্থিত এমন নয়। কিন্তু বুদ্ধিটা আবেগে আচ্ছন্ন বলেই যুক্তির নির্দেশে পথ চলার প্রয়োজন এখনো দেখা দেয়নি ওর জীবনে।

কিন্তু আবেগ দিয়ে বোঝা যায়না জীবনের জটিলতাকে, চেনা যায়না বিচিত্র জটবাঁধা এই পৃথিবীকে। জাহেদের কাছে এযেন এক হঠাৎ আবিষ্কার যা ওর তারুণ্যের আবেগ দিয়ে গড়া সহজ পৃথিবীটাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সে ভাঙ্গার ফুটো দিয়ে যে পৃথিবীটা উঁকি মেরে চায় সেখানে শুধু

কুসংস্কার, নীচতা, অন্ধবিশ্বাস। কদর্য তার চেহারা। সেখানে সব কিছুই যেন জটিল। মনের সহজ আবেগ দিয়ে সেখানে পথ পায়না জাহেদ।

কপালের ক্ষতটা ওর সেরে উঠেছে। তবু জ্বরের ভাব আর গায়ের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে আজ। ওর হাত টিপে দিচ্ছে মালু।

এভাবে আমার সর্বনাশ করলে মেজো ভাই? মাটির দিকে চোখ করে শুধায় রাবু।

চমকে তাকায় জাহেদ। রাবুর মাথায় ঘোমটা। এমন ধারা প্রশ্ন করবে রাবু কল্পনাও করতে পারেনি জাহেদ। তাছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে রাবুরও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে সেটা ছিল ওর চিন্তার বাইরে।

বুদ্ধি হয়ে মাকে দেখলামনা, মায়ের স্নেহ কি জানবনা কোন দিন। আব্বাকেও তুমি তাড়িয়ে দিলে। ক্ষোভের অনুযোগের স্বর রাবুর।

এমনভাবে বলছিস যেন চাচা সব সময় বাড়িতেই রয়েছে, আমি বের করে দিলাম।

এবার আব্বা থাকতেন বাড়িতে। ঠিকই থাকতেন।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিস মনে হচ্ছে? খাটের মাথায় হেলান দিয়ে বসল জাহেদ।

আহা মরি। বাপ স্বামিকে মেরে মুরে বাড়ি ছাড়া করলে। আমি এখন খুসিতে নাচব, তাই না? কে বলেছিল তোমায় অমন বীরত্ব ফলাতে?

কী বলছে রাবু। এত ঝাঁঝ কখন এল ওর কণ্ঠে? চোখ জোড়া কচলে নিয়ে ভাল করে ওর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করল জাহেদ। বলল শান্ত কণ্ঠে, তোর ভবিষ্যতটা কি হত ভেবে দেখেছিস?

মা নেই, বাপ থেকেও নেই। তার আবার ভবিষ্যত। বরাতে যা লেখা তাই হোত? তুমি কেন মাথা গলাতে এলে?

খুব কথা শিখেছিস দেখছি, ওই বুড়োটা হবে তোর বর, বরাতে সেটাই লিখে দিয়েছে, না? এ সব কথা আমার সামনে বলবি তো চড খাবি। বুঝেছিস?

রেগে ওঠে জাহেদ। চৌদ্দ বছরের মেয়ের মুখে বরাতের কথা শুনলে কার না রাগ হয়!

কাজল রেখার মতো চিকন ভ্রূঁ। সে ভ্রূঁর নীচে একজোড়া ডাগর, কালো চোখ। নক্সার মতো নিখুঁত ফর্সা মুখ। পাতলা ত্বকে কিশোরী লাবণ্য আর স্বাস্থ্যের শ্রী। যেন এই প্রথম লক্ষ্য করল জাহেদ।

জানিস, শহরে তোর বয়সী মেয়েরা ফ্রক পরে খেলে বেড়ায়? লেখা পড়া

শিখবি, নিজের বুদ্ধিতে চলবার শক্তিটা অর্জন করে নিবি। তারপর তোর বিবেক যা বলে তাই করবি। তার আগে আমায় আর চটাসনে।

উত্তর দেয়না রাবু। আঁচলের খুঁটে একটি একটি করে আঙ্গুল জড়ায়। একটি একটি করে-আবার খুলে ফেলে।

তুই এখন চাস কি বল্ তো? তোর মন কি কয়, ঠিক সে কথাটাই বলবি। ওকে চুপ দেখে শুধাল জাহেদ।

আব্বাকে এনে দাও। আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আন।

অবাক মানে জাহেদ। অসুস্থতার জের টেনে এখনো দুর্বল ওর স্নায়ুগুলো। সেই স্নায়ুতে যেন আগুন ধরিয়ে যায় রাবুর কথাগুলো। চেঁচিয়ে ওঠে, যা, যা, আমার সুমুখ থেকে যা তো। শীগগীর যা।

দিন দুই পর।

সকালে ঘুম ভেঙ্গেই খিঁচিয়ে যায় জাহেদের মেজাজটা। চেঁচামেচি শুরু করে দেয়: কতবার বলেছি, সকাল সকাল দু তিন কাপ চা দিয়ে যাবে আমায়। কেউ যেন গায়েই মাখেনা আমার কথা।

কি মেয়েরে বাপু। কখন থেকে বলছি, যা ওর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দে।

চায়ের পেয়ালার শব্দ পেলেই জেগে উঠবেও। কি যে সারাক্ষণ ভাবে গালে হাত দিয়ে। জাহেদ শুনতে পায় রসুই ঘর থেকে ভেসে আসছে ওর আম্মার গলা।

রাবু আসে। কি এক শরমে ধীর ওর পদক্ষেপ। তেপায়ার উপর তৈরী করা চায়ের কেতলি আর পেয়ালাটা রেখে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

যাসনে। বস। কথা আছে। অতিরিক্ত গম্ভীর জাহেদের কণ্ঠ। মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে যায় রাবু।

বসছিসনা কেন? বসতে বললাম যে। ধমকে ওঠে জাহেদ।

বিড়াল ছানার মতো হাতপাগুলোকে সংকুচিত করে এতটুকু হয়ে বসে রাবু। খাটের কোনায়।

দেখ তোর লজ্জা দেখে আমারও লজ্জা পায়।

এজন্যই বসতে বলেছিলে নাকি? ছোট্ট করে শুধায় রাবু।

থামবি? তোর এ সব বাঁকা আর সেয়ানা কথা সহ্য হয়না আমার। বরাত বুঝিস, স্বামী চিনিস। মগজটাকে তো দিব্যি পঁচিয়ে তুলছিস। এদিকে লেখাপড়ার বেলায় তো ঢুঁ ঢুঁ।

বেশ, ঢুঁ ঢুঁ, তাতে কার কি?

ও বাবা, আবার গাল ফোলানো হচ্ছে! তা, এদিকে যে একেবারেই মাড়াচ্ছিসনা, ব্যাপার কি ?

'যা যা, আমার সুমুখ থেকে যা', এ সব কথা শুনলে কার আসতে ইচ্ছে হয় ?

হো হো করে হেসে দেয় জাহেদ, বলে, তোর যে দেখি রাগও আছে।

ঘন ঘন চুমুক দিয়ে পেয়ালার চাটা শেষ করে জাহেদ। বলে আবার, তুই নাকি কোলকাতায় যাবিনা বলেছিস ?

হ্যাঁ, বলেছি তো। কেমন জেদী কণ্ঠস্বর রাবুর।

কেন যাবিনা ?

সব বলেছি জেঠি আম্মাকে।

আমাকেও বলতে হবে।

কি আমার মোড়লরে! সবই বলতে হবে তাঁকে! বলবনা।

বলবিনা? কেমন আহত আর ক্ষুণ্ণ স্বর জাহেদের। কি এক ব্যথায় যেন কালো হয়ে যায় ওর সদ্য হাসি ছড়ান মুখখানা।

চকিতে একবার চেয়েই মুখটা নাবিয়ে নেয় রাবু। ফস করে কথাটা বলে ফেলেছে বটে, কিন্তু জাহেদকে একটুও আঘাত দিতে চায়নি ও। তাই ওর ব্যথাতুর মুখটার দিকে তাকিয়ে ছলছলিয়ে ওঠে রাবুর চোখ। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দেয় রাবু, আর খাটের কার্নিসে আঙ্গুলের নখ ঘসে চলে।

স্থির অপলক চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে জাহেদ। চৌদ্দ বছরের মেয়েটি—ওই একটি রাত, এই কয়টা দিন যেন কোন যৌবন অতিক্রান্তা নারীর পরিণতি দিয়েছে, গাম্ভীর্য দিয়েছে আর দিয়েছে কি এক বিতৃষ্ণা। ঘরে বসে আনমনে বুঝি পুতুল খেলছিল মেয়েটি, বেরিয়ে এসে দেখল ওর আনন্দময় কিশোর ওর অনাগত রোমাঞ্চ ভরা যৌবন, এতগুলো বছর কে যেন মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আনন্দে নাচবার, খুসিতে হাসবার আর কোন অধিকার নেই ওর। বৃদ্ধ স্বামীর সেবা, দেওয়ানা পিতার হাজারো অত্যাচার সয়ে সয়ে সেই পিতাকেই আবার আঁকড়ে ধরা, এই ওর জীবন। এই ওর বরাত।

বুঝি ওর মুখটা ভাল করে দেখবার জন্যই উঠে আসে জাহেদ।

আমার সামনে ঘোমটা দিচ্ছিস, এটা সত্যি তোর বাড়াবাড়ি।

জাহেদ আর চেয়ে থাকতে পারেনা নিরানন্দের বিষাদ ঘেরা ওই মুখটার দিকে বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে যায় কি এক বেদনায়।

রাবু কোন কিছু বুঝবার আগেই ওর ঘোমটার আঁচলটা সরিয়ে দিয়েছে জাহেদ আর ওকে টেনে নিয়েছে আপন বাহুর পাশে। বলে চলেছে : তুই যদি ভাবিস সবাই মিলে হাত পা বেঁধে কুয়োর ভেতর ফেলে দিয়েছে তোকে, বাঁচার কোন পথ নেই তোর, তবে কিন্তু খুব ভুল করছিস। দেখ আমার দিকে দেখ।

রাবুর চোখে পানি। পানির ধারা নেবে আসছে চিবুক বেয়ে। ওর ভিজে চিবুকটা হাতের স্পর্শে তুলে নেয় জাহেদ, দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ তো? বর হিসেবে কি খুব মন্দ দেখাবে আমায়? মানাবেনা তোর সাথে? ওকি চোখ বুজছিস কেন?

চোখের অশ্রু আর সরমের আবিরে বুঝি অপরূপ রাবু। মুখ লুকোতে গিয়ে আরও কাছে সরে আসে রাবু।

ঝুঁকে আসে জাহেদ। নিজের মুখ দিয়ে ডলে দেয়, ঘঁসে দেয় রাবুর কপালটা, বলে, ওই বুড়োর ঘর করাই যদি তোর কপালের লিখন হয়ে থাকে তবে এই আমি সৈয়দ আলী জাহেদ, এই মুহূর্তে সেই লিখনটা মুছে দিলাম তোর কপাল থেকে।

ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে যায় রাবু।

দুর্ভাবনাকে ঠাঁই দেয়ার মত মন নয় জাহেদের। অথচ সেই রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, সেই সকাল আর এই তিনটি চরিত্র রাবু, দরবেশ চাচা আর তাঁর কামেল ওস্তাদ, সব মিলিয়ে চিন্তা আর দুশ্চিন্তা যেন গিঁট বেঁধে থাকে ওর মনের ভেতর। রাবুর দুর্বোধ্য এক গুঁয়েমিটা যে কোথায় নিয়ে যাবে ওকে ভেবে শিউরে ওঠে ও।

এরি মাঝে সুলতানপুরে মিটিং করতে গিয়ে ঢিল খেয়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছে সেকান্দর। শরীরটা সারেনি বলে জাহেদ যেতে পারেনি সুলতানপুর। অথচ তার অনুপস্থিতিতে মার খেয়ে এল সেকান্দর। মনটা বুঝি আরো খারাপ হয়ে যায় জাহেদের।

নিশ্চয় ওই মৌলভীদের কাণ্ড। কেন যে মৌলভীগুলো অমন আদাজল খেয়ে লেগেছে লীগের বিরুদ্ধে বুঝিনা আমি। সব শুনে বলল জাহেদ।

আরে না, 'মুলভী-ফুলভীর' ছায়াও ছিলনা ধারে কাছে। সব গিয়ে হল আমাদের স্বনামধন্য প্রেসিডেণ্ট ফেলু মিঞার দক্ষিণ হস্ত, যার নাম কানকাটা রমজান, তারই কীর্তি।

তার কীর্তি? যেন আর্তনাদ করে উঠল জাহেদ।

এই তো সমাজের অবস্থা। তা বাইরের চেহারার দরকার কি, তুমি তো

আজাদী আজাদী বলে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ দেশময়। অথচ তোমার বাড়িতেই ঘটে গেল কি বর্বর কাণ্ড।

থাম থাম। কানে আঙ্গুল দেয় জাহেদ। এর পরই তো সাদা চামড়াওলাদের সেই থিওরীটা আওড়াবে, এখনো স্বাধীনতার উপযুক্ত হইনি আমরা। সাদা চামড়ার উপর যতই না গায়ের ঝাল মিটাও, কথাটাতো ঠিক। আজাদী নিয়ে আমরা করব কি বল তো? না আছে আমাদের শিক্ষা, না আছে পোক্ত নৈতিকতার ভিত্তি। নইলে ভাবতে পার অতবড় এলেমদার বাবা, নিজের চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে তুলে দিতে পারে ষাট বছরের বুড়োর হাতে? অতএব চিরটাকাল নিজের দেশে পরবাসী হয়ে থাকি আমরা। এই তো? ব্যঙ্গ বাঁকা স্বর জাহেদের।

কদর্থ করছ কেন আমার বক্তব্যের? আমার কথা হল: সমাজটাকে মেরামত কর। শিক্ষা দাও, আলো দাও—গোঁড়ামীর অচলায়তন ভেংগে উন্মুক্ত কর বুদ্ধির দ্বার, কুসংস্কারের বাঁধ ভেংগে এনে দাও মুক্তির প্লাবন। মনটা রইল তোমার শৃংখলে, চাও তুমি মুক্তি। সে কি সম্ভব, না কাম্য? বেশ গুছিয়ে জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো বলে গেল সেকান্দর। নিজেও অবাক হয় ও, এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা আর তর্কে মেতে, মুখ গেছে ওর খুলে, জিবে এসেছে ধার।

আবার ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ছ তুমি। দুশো বছর পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজটার চোখ খুলে দিতে হলে যে বিরাট সংস্কার আর বিপুল কর্মোদ্যমের প্রয়োজন সে কি অস্বীকার করছি আমি? কিন্তু আমি মনে করি, অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই মনে করি, একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই উন্মুক্ত করতে পারে সেই আকাঙ্খিত দ্রুত সংস্কারের পথ, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তৈরী করে দেবে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের অর্থনৈতিক আর সামাজিক ভিত্তি।

সবই বুঝলাম। কিন্তু, আজাদীর জন্য একটা ন্যূনতম মানসিক চারিত্রিক প্রস্তুতি থাকবেনা? সে প্রস্তুতি কোথায় আমাদের? অধিকার বোধটা হল একান্ত প্রাথমিক উপলব্ধি। সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা নিষ্ঠা, সততা আর আত্মার সম্পদ প্রয়োজন তার কি করছ? ওগুলো বাদ দিয়ে আজাদী আসতে পারেনা, এলেও সে আজাদী ধরে রাখতে পারবেনা, আত্মিক শক্তির অভাবে আজাদীটাই হবে উৎপীড়ন, বিশৃংখলার নামান্তর। উত্তেজিত স্বর সেকান্দরের। আজকাল তর্কের জোরে প্রায়ই উত্তেজিত হতে শুরু করেছে ও।

উদ্ভট যুক্তি তোমার। থাক গিয়ে এ তর্ক। আমি ভাবছি রমজান বলত মিনিমুখো শয়তান, কিন্তু 'মিনিমুখোটা' যে মারমুখো হয়েছে, এখন কি বলে রমজান? হো হো করে এক সাথেই হেসে দেয় ওরা।

স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সবক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, একটা তাৎপর্য। সেটা হল জাগরণ এবং পুনর্গঠন—নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক—সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে ঘরে। এটাই তোমাকে বোঝাতে চাই। তাই এত তর্ক করি। হাসি থামিয়ে বলল সেকান্দর।

আমি বুঝি এবং আরও বুঝতে চেষ্টা করব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তর্কের ইতি টানতে চাইল জাহেদ।

কিন্তু সেকান্দর যেন জিদ ধরেছে। সে বলে চলল—আমাদের মানসিকতাটা এখনো মধ্যযুগীয় ফিউডাল, এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং একে দূর করতেই হবে।

তা স্বীকার করি মাষ্টার। কিন্তু এখন তো অন্য চিন্তায় আসতে হয়। ব্যাটারা যে মিটিংয়ে গোলমাল শুরু করল তার কি করবে?

তোমার মামুজান ফেলু মিঞা তো নোসখা দিয়েই দিয়েছেন, 'লাঠ্যাষুধি' অর্থাৎ ওদের লাঠির জবাবে আমাদেরও লাঠি। আর 'গাদ্দার'গুলোকে উত্তম ঠ্যাঙ্গানী।

ঠিক দাওয়াই। সাই দিল জাহেদ।

তবু চিন্তামুক্ত হতে পারেনা জাহেদ। হৃদয়ের স্বচ্ছ আবেগ দিয়ে যা অতি সহজ এবং স্বাভাবিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত ও, সে সমস্তই আজ কেমন গিঁট পাকিয়ে উঠছে। ঘরে এবং বাইরে। জীবনে সহজের কোন অস্তিত্ব নেই। রূঢ় নিদারুণ এক সত্য হিসেবেই যেন কথাটা উপলব্ধি করল তরুণ জাহেদ।

ওই এক রত্তি মেয়ে রাবু, সে-ই তো কত কঠিন। জাহেদের চোখে যা অস্বাভাবিক ও মেয়েটার আছে তা-ই যেন স্বাভাবিক। এক রাবু কেন, বাড়িতে, বাড়ির বাইরে সকলের কাছেই জাহেদের সহজ স্বাভাবিক চিন্তা আর কাজগুলো যেন অস্বাভাবিক, অসরল অর্থ ভরা।

হোকনা ভ্রান্ত তরীকার অনুসারী, তবু তো তারা আল্লার ওলি, ছিঃ ছিঃ মাইজা মিঞা কামটা বড় খারাপ করেছেন। জাহেদের সুমুখেই বলেন মুন্সিজী।

তোবা তোবা, এটা কি সৈয়দ বাড়ির ছেলের মতো কাম হয়েছে? কপাল

খাপড়ায় মালুর মা। সৈয়দবাড়ির নামে কামে অমন একটা কলংকের কালিমা পড়েছে বলে বড় বিচলিত মালুর মা।

খোদার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়েনা। খোদার হুকুম হয়েছে, ওর বিয়ের ফুল ফুটেছে। নইলে অমন হুট করে সৈয়দ বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে কখনো? কাজটা ভাল করিসনি বাবা। ভৎর্সনার স্বর সৈয়দ গিন্নীর।

আশ্চর্য হয় জাহেদ। সত্যের পথটা কত সংস্কারে আচ্ছন্ন।

বলেনা কিছু শুধু মালু আর আরিফা। ওরা সেই যে হকচকিয়ে চুপ মেরে গেছে আর মুখ খুলছেও না। কেমন যেন ভোজবাজির মতো ঘটে গেল একটার পর একটা ঘটনা, ওরা যেন নীরব দর্শকই হয়ে রইল। মনে মনে ওদের যতটুকু অভিমান, যতটুকু রাগ, সে হল রাবুর বিরুদ্ধে। যদি বেঁকে বসত রাবু সাধ্য ছিল কার কলমা পড়ায়? তাছাড়া এখনই বা কী কাণ্ডটা করে চলেছে রাবু। লম্বা লম্বা সেজদা, ঘণ্টা ধরে মোনাজাত। বুঝি কাঁদেও চুপি চুপি। মানে হয় এ সবের?

বাইরের কানা ঘুসো যথাসময় এবং যথানিয়মে পল্লবিত হয়ে পৌছে যায় সৈয়দ বাড়ির অন্তঃপুরে। গম্ভীর হয়ে যান সৈয়দ গিন্নী।

কান জোড়া গরম হয়ে ওঠে বাবুর।

দেখলে তো তোমার বাহাদুরির ফলটা? তামাম দুনিয়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। তোমার না হয় হায়াশরম নেই। কিন্তু আমি? গ্রামে যদি এসব রটে আমি যাব কোথায়? যেন কৈফিয়ত চাইছে রাবু।

কলকাতায়। সংক্ষেপে বলে মুচকি হাসে জাহেদ। ওর পরিহাস চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরে বেড়ায় রাবুর ঘোমটা মুক্ত মুখের উপর। রাগের চোটে আজ ঘোমটা টানতে ভুলে গেছে রাবু।

ফাজলেমী রাখ তো মেজো ভাই। বংশের বদনাম হচ্ছেনা? লোকের কানাঘুসো বুঝি তোমার গায়ে বিঁধেনা?

আহা, ফুলচন্দন পড়ুক লোকের মুখে। আবারও হাসে জাহেদ।

রাবুর মুখে রাগ দেখে হাসি সামলান সত্যি বুঝি দুঃসাধ্য।

হঠাৎ কেন যেন হাসিটা ওর উবে যায়। গম্ভীর হয়, বুঝি কঠিন হয় জাহেদ, কি এক ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলে ওঃ বংশ জ্ঞানটাতো বেশ টনটনে দেখছি। কিন্তু আমাকে বলতো, তোর বংশের দশপুরুষে তোর মতো স্বার্থপর কেউ জন্মেছে?

কি কথায় কি কথা? কেমন ভয় পেয়ে যায় রাবু। এ এক মুশকিল ওর,

জাহেদ যখন রেগে যায় তখন কেন যেন ওর নিজের রাগটা গলে যায়, পানি হয়ে চোখের ধারায় ছুটে আসতে চায়।

আমি তোর সর্বনাশ করেছি, কি হবে তোর, কোথায় যাবি, কি করবি? এত সব দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই তোর। আর ওই জোব্বাধারী শয়তানটা যে ফাটিয়ে দিল আমার মাথাটা, দেখেছিস একটিবার কপালে হাত বুলিয়ে? জিজ্ঞেস করলি একটিবার, কেমন আছি? আচমকা অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে জাহেদ।

ও মেজো ভাই। তুমি কী গো······কথাটা শেষ করতে পারেনা রাবু। ওর গলাটা যেন বুজে এসেছে আর উদগত এক কান্নার দমকে দুমড়ে গেছে ওর চিকন দেহ।

খাটের আলসেয় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কেন যেন ভাল লাগছে রাবুর।

আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় জাহেদ।

দেখেছ কাণ্ডটা? ঘরে বাইরে আমরা নিন্দা। আমি যেন মহাপাতক।

ওর নিস্ফল ক্ষোভ দেখে মনে মনে হাসে সেকান্দর। মুখে মাষ্টারী গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলে, শুভ কর্মে ধৈর্য ধর বন্ধু।

নাঃ অসহ্য এই আবহাওয়া। চল বেরিয়ে পড়া যাক আবার, কিছু কাজ তো হবে?

ওরা বেরিয়ে পড়ে। এগ্রাম থেকে সে গ্রামে। এ বাজার থেকে সে বাজার। কিন্তু, জাহেদ সরে পড়েছে বলেই বাকুলিয়ার আবহাওয়াটা বদলে যাবে কে বলল ওকে?

যেখানে যেখানে গেল সেখানেও সব কিছু ওর মনমতো চলছেনা। চললনা। ওর সৎ-আবেগ ওর সদিচ্ছাটাই সব কিছু নয়। অনেক স্বার্থ অনেক কোন্দল অনেক মনের সংঘর্ষে বিচিত্র জটিল গিঁট, সে সব গিঁট খোলা শক্ত কাজ, ধৈর্যের কাজ। সে সব স্বার্থ সংঘাতের মীমাংসা হয়ত দুরূহ নয়, কিন্তু কঠিন। মনটাকে যে একটু হাল্কা আর ঝরঝরে করে আনবে বলে বেরিয়েছিল জাহেদ, সে আর হলনা। অনেক জটিল জিজ্ঞাসা যেন এক সাথে মিলে ছেঁকে ধরেছে ওকে। যে বিরাট সমস্যা নিয়ে সদা বাকুল ওর মন, অনেক মানুষের নিত্য দিনের ছোট ছোট অজস্র সব সমস্যা এসে যেন পরাভূত করতে চায় সেই

বৃহৎকেই। জীর্ণক্লিন্ন ক্ষুদ্র বর্তমানটা যেন আচ্ছন্ন করে দিতে চায় মনের চোখে দেখা উজ্জল বিশাল ভবিষ্যতকে।

তবু মাইলের পর মাইল হেঁটে, মিটিংয়ে বৈঠকের তর্কের উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে ভাল লাগল ওর।

ক্লান্ত হয়েই ফিরে এল।

বাড়ির মানুষগুলোকে যেমন রেখে গেছিল তেমনি রয়েছে ওরা। ওর বিরুদ্ধে নীরব অসহযোগে থমথম ওদের মুখ। সারা দিনেও রাবুর খোঁজ পেলনা জাহেদ। কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে ওকে।

পরিবর্তনের মাঝে শুধু বাঁধাছাদা চলছে। এতটুকু শব্দ নেই, কোলাহল নেই। মনে হয় সবাই মিলে বুঝি কোন অন্তিম যাত্রায় চলেছে, এ তারাই আয়োজন।

দেখেছিস মালু? বাড়িটাকে একেবারে কবরখানা বানিয়ে ফেলেছে। সবাই যেন মোর্দা, শুধু গোর দেওয়ার বাকী। লা-গা তো একটা গানের জলসা।

আহ্লাদে আটখানা মালু। গানের কথায় ওকে আর পায় কে! এদিক সেদিক ছুটল ও। গনি বয়াতিকে পাওয়া গেল না। মধু গায়েনকে বায়না দিয়ে এল। তালতলির নলিনী সাহা, যন্ত্রের বাজনা বাজায় ভাল, তাকেও বলে রাখল মালু। আশেপাশের কোন বয়াতি, কোন কবিয়ালকেই বাদ দিলনা ও।

বার মাসে তের পাবণ, কোন্ যুগে যে সত্য ছিল কথাটা, বাকুলিয়ার মানুষ জানেনা। উৎসবের উপলক্ষে যে কমতি তা নয়, সামর্থের অভাবে উপলক্ষ গুলোকে শুধু ছেঁটেই চলেছে ওরা। তাই সৈয়দ বাড়িতে জলসার খবর পেয়ে ওরাও মেতে উঠল।

একটা বড় গোছের চৌকির উপর মঞ্চ বানিয়েছে মালু।

কঞ্চি কেটে কেটে নক্সা বানায় জাহেদ। সেই নক্সার গায়ে গায়ে বুনো লতা বুনো ফুলের অলংকার ঝুলিয়ে সুন্দর করে তুলেছে মালুর মঞ্চটা।

'জিন্দাবাদ' বুঝি আর ভাল লাগছেনা?

রাবুর গলা শুনে মাথা তোলো জাহেদ, বলে, এ্যদ্দিনে তা হলে সেধে কথা বললি?

কথাটা বলে সত্যি যেন বেকায়দায় পড়েছে রাবু, মাথাটা নাবিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জাহেদের লতাপাতার অলংকার।

নে হাত লাগা, ওর দিকে কতগুলো নাগকেশর আর কাঁকরল-লতা এগিয়ে দেয় জাহেদ।

বাহ্, আমি আর বেকার থাকি কেন? সেকান্দর এসে বসে পড়ে ওদের পাশে।

ওইযে, ওকে একটা কাজ দেখিয়ে দেয় জাহেদ।

বাঁশির ফালিগুলো চাঁছতে চাঁছতে কথাটা পড়ল সেকান্দর, চলেতো যাচ্ছ, এদিকের ব্যবস্থা কি হবে!

ব্যবস্থা আবার কি! তুমি তো রয়েছই।

উত্তরটা মোটেই মনোমত হলনা সেকান্দরের। ও বলে, এত ঝামেলা একা সামলাব কেমন করে?

'কেমন করে' বললে তো আর চলবেনা এখন। দায়িত্ব নিয়েছ, কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

গজ গজ করে সেকান্দর, বলে, আচ্ছা দায় পড়েছে আমার।

এই টুকুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো? ওর চোখে চোখ রেখে হঠাৎ শুধাল জাহেদ। আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে তুমিই বা সটকে পড়ছ কেন?

সটকে পড়ছি? আহত চোখে তাকায় জাহেদ।

অকস্মাৎ চুপ করে যায় ওরা।

কথায় কথায় কেমন যেন রুক্ষতা এসে গেছে। দুদিকেই মেজাজটা চড়ে গেছে। দিনে দিনে রূঢ়তার সম্মুখীন হয়ে আপন আবেগের সতেজ স্ফূর্তিটা কি হারিয়ে ফেলছে জাহেদ? চমকে উঠে নিজেকেই বুঝি শুধাল ও। সেকান্দরের মুষড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, খামোখাই ঘাবড়াচ্ছ মাষ্টার। দুমাস বাদেই তো আমি আসছি আবার। এমনি আসা যাওয়ার মাঝেই থাকব।

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেনা সেকান্দর। ও বোঝেনা ঘরে যার ভাত আছে, পুকুরে রয়েছে মাছ সে কেন বিদেশে পড়ে থাকবে। এ নিয়ে ঝকাঝকিও তো কম হলনা জাহেদের সাথে। সেকান্দরের কথাটাকে সেকেলে সংকীর্ণতা বলেই উড়িয়ে দিয়েছে জাহেদ।

তবু ভাল। সংক্ষেপে বলে কঞ্চি চাঁছায় মন দেয় সেকান্দর।

গলা খাঁকরিয়ে কে যেন আসছে।

ত্রস্তে ঘোমটা টেনে পড়িমরি ছুটে পালায় রাবু। ওর পালানোর পথটির দিকে চেয়ে হেসে দেয় দু বন্ধু।

জমজমাট জলসা বসল।

সারা গ্রামটাই যেন ভেংগে পড়ল।

মালুর ব্যবস্থায়, সাজানোর কায়দায় বাহাদুরি আছে।

শোন্, ওকে কাছে ডাকে জাহেদ, বলে, তুই খুব বড় রকমের শিল্পী হবি, বলে রাখলাম।

পাশে সেকান্দর মাষ্টার। ছাত্রের প্রশংসায় সেও বুঝি খুসি। দুজোড়া খুসি খুসি চোখের নীচে যেন আহ্লাদে গলে যায় মালু।

সবাই এসেছে, কানকাটা রমজান আর মিঞা বাদে······আরো কেউ বসে আছে কিনা দেখবার জন্য ঘাড়টা উঁচিয়ে তোলে লেকু, কথাটাকে ততক্ষণ ধরে রাখে জিবের ডগায়। হ্যাঁ খতিব সাহেব, কারি সাহেব বাদে, হাফেজ সাহেব তো দেখি বসে আছে কোণে। কথাটাকে শেষ করে লেকু।

রমজানের নামের সাথে নতুন বিশেষণটা চালু হয়ে গেছে। আর তা নিয়ে বুঝি গবেষণার ও অন্ত নেই।

যেই করুক না কেন, নৃশংস বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলেনা এটাকে। কতদিন যে এ সব বর্বর কাজ চলতে থাকবে গ্রামে, আল্লা জানে। হঠাৎ বলল সেকান্দর, লেকুর উপর চোখ রেখে, জাহেদকে উদ্দেশ্য করে। লেকুর উপরই বুঝি ওর সন্দেহ।

মুখটা কুঁচকিয়ে অদ্ভুত এক হিংস্রতা ফুটিয়ে তোলে লেকু। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয় সেকান্দর।

হুরমতির ছেঁকাটাও কম নৃশংসতা নয়। আস্তে করে বলে জাহেদ।

তা হলে হুরমতির কাণ্ড? বিজলীর মতো ওর মনের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল সন্দেহটা। আর আশ্চর্য হল সেকান্দর, হুরমতির দিকেই ওর মনের সমর্থন।

তালতলির নলিনীর বাজনা দিয়ে শুরু হয় আসর। বাজনা শেষে একের পর এক প্রাচীন কিসসার বয়ান অথবা যাত্রার ঢংয়ে অভিনয়। লায়লী মজনু। ইয়ুসুফ যোলেখা। লখিন্দর বেহুলা। সবারই জানা কিসসা। তবু তন্ময় হয়ে শোনে ওরা। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কাঁদে। একটু বাদেই হাসে। এই কান্না আর হাসির মাঝে নিজেদের জরাজীর্ণ কথা ক্ষণিকের জন্য একেবারেই ভুলে যায় ওরা। মঞ্চের নায়কনায়িকাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয় ওদের মন, অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত কোন শুভ আর সুন্দর সমাপ্তির। এ মন বুঝি শুধু ওদের নয়, এ মন সর্বকালের দর্শকের মন।

লম্বা কাহিনী ধরেছে মধু গায়েন। তুর পাহাড়ে মুসা নবীর জ্যোতি দর্শনের সেই অতি প্রাচীন কাহিনী। বয়ানের বাহাদুরিতে লোকগুলোকে বুঝি সেই আদ্যিকালের তুর পাহাড়ে টেনে নিয়ে যায় মধু গায়েন।

আর এই লোকগুলোকেই বুঝি হ্যাঁচকা টানে একেবারে আজকের দিনটায় নিয়ে এল মালু···বাকুলিয়ার মালু বয়াতি। এখন ওটাই তার বহুল পরিচিতি। ভীরু ভীরু লজ্জা মাখানো হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মালু। মাথায় ওর রঙীন গামছা। পিরানের উপর পেঁচিয়ে আর একটি গামছায় কোমরটাকে বেশ শক্ত আর চিকন করে বেঁধে নিয়েছে মালু। এক পাশে গোল হয়ে বসেছে দোহারের দল। নাচের ঢংয়ে একটু কুঁজো হয়ে কোমর বেঁকিয়ে চপপটি ফাটার মতো দুআঙ্গুলের আওয়াজ তোলে মালু। প্রত্যুত্তরে তালি বাজিয়ে কাঁসার থালায় তাল ঠুকে, দোতারাটা কাঁপিয়ে সাড়া দেয় দোহারের দল।
ধুয়ো ধরে ওরা! মাগো দাও চরণ, মাগো দাও চরণ।
মাটিই বুঝি মা। মায়ের বন্দনা গেয়ে শুরু হয় বয়াতির গান।
বাকুলিয়ার গান। বাকুলিয়ার ইতিহাস নিয়ে গান বানিয়েছে মালু। বড়-দের মুখেই ও শুনেছে কাহিনীটা। সেই শোনা কাহিনী শব্দে গেঁথেছে নিজের মত করে।

বাকুলিয়ার বড় মিঞা
ও সে মস্ত মরদ
মাগো তোমার লাইগা হইছে কয়েদ
ও সে মস্ত মরদ

আরে মিটিং হইল, ওয়াজ হইল কত নসিয়ত
কাইন্দা কাইন্দা মিঞা কহে
দীন গেল দেশ গেল, গেল খেলাফত
গোলামীর জিঞ্জিরে কান্ছে যে মোর ভারত
হায় গেল যে খেলাফত
কান্দে যে মোর ভারত
দাও চরণ, মাগো দাও চরণ।
এংরাজের পেয়াদা আইল, দারোগা আইল
আইল কত লাঠি বরকন্দাজ
তফাত রহো নাসারা ফেরেব্বাজ—
বাঘের সনে মিঞা হাঁকিল
আরে সে হুংকারে দুনিয়া কাঁপিল
মাগো দুনিয়া কাঁপিল।

হাওদা উঠিল, পাগড়ি বান্ধিল
মস্ত মরদ সোয়ার হইল।
সোনার চান ঘরে থুইয়া
আহা দালান কোঠা সোনা দানা
হাতের ময়লা ফেলিয়া
মিঞা চলিলে।
কি হইল, কি হইল?
মিঞা গেল জেয়লে।
মাগো দাও চরণ।

হারায়ে গেল সব
তালুকমুলুক রবরোযাব
লাটে চড়ে জমিদারী
হাতি ঘোড়ার সানদারী
কাইন্দা কাইনদা ঘরের বিবি অন্দ যে হয়,
তবু মিঞার মন গলেনা, আহা মন গলেনা।
মিঞা কহে, কওমের তরে দিল যে বাইন্ধেছি
জান দিব তো মান দিব না,
আহা জান দিবে তো মান দিবেনা।।

আরে জেয়ালখানায় সোনার দেহ কালা হইল
দুষ্ট ব্যারামে কলিজার খুন খাইল
জেয়ল থেইকা গাজী আইসা
শহীদ যে হয়
আর সতীনারী স্বামীর সনে আখেরাতে
চইলে যে যায়।
আহা চইলে যে যায়।

অধম মালেকে কয়—
দেশের লাইগা
কোরবান যে হয়

সে তো মরেনা
গোর আজাবে তারে ধরেনা
আহা সে যে বাঁইচা রয়
সাত সুরুজে তাহারই বন্দনা গায়।
আহা সে তো মরেনা।
দাও চরণ মাগো চরণ।

গানটা শেষ করেই মালু টিপ করে পায়ের ধূলো নিল ওর মাষ্টার আর জাহেদের। হাত ধরে যে ওকে ঠেকাবে সেই অবসরটুকুও পেলেনা ওরা। কদমবুসি সেরে ততক্ষণে মঞ্চে ফিরে গেছে মালু। দোসরা পালাটা ধরেছে।

হায় হায় এই কি কপাল
মিঞা সৈয়দ দেশ ছাড়িল এই কি কপাল।

কলিকালের খেলা-আর কত দেখবি বল
সেই যে মিঞা ছিল গাজী হইল শহীদ
তার পোলারা দেশ যে ছাইড়া
নাসারা কমিনার নফর সাজিছে
হায় মিঞা-সৈয়দ দেশ ছাড়িছে।

আরে দিনে দিনে কি হইল
রমজান আলী সুদ খাইল
খুলিল হারামের কারবার,
সাজে আল্লা পরস্ত্ ইমানদার
হায় এই কি কপাল।

হুরমতিরে ছেঁকা দিল
করেনা কেহ ন্যায্য বিচার,
কারি পড়ে তোবা সোভানাল্লা
খতিব বলে দোবরা লাগাও বিসমিল্লা।
আহা করেনা কেহ ন্যায্য বিচার
হায় এই কি কপাল।

আরে মিঞার ব্যাটা মিঞা,

সে কিনা গেরামের মা বাপ,

হার্মাদ সে যে খাজনা দেয়না মাপ

নোটিশ পাইয়া গাঁয়ের চাষা গানে পরমাদ

কসির হইল দেশান্তরী লেকু হয় যে বরবাদ

আরে মিঞা বড় হার্মাদ

তবে আরও শোন কালের কথা

ষাইটি বছরের ভণ্ড পীর

খায়েস চাপে কুমারী নারীর

কিন্তুক মিঞার নাতি যারে বল পেয়ারা জাহেদ

ও সে কিলকনি আর গুঁতা দিয়া মিটায় পীরের সাধ

হায় এই কি কপাল

গানটা শেষ করতে পারবেনা মালু। চিকের ওপারে মেয়েদের মহলে কি যেন চেঁচামেচি। তারপর চাপা উত্তেজনার উদ্বিগ্ন স্বর।

আম্বরি মূর্ছা গেছে। কেন, কি ব্যাপার, সে প্রশ্ন সবার মুখে, কিন্তু জবাব দেবে কে? সবাই হুড়মুড়ি খেয়ে ছুটছে আম্বরির দিকে।

জলসা ভেংগে যায়।

হুরমতি আর লেকু আম্বরিকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যায়।

তৃতীয় দিন তালা পড়ল সৈয়দ বাড়ির বড় দালানে।

চতুর্থ দিন মারা গেল আম্বরি। ওর কাঠির মত শীর্ণ মৃত দেহটাকে গ্রামের কবরখানায় গোর দিয়ে দিন দুই গুম হয়ে কাটাল লেকু। তারপর মেয়ে ভুনিকে কোন জ্ঞাতি বাড়িতে রেখে নিরুদ্দেশ হল।

দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল!

কোথা থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল মালু।

এক একটি বছর যায় আর ওকে যেন একূল থেকে ওকূলে আছড়ে ফেলে যায়। ও যেন ওই বড় খালে ভেসে যাওয়া ছিন্নমূল কোন গাছের শাখা। এ পার থেকে সে পার, এ নদী ছেড়ে অন্য নদী, শুধু ভেসেই চলেছে।

আজব এই দুনিয়াটা। এ দুনিয়ার কেরামতির বুঝি শেষ নেই।

প্রথম তিনটে বছর ভালই কাটল মালুর। স্কুল আর লেখা পড়া। আপন মনে যখন খুসি গান গাওয়া।

তিনটে ক্লাশেই ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করল মালু। আর তাতে ওর চেয়ে মাষ্টার সাহেবেরই যেন বেশি খুশি। ওর কাঁধে উৎসাহের হাত রেখে বলল গত বছরটা বড় গোলমালে গেল। সুলতানের দিকে, তোর দিকে মোটেই নজর দেওয়া যায়নি। এবার থেকে রোজ রাত্রে আমার বাড়ি এসে পড়ে যাবি, কেমন?

কিন্তু নতুন বছরেই সাঙ্গ হল মালুর লেখাপড়ার পর্ব।

আসল কথায় আসবার আগে একটা ভনিতা পাড়ল রমজান: খোস হও আর বেজার হও, হক কথাটাই বলব। আমি বলি খাও, কিন্তু করে খাও। মুন্সিজীর কথা বাদ দিলাম, তিনি আল্লাবিল্লা করছেন, সে হল নেক কাম, খোদার কাম, আমাদের সকলের কাম। কিন্তু তোমরা?

রমজানের কুঁতকুঁতে চোখে কোন্ অভিসন্ধি? বই বন্ধ করে ওর দিকে তাকায় মালু।

জনপ্রতি যদি আধসেরও ধরি তা হলে দৈনিক একসের করে চাল লাগছে তোমাদের মায়ে-পুতে। তার মানে মাসে তিরিশ বত্রিশ সের, বছরে পাক্কা নয় মণ পাঁচ সের। তেলটা নুনটা না হয় মুন্সিজীর মাসোহারা থেকেই গেল। কিন্তু……

এর পর কি বলবে রমজান? রুদ্ধশ্বাসে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে মালু।

অবশ্য হুকুমটা মুনিবের। আমি শুধু জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা মায়ে-পুতে এসে খাও মিঞা বাড়ি। তুমি বিবি সাহেবার একটু যাকে বলে

খেদমত করবে। আর মালু গরু বাতানটা দেখবে, ফাই-ফরমাসটা খাটবে।

রমজানের কথাটা শেষ হতে না হতেই কেমন ভাংগা গলায় বলে উঠল মালুর মা, মালুর ইস্কুল?

ইস্কুল? যেন আকাশ থেকে পড়ল রমজান। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল: ধাড়ী হয়ে গেছে ছেলে, এখন আবার স্কুল কি গো? কামে লাগিয়ে দাও। কামে লাগিয়ে দাও। তা ছাড়া মায়ে পুতে কি বসে বসে খাবে তোমরা?

চুপ করে যায় মালুর মা। যেন গভীর মনোযোগে হাতের আঙ্গুলের মরে যাওয়া চামড়া গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে চলেছেন তিনি। বুঝি দ্রুততর হয় মুন্সিজীর তসবি পড়া। শেষবার হজ্জের সময় মক্কা শরীফ থেকে কিনে আনা তসবির পাথরের গোটাগুলো দ্রুত শব্দ তুলে চলেছে ঠক ঠক ঠক।

হাল ছাড়লনা মালুর মা। বলল, সেকান্দর মাষ্টার বলে মালু নাকি পড়া শোনায় ভাল।

হো হো হো। হেসে কুল পায়না রমজান। বলে, হাসালে মালুর মা, হাসালে। বলি গরীবের আবার লেখা পড়া কি? লায়েক হয়েছে ছেলে, এখন খাটবে কাম করবে, রোজগার করবে।···লেখা পড়া কি? হা হা হা।

আরও দ্রুততর হয়ে মুন্সিজীর তসবির শব্দ, ঠক ঠক ঠক।

পরের সম্পত্তি। একটা ঝুটোও যদি না-হক খরচ হয়, তবে বান্দার কাছে না হলেও আল্লার কাছে তো আমাদের জবাব দিতে হবে? আসলে কর্তব্য আর ইমানের খাতিরেই যে কাজটা করতে হচ্ছে, এবার সেটাই বুঝিয়ে দেয় রমজান।

হঠাৎ ওর নজর পড়ে মালুর দিকে। চীৎকার করে ওঠে: দেখেছ? দেখেছ? কেমন ঘাড় তেড়া করে তাকাচ্ছে? দাঁড়া, ঘাড় তোর আমি সিদা করে ছাড়ব।

বেরিয়ে যায় মালু।

সেই যে বেরিয়ে এল, বাকুলিয়ায় আর ফেরা হলনা ওর। যেমন ছিল, গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরনে, তেমনিই বেরিয়ে এসেছে। জামা নেই গায়ে, সঙ্গে নেই বইখাতা। তবু কেন যেন স্কুলের পথটাই ধরল মালু।

সৈয়দ বাড়িতে হক নেই ওদের। ওরা পরাশ্রিত। বসে বসে অন্যের অন্ন ধ্বংস করে চলেছে। এখন কাজ করে খেতে হবে। আর কাজটা কি না

ফেলু মিঞার 'গাবুর' হওয়া? মনের ভেতরটা বুঝি তোলপাড় খেয়ে যায় ওর। সহসা কি এক দুরন্ত ইচ্ছে জাগে ওর মনে এমন কিছু করতে, এমন কোথাও যেতে যা ওকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়ে দেবে কানকাটা রমজানের মুখ, ফেলু মিঞার মুখ, ওই সৈয়দ বাড়ি, ওই বাকুলিয়া। সেই দুরন্ত ইচ্ছেটা যেন টগবগিয়ে উঠল ওর শরীরের ভেতর ধমনীর রক্তে। জোরে জোরে পা ফেলল মালু, দ্রুত পথ কাটল। গাটা গরম হয়ে ঘাম ঝরাল।

কলকাতা গেলে কি হয়? ধাঁ করে মনে এল কথাটা। কত লোকই তো যায় সেখানে! কামাই রোজগার করে জেব ভর্তি টাকা আর বোঁচকা ভর্তি রকমারি জিনিস নিয়ে ফিরে আসে গ্রামে। তা ছাড়া কোলকাতা যাওয়াটাতো অনেক দিনের সাধ মালুর। সেই যখন থেকে যাব যাব করছে সৈয়দরা, তখন থেকে।

সেদিন কি যে খারাপ লেগেছিল মালুর! না মেঝো ভাই, না রাবু আপা, একবার সাধল ওকে, বলল না একবার, চল, তুইও চল আমাদের সাথে। শহরে গিয়ে কাজের লোক কি লাগবে না ওদের, রাবুর বা আরিফার? রাবুর কাজগুলো মালুর মতো সুন্দর আর নিখুঁত ভাবে অন্য কে-উ করতে পারবে না, এটা হলফ করেই বলতে পারে মালু।

সেদিন কি এক চোট খেয়ে মালুর বুকটা যেন চৌচির হয়েছিল। মেজো ভাইদের ট্রেনে তুলে দিয়ে সোজা বাড়িতে ফিরে আসতে পারেনি ও। সেই বুড়ো তেঁতুল গাছটার তলায় বসে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল মালু।

কিগো নতুন বয়াতি? এমন হনহনিয়ে যাও কই?

মুখ তুলে চেয়ে দেখে মালু, সুমুখেই গনি বয়াতি। সেই জাহেদের মিটিং-গুলোতে মালুর গান শোনার পর থেকে ওকে 'নতুন বয়াতি' বলেই ডাকে গনি বয়াতি। তোমার বাড়িই যাচ্ছিলাম, বলল গনি বয়াতি।

কেন? শুধাল মালু আর মনে মনে বলল, ভাগ্যিস পথেই দেখা হয়ে গেল, নিজের বাড়ি বলে কিছু নেই ওর, এ কথাটা না-জানুক গনি বয়াতি। লাঙ্গল-কোট থেকে একটা বয়না এসেছে। বড় বায়না। ভাবলাম তুমি যদি যাও তবে আমার দলটা বড়···। ইতস্ততঃ করে গনি বয়াতি। ওর হয়ত সন্দেহ, রাজী হবে না মালু।

বেশ, আমি রাজি।

খুশি হয়ে ওঠে গনি বয়াতি, বলে, কালই যেতে হবে ভাই।

চলুন, আমি এখুনি যাব আপনার সাথে।

চোখ বড় বড় করে গনি বয়াতি। মালুর স্বরটা স্বাভাবিক নয়। অভিজ্ঞতা দিয়েই জানে গনি বয়াতি, বয়াতিদের ঘোর আসে. সাধন ভজনে মগ্ন পীর আওলিয়াদের যেমন যযবা, বয়াতিদের তেমনি ঘোর। এই ঘোরের সময় ওরা মাতোয়ারা, দুনিয়াদারিটা তখন ভুলে যায় ওরা। চলে যায় অন্য কোন দুনিয়ায়। মালুর কি সে রকম ঘোরের সময় চলছে ?

কোন কথা না বলে হনহনিয়ে পথ ভাংগে ওরা।

এক বছর।

দু বছর।

আরও এক বছর প্রায় ধরে ধরে।

গনি বয়াতির দলে নেচে নেচে গান গেয়ে বছরগুলো কেটে যায়।

আমীর হামজা, সোনাবানের পুরনো কিস্‌সা আজকের মতো করে সাজায় মালু। অভিনয় করে নিজে। নতুন নতুন গান বাঁধে। নতুন নতুন ছড়া বানায়।

গনি বায়তির নামের সীমা নেই। সুবাদ তার এক গাঁ, দু গাঁ, এক মৌজা দু মৌজা নয়, শহর ছাড়িয়ে জিলা ছাড়িয়ে তার নামডাক। সেই গনি বয়াতির সাথে শহর বন্দর গ্রাম, কত জায়গাইনা ঘুরে বেড়াল মালু।

আর কত হাততালি পেল, কত পেলা কুড়াল।

লোকের মুখে বাহবার অন্ত নেই। সাবাস গনি বয়াতি। যোগ্য সাগরেদ বানিয়েছে বটে। ওস্তাদকেও ছাড়িয়ে যাবে এই ছেলে।

এ এক আজব দুনিয়া। ছোটবেলা থেকে যে বাড়িটায় মানুষ মালু তার সাথে এর অনেক তফাত। এ দুনিয়াটার ঢং, এর বোল আচার নীতি সবই যেন অন্য রকমের। ভাল লেগে যায় মালুর। বাকুলিয়ার কথা মনে পড়ে। কিন্তু যাবার জন্য মনে কোন সাড়া জাগে না। আর কোলকাতা ? দরকার কি তার কলকাতায় গিয়ে ? অমন যে মেজো ভাই, সে-ই যখন সঙ্গে নিলনা তখন কলকাতার ধুলোই মাড়াবে না মালু। এক রকম স্থির করে ফেলল ও।

মালু আসার পর থেকে গনি বয়াতির দলটা আরো ফেঁপে উঠল। কত বায়না ফেরত দিতে হয়। কত ডাক শুনেও না শোনার ভান করতে হয়। আর দেখতে না দেখতেই মালু হয়ে দাঁড়াল দলের প্রধান গায়েন।

ঠিক এমনি সময় কেমন যেন বদলে গেল গনি বয়াতির ব্যবহারটা।

তামাক সাজাতে বলে গনি বয়াতি। আপত্তি করেনা মালু। ওস্তাদের তামাক সাজানোতে অগৌরবের কিছু নেই। হুকো বদলাতেও বলে গনি বয়াতি।

ভাল না লাগলে ও পুরনো পানি ফেলে দিয়ে হুকোয় নতুন পানি ভরে দেয়। নলটাও সাফ করে দেয়। ওস্তাদের হুকুম না করতে নেই। ওস্তাদের খেদমতে বিদ্যা আসে, ছোটবেলা থেকেই তো এ কথাটা শুনে আসছে মালু।

কিন্তু, দিনে দিনে গনি বয়াতির হুকুমের মাত্রাটা বেড়েই চলল। বাড়িতে অথবা বাইরে যখন দল নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়, গনি বয়াতি যেন ওর জন্য নিত্য নতুন ফশমাস তৈরী করে চলে। যে কাজের জন্য লোকের অভাব নেই সে কাজটাও মালুকে দিয়েই করাবে, এ বুঝি একটা জিদ হয়ে দাঁড়াল গনি বয়াতির।

তাজ্জব বনে যায় মালু। কেন ওকে সবার সুমুখে ছোট করতে চায়, হেয় করতে চায় গনি বয়াতি? তবে কি ওর নামে কামে ঈর্ষাতুর হয়েছে গনি বয়াতি? দলের ভেতর ওর জনপ্রিয়তা, ওর প্রভাবটা সইতে পারছেনা গনি বয়াতি? তাই যদি হবে, তবে ওকে সোজা বিদেয় না দিয়ে অমন বাঁকা পথ নিচ্ছে কেন গনি বয়াতি? মনে মনে কোন সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয় মালু।

ঝমঝমিয়ে বর্ষা নামল। নাবল তো নাবলই, থামবার নাম গন্ধ নেই। সে কি বৃষ্টি! গোটা আসমান যেন পানির ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়ছে, যেন এ ঝরার কথনো শেষ হবে না।

বেরোবার উপায় নেই। বায়েনদারেরও দেখা নেই। এই বাদলায় কোন্ পাগল জলসা বসাবে। দলের কাজ-কর্ম এক রকম বন্ধ।

গনি বয়াতির বাড়ির বাইরে ছোট একটা ছনের ঘর। সেখানেই বরাবর থেকে আসছে মালু। কবে যে ছন বদলিয়েছিল ঘরটার তার কোন হিসেব নেই। অন্ততঃ গত তিন বছর যে চালে হাত পড়েনি সেটা তো চোখেই দেখল মালু। ফলে এবারকার বর্ষায় হুড় হুড় করে পানি পড়ছে চালের বড় বড় ফুটো দিয়ে।

এরি মাঝে দু একদিন ফর্সা গেল। মালু বলল, বয়াতি ভাই, চালে নতুন ছানি দাও, নইলে যে মরলাম।

আচ্ছা বলে চুপ মেরে যায় গনি বয়াতি।

দ্বিতীয় দিনও বলল মালু। সেদিনও ওই আচ্ছা।

বাড়িতে ছন আছে মজুদ। আয়ও তো কম করেনি ওরা গত তিন বছরে। তবু কেন যে এত বখিলিপনা গনি বয়াতির, বুঝতে পারেনা মালু। এই ঘোর বর্ষাতেও মেজাজটা ওর তেঁতে আগুন হয়।

আর একদিন।

সারা সকাল লক্ষ কোটি ঘড়ার মুখ দিয়ে গলগলিয়ে পানি পড়ল, এমনি বৃষ্টির তোড। হঠাৎ দুপুরের দিকে আকাশটা ফর্সা হযে গেল বৃষ্টিটা। মালু আর গনি বয়াতি দুটো টুল বের করে বসল ওদের বড় ঘরের দাওয়ায়। দেতো মালু একটু তামাক সাজিয়ে দে, বলল গনি বয়াতি।

আমি তো চাকর নই কারো। এ সব কাম হবেনা আমাকে দিয়ে। বেজাহানের মত কথাটা বলে ফেলল মালু।

বুঝি ভিরমি খেতে খেতে রক্ষা পায় গনি বয়াতি, বলে, আচ্ছা বদ দেমাকী ছোকরা তো তুই। এই যে এতটা দিন কাজকর্ম বন্ধ তবু পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি খাচ্ছিস আর ঘুমুচ্ছিস। আর একটু তামাক সাজাতে বললাম বললাম বলে জাত গেল তোর ?

খাওয়ার কথা তোলায় আরো চটে গেল মালু : তা তোমারটা তো খাচ্ছিনা। কাজ করেছি, আয় করেছি। সে আয়তো সবই তোমার হাতে, হাত খরচের জন্যও কোনদিন চেযেছি একটি পযসা ?

কথাটা এত সত্য যে চট করে মুখ খুলতে বুঝি শরম লাগে গনি বয়াতির। মালুকে এতটা চটানর হয়ত ইচ্ছেও ছিলনা ওর। তবু সত্য কথাটা কার ভাল লাগে ? গনি বয়াতিরও ভাল লাগল না।

কিন্তু এই মুহূর্তেই তো উঠে গেছে মালুর মনটা। গনি বযাতিও ধান চালের হিসেব করল ? আর একটা দিনও যদি মালুকে থাকতে হয় গনি বয়াতির বাড়ি তবে সে বুঝি দম বন্ধ হযেই মারা যাবে।

আস্সালামুআলাইকুম। উঠে দাঁড়াল মালু। বেরিয়ে এল।

বিমূঢ়ের মতো শুধু চেয়ে থাকল গনি বযাতি।

কী আশ্চর্য। ওর বেরোবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল আবহাওয়াটা। ও বের হল, বৃষ্টি আর নাবল না।

দ্বিতীয়বার পথে ভাসল মালু।

কিন্তু, কোথায় যাবে মালু ?

সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই গনি বয়াতির আশ্রয়টা পেয়ে গেছিল। আজ কোথায় আশ্রয় পাবে ?

আকাশ পাতাল ভাবে মালু। যতই রাগ জমুক গনি বয়াতির উপর, তার কাছে কৃতজ্ঞ মালু। তার ওস্তাদি, তার বাহাদুরি সবই সে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে মালুকে। কিন্তু, অমন দরাজ যার গলা সে লোকের মনটা কেমন করে অত ছোট হয় ?

ভাবতে ভাবতে পথ চলে মালু। উদয়রাজপুরের হাটে রাত কাটায়। আবার চলে।

কিন্তু, এ কি? হাঁটতে হাঁটতে ও যে তালতলির কাছাকাছি এসে পড়েছে! আর এ কী হয়েছে অঞ্চলটার চেহারা? এ কোন্ দেশ? সুলতানপুর, চাটখিল, এ তো ওর সেই চেনা জানা গ্রাম নয়?

যুদ্ধ লেগেছে, সে খবরটা রাখে মালু। দল নিয়ে এ গাঁও সে গাঁও ঘুরতে ফিরতে যুদ্ধের দু চারটা আলামত যে চোখে পড়েনি ওর, তেমন নয়। আসলে যেখানে ডেরা ফেলেছে গোরারা, যেখানে ঘাঁটি বসেছে যুদ্ধের সে সব অঞ্চল-গুলো ওরা এড়িয়ে চলেছে। কেননা যুদ্ধ শব্দটাই ওদের কাছে বিভীষিকা—আর গোরা সৈনিক মূর্তিমান আতংক।

সুলতানপুর চাটখিলকে বেড় দিয়ে যে রাস্তাটা তালতলিতে গিয়ে পড়েছে সে রাস্তায় পা রেখেই মালু যেন অকস্মাৎ যুদ্ধটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

গ্রামের পর গ্রাম নিঃশব্দ নিঝ্ঝুম। বাড়ি ঘরগুলো যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও। একটা তকতকে উঠান-গুলোতে শ্যাওলা জমেছে, আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। নৈঃশব্দ্যের পীড়নটা সইতে না পেরে গাছের পাখীরাও বুঝি পালিয়ে গেছে কোন দূরদেশে।

গোটা অঞ্চলটা সমর দফতরের দখলে। বেসামরিক অধিবাসীদের তুলে দেয়া হয়েছে। যে যেখানে পেরেছে উঠে গেছে ওরা।

রাস্তাটার পূব দিকের চেহারা অন্য রকম। লম্বা লম্বা ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে ছাড়া ছাড়া বাড়ি। বাসিন্দাদের সরিয়ে সে সব বাড়িতে সৈনিকের ছাউনী পড়েছে। ক্ষেতময় তাঁবুর সারি। দূরে উঁচু ট্রাঙ্ক রোড। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় লরী আর সাঁজোয়া গাড়ির অবিরাম মিছিল চলেছে ট্রাঙ্ক রোড ধরে।

তালতলি এখনো হুকুম দখলের নোটিশ থেকে বেঁচে রয়েছে। যে কোনদিন যমদূতের মতো এসে যেতে পারে পরোয়ানাটা। তাই প্রায় আর্ধেক গ্রামই ফাঁকা। কিন্তু মানুষের ভীড়ে, বেচাকেনার হৈ হট্টগোলে গম গম তালতলির বাজার। তিন বছর আগে ফেলে যাওয়া সেই বাজারটাকে চট করে চিনে উঠতে পারেনা মালু। আড়ে লম্বায় বেড়ে গেছে তার সীমানা, আর কত যে ঘর, ছোট ছোট চায়ের দোকান, মনিহারি, বড় বড় গুদাম। তালতলি আর বাজার নয়, যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ওঠা এক বন্দর।

সে বন্দরে মালু যেন এক আগন্তুক। কেউ ওকে চেনে না। সেও চেনে

না কাউকে। রজনী ময়রার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারটি উঠে গেছে। সেখানে এখন চায়ের ষ্টল। 'চা বিস্কুটের' প্রতিযোগিতায় 'মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' বুঝি হার মেনে পাততাড়ি গুটিয়েছে।

পাটা টনটন করছে মালুর। হাঁটা যায়না আর। রামদয়ালের বৈঠকখানার মাঠটা পেরিয়ে দীঘির পাড়ে উঠে এল মালু। সেই তালগাছগুলো কোন্ আদ্যিকাল থেকে যেমন দাঁড়িয়ে আছে সজাগ প্রহরীর মতো, তেমনি রয়েছে। তালগাছের পিঠে হেলান দিয়ে বসল মালু। দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দিল বাকুলিয়ার মানুষের প্রিয় সেই 'দখিন ক্ষেতে'র দিকে।

কি এক হল্কা এসে বুঝি ঝলসে দিয়ে যায় মালুর চোখ জোড়া। ধূ ধূ রিক্ততায় যেন হাহাকার তুলছে দখিনের ক্ষেত। এক কণা শস্য নেই। এতটুকু সবুজের চিহ্ন নেই। ওপারে বাকুলিয়া, হলুদ সাড়ির সবুজ পাড়ের মতো তার সবুজ রেখা। বড় খাল বরাবর সমর প্রয়োজনে নতুন এক রাস্তা তৈরী হয়েছে। ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটা।

মালু যাচ্ছে কোথায়? রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সে কথাটাই যেন আবার মনে পড়ল মালুর।

তালগাছের একটা ডাল কিসের যেন ঝাঁকুনী খেয়ে মড মড় শব্দে কেঁপে উঠল। চোখ উঁচিয়ে দেখল মালু একটা শকুন উড়ে চলে যাচ্ছে। তার পাখার ঝাপটায় বাবুই পাখির বাসাগুলো ঝড়ের দোলা খেল, একটি বাসা খসে পড়ল মালুর সুমুখে।

হাতে নিয়ে দেখল মালু, বাবুই দম্পতির যুগল চেষ্টায় কি চমৎকার সৃষ্টি। কুটো ছোবলা আর খড়ের নিখুঁত ঘন বিন্যাসে সুন্দর এক কারুকর্ম। খড়কুটো দিয়ে অমন সুন্দর জিনিস মানুষও বুঝি বানাতে পারবে না। কেন যেন বাসাটা নিজের গাটরিতে ভরে রাখল মালু।

রাণুদি ডাকে।

নামটা শুনেই ধড়ফড়িয়ে উঠল মালু। সুমুখে দাড়িয়ে রাণুদের বাড়ির চাকরটা। রাণুদি মনে রেখেছে ওকে? না দেখার দূরত্বে অচেনা হয়ে যায়নি মালু? কিন্তু রাণুদি ওকে দেখল কখন? বিস্ময়ের চোখে আরও কত কি যেন জিজ্ঞেস করল মালু।

মালুর প্রশ্নগুলো বুঝি আন্দাজ করেই বলল ছেলেটি: দীঘির পারে যখন উঠে আসছ তুমি, আমরা দেখে ফেললাম।

গাটরিটা বগলে নিয়ে ওর পিছু পিছু পরিচিত দালানটায় উঠে আসে মালু।

রাণুদি! অস্ফুটে যেন উচ্চারণ করল মালু। টিপ করে একটা প্রণাম রেখে দিল রাণুর পায়ের পাতায়।

ষাট ষাট, হয়েছে। আস্তে করে ওর হাত ধরে পাশের চেয়ারটায় ওকে বসিয়ে দিল রাণু।

অবাক মানে মালু। রাণুর চেয়েও বিঘত খানিক উঁচিয়ে গেছে ও। আর আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে রাণুদি। শরৎ রোদের মত মিষ্টি উজ্জ্বল রাণুর মুখ। সে মুখের দিকে এক পলক চেয়েই বুঝল মালু, ওকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছে রাণু।

কিন্তু, হঠাৎ কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেল রাণু, বলল, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন ?

এ প্রশ্নে আবার কোন জবাব হয় ? কী বলবে মালু!

রাণুর গাম্ভীর্যটা কিসের যেন পূর্বাভাস। গম্ভীর মুখখানি তার কি এক করুণায়, কি এক মমতায় কাতর হয়ে আসে, চোখ জোড়া ভরে যায় পানিতে। ধীরে ধীরে বলল রাণু, মালু, তুই বড় অভাগা। এত অল্প বয়সে বাবা মাকে হারালি ?

রাণুর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল কেঁপে কেঁপে ঝরে গেল।

আর কিছু বললনা রাণু।

মালুও জিজ্ঞেস করলনা কিছু।

কী-ই বা জিজ্ঞেস করার আছে মালুর। বাবা মার যেটুকু অস্তিত্ব ওর জীবনে সত্য সে হল বাল্যের আর কৈশোরের কতগুলো তিক্ততা যা কোনদিন ভুলবে না ও। এ ছাড়া তাঁদের উপস্থিতি বা অভাবটা কখনো অনুভূত হয়নি ওর জীবনে। বাবা মাকে বাদ দিয়েই যেন শুরু হয়েছিল ওর জীবন। ওদের ছাড়াই সে বেঁচেছে, বেড়েছে, বাঁচবে ও। বুঝি তাই রাণুর মুখে অকস্মাৎ সংবাদটা শুনে দুঃসংবাদ বলে মনে হয় না ওর, দুঃখের বা শোকের কাতরতা জাগেনা মনে। ওরা যদি বেঁচেও থাকত, মালু কি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারতো ?

ওর মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে রাণুও বুঝি কম অবাক হয় না। এখন কি করবি ? অনেকক্ষণ পর শুধাল রাণু।

এ প্রশ্ন নিয়েই তো ভাবছে মালু। কিন্তু জবাব যে এখনো খুঁজে পাচ্ছে না ও। নিজেই যেন একটা উত্তর খুঁজে পেল রাণু: পড়বি ? নিজের চেষ্টায় আজকাল কত ছেলে পড়াশোনা করছে, মানুষ হচ্ছে!

বলা তো খুব সোজা। থাকব কোথায়? খাব কি?

কী যেন ভাবল রাণু। শুধাল—কাজ করবি?

হ্যাঁ।

বেশ, খুড়োর দোকানে দিনের বেলায় কাজ করবি। রাতের মাষ্টার সাহেবের কাছে পড়বি। কথাটা বলে রাণু আর একটুও সময় দিলনা ওকে। স্নানের তাড়া দিল। খাবার তাড়া দিল। নিজেই খুলে ফেলল ওর গাটবিটা। অবাক হল: এটা আবার কি?

দেখতেই তো পাচ্ছ বাবুই পাখির বাসা। ওর একটা গোপন জিনিস অন্যায় ভাবে রাণু দেখে ফেলেছে বলে রুষ্ট হল মালু।

তুই কি ভাবিস, এখনো সেই বাচ্চা ছেলেটি রয়েছিস? বাবুই পাখির বাসাটা ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দেয় রাণু।

মাসিক সাত টাকা বেতন।

রামদয়ালের মনিহারি দোকানটায় বহাল হয়ে গেল মালু। খাওয়া দাওয়া আর জামা কাপড়ের খরচ দোকানের। নিরাশ্রয়ের পক্ষে খুসি হবার মতোই ব্যবস্থা। কিন্তু, মালুর খুসিটা বুঝি অন্য কারণে।

রাণুর খুড়তুতো ভাই অশোক। থাকে কোলকাতায়। জাপানী বোমার আতংকে আর মাথার উপর হরদম উঁচিয়ে থাকা খড়গের মতো হুকুম দখলের ভয়ে গ্রামকে গ্রাম যখন বিরানা হতে চলেছে, সেই সময়টিতে কেন যেন গ্রামে বেড়াবার সখ জেগেছে অশোকের। সারাদিন টোঁ টোঁ করে, কিন্তু সকাল আর বিকেল বেলাটায় তার বাঁধা কাজ। সকালে ও গান শেখায় মেয়েদের আর বিকেলে ছেলেদের। অশোককে কেন্দ্র করে তালতলির প্রায় মরে যাওয়া ক্লাবটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সকাল বিকেল ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিচিত্র কণ্ঠ আর যন্ত্রের নানা রকম স্বর-নিক্কণে মুখর থাকে ক্লাব-ঘর। মালুর চোখে অশোক এক পরম বিস্ময়। নিষ্প্রাণ তার, জড়-যন্ত্র, কেমন বোকার মতো সব পড়ে থাকে ক্লাবের শতরঞ্চির উপর, অথচ অশোকের সামান্য একটা আঙ্গুলের ছোঁয়ায় কি বিচিত্র সুরে কথা কয়ে ওঠে। যে মানুষের স্পর্শ পেয়ে অমন নিষ্প্রাণ বস্তুগুলোও জেগে ওঠে, রিনরিনিয়ে বেজে ওঠে, না জানি কি মহামন্ত্র সে মানুষের আয়ত্তে।

সে যন্ত্রের ঝংকারে, বাদ্যের তালে গান ধরে অশোক, উঠতি পড়তি গলার বিচিত্র স্বরে, সুরের গমকে এ এক নতুন ধরনের গান। এ গান কখনো শোনেনি মালু। বাদ্য ঝংকারে অনুপম মিতালির সে গান যখন ভেসে আসে মনটা মালুর আনচান করে। অস্থির হয়, দোকানের কাজ ফেলে ও ছুটে আসে ক্লাব ঘরটার দিকে।

বলি বলি করেও বলা হয় না মালুর কথাটা। ঘুর ঘুর করে, প্রতিদিন সন্ধ্যায়। কিন্তু ক্লাবের ভেতরে যাবার সাহসটা কিছুতেই সঞ্চয় করতে পারেনা মালু। শেষে মরিয়া হয়ে কথাটা বলেই ফেলল মালু, অশোকদা, আমায় বাজনা শেখাবেন?

কেমন মানুষ অশোক! মালুর দিকে একবার তাকালনা, ও কথাটা কানে তুলল কিনা তাও বোঝা গেল না। শুধু বলল, বেশ, আয়।

পিছে পিছেই এল মালু।

হারমোনিয়মে সা-রে-গা-মা-র প্রথম পাঠে ওকে লাগিয়ে দিল অশোক।

বা-রে, আমি তো বাজনা শিখতে চাই, বলল মালু।

আরে পাগল! সারেগামাটা আগে ধরতে শেখ তো, তার পর বাজনার তালবোল নিজেই ধরতে শিখবি।

অশোকের বিরাটত্বে এতদিন মুগ্ধ ছিল মালু। আজ বুঝি ধন্য আর কৃতার্থ হল ওর স্নেহের ছোঁয়ায়।

সারেগামার গদ্ টানতে টানতে দুর্বোধ্য যন্ত্রগুলোর দিকে বুভুক্ষুর মতো চেয়ে থাকে মালু। কবে, কবে ও ছুঁতে পারবে ওই যন্ত্রের বিস্ময়কে! কবে ওর আঙুলের স্পর্শ পেয়ে কথা কয়ে উঠবে ওরা, যেমন ঝংকার দিয়ে ওঠে অশোকের অঙ্গুলি স্পর্শে? কবে ওর মনের সুরটা যন্ত্রের ধ্বনিতে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের কানে, বাতাসে বাতাসে?

এতদিন আপন মনে যেমন খুসি গেয়ে এসেছে মালু। গনি বয়াতির কাছে শুধু কয়েকটি পালা আর গানই শিখেছে মালু। কিন্তু গানের যে কত বিধি-বদ্ধ নিয়ম, রাগ-রাগিনীর শৃঙ্খলা, তাল বোলের কত কলা কৌশল, অশোকের কাছে এই প্রথম সে কথাটা শুনল মালু।

অদ্ভুত তোর গলার খাঁজ, বাজনার সাথে চমৎকার খুলবে রে! অশোকের প্রশংসায় দশহাত ফুলে ওঠে মালুর বুকটা।

কিন্তু জানিস, সুরের সাধনা বড় কঠিন, দীর্ঘ সাধনার ধন এই সঙ্গীত।

সাধনা? বুঝতে না পেরে শুধায় মালু।

মানে লেগে থাকতে হবে আর কি! জোঁকের মতো আঁকড়ে থাকবি, ছাড়বি না।

অশোকের কথায় কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায় মালুর।

তালিম দেয়া গলা নয় ওর। কসরত করতে হয়নি ওকে সুরের জন্য। বেগ পেতে হয়নি কথার জন্য। ওই পাখির ডাক, দোল-খাওয়া পাতার শন শন, ঝরে পড়া পাতার মর্মর থেকেই বুঝি ধ্বনির অলক্ষ্য চেতনা পেয়েছে ও। বড় খালের কুল কুল তরঙ্গ, বাতাসের মন্ত্র গুঞ্জন, এ সবই তো ওর সুরের উপাদান, সেখান থেকেই এসেছে ওর সুর। তাই সুরটা ওর স্বভাব, সুরের প্রকাশটা সহজ এক অভিব্যক্তি ওর কাছে। সে সুর নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হয়রান হতে হবে, কসরৎ করতে হবে, এ সব কথা ওর কাছে একেবারেই নতুন।

অবিচল নিষ্ঠায় বছরের পর বছর অক্লান্ত সাধনা। ধৈর্য আর তিতিক্ষা। তবেই না পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর গৌরব, বুঝলি? অশোক যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে তাকায় মালুর দিকে।

ঘাড় নাড়ে মালু। যেন খুব বুঝেছে ও।

বুঝুক না বুঝুক অশোকের সব কথাই মন দিয়ে শোনে ও। ভাল লাগে শুনতে। প্রথমটায় যেমন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল অশোক, ধীরে ধীরে সে অবস্থাটার পরিবর্তন হয়। অশোক কিছুই যেন স্পষ্ট হচ্ছে, বুদ্ধির নাগালে ধরতে পারছে মালু।

সারেগামার পাঠ সারতে দেরী লাগলনা মালুর। তবলা সারেঙ্গী সেতার এসরাজ, একে একে যন্ত্রগুলো ওকে চিনিয়ে দেয় অশোক। মালু হাত দিয়ে ধরে, স্পর্শ করে সেই বিস্ময়কর জড়পদার্থগুলো, যার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে মানুষের মনের সুর, হৃদয়ের কথা।

টংকার খাওয়া সেতারের তারটির মতোই যেন কেঁপে কেঁপে যায় মালুর দেহের তন্ত্রীগুলো। এযেন অজানা পৃথিবীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা দুরাশার ঘন আন্দোলনে বেহুঁশ হওয়া। জ্ঞানীর গুণীর ধ্যানীর জগৎ, শুধু গান নয়, শুধু সুর নয়—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দ ধ্বনি তরঙ্গের লয় প্রলয়, কোমল বিন্যাস—সে যে সঙ্গীতের জগৎ, সাধনার জগৎ, সেখানে মালু বয়াতির স্থান হবে কি?

যত্ন করেই ওকে শেখায় অশোক।

অশোকদা খুব ভাল। অশোকদা খুব চমৎকার। মনে মনে উচ্চারণ করে মালু।

কিন্তু সব ভাল কাজেই যেন শুধু বাধা আর বিপত্তি।

আবার গান নিয়ে মেতেছিস? পড়বি বলে না কথা দিয়েছিলি আমায়? চোখ মুখ লাল করে ধমকায় রাণু।

আহা পড়ার সময়টা কি চলে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু, অশোকদা চলে গেলে এ সব নতুন ধরণের গান বাজনা শিখবে কোথায় মালু?

মালুর যুক্তিতে মন গলে না রাণুর। বলে, বেশ গান নিয়েই থাক, আমি খুড়োকে বলে দিচ্ছি চাকরীর আর দরকার নেই তোমার।

রেগে মেগে ওকে তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছে রাণু।

কেঁদে দেয় মালু।

গলে যায় রাণুর মনটা। হেসে দেয়, বলে, কত বড় হয়েছিস, খেয়াল আছে? আয়নার চেহারাটা একবার দেখিস। এ্যাদ্দিনে অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা তোর পাশ করে ফেলা উচিত।

রাণুর হাত থেকে রেহাই পেল মালু। কিন্তু রামদয়ালের মতো বাধাটা ডিঙ্গিয়ে যাবার শক্তি কোথায় মালুর।

যুদ্ধ লাগার পর থেকেই মনোহারি দোকানটার দায়িত্ব ভাই পো রমেশের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে রামদয়াল। সাবেক দোকানটার সীমানা থেকে পুরো তালতলি বাজারের আর্ধেকটা জুড়ে লম্বা তিনটি গুদাম ঘর, মাঝারি গোছের চারখানি দোকান ঘর। সেই প্রাচীন মনোহারি দোকানটার সাথে যুক্ত হয়েছে এগুলো। চালডাল সুপুরির আড়তদারি, কণ্ট্রোলের তেল চিনি কাপড়ের ডিলারি, কত রকমের কারবার রামদয়ালের। যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে উঠেছে রামদয়ালের ব্যবসা। এক এক গুদাম, এক এক দোকান পৃথক পৃথক আত্মীয়-কর্মচারির জিম্মায়, কিন্তু সবটার উপর রামদয়ালের তীক্ষ্ণ নজর। দোকান আর গুদামগুলোর ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একখানি ঘর। সেখানে বসে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে রামদয়াল। এ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ দোকান পালান কঠিন।

অবশ্য মালু যে ভাবে যায় তাকে আর যাই বলা হোক, পালান বলা চলে না। প্রথমতঃ রমেশের অনুমতি নেয় ও। দ্বিতীয়তঃ যে সময়টিতে যায় মালু ওটা দোকান বন্ধ হবার সময়। বড়জোর পনেরো বিশ মিনিট আগে চলে যায় ও। একমাত্র ব্যতিক্রম সপ্তাহের দুটো হাটবার। সে সময় তো রাত বারটা কখনো একটা পর্যন্তও খোলা থাকে দোকান। হাটবারে সকাল বেলায় গিয়ে কিছুক্ষণ গলা সেধে আসে মালু। এ ব্যবস্থাই হয়েছে অশোকের সাথে।

কিন্তু, বিশ মিনিটই হোক আর দশ মিনিটই হোক, দোকান খুলতে দেরী

করা অথবা আগে ভাগে বন্ধ করা, রামদয়াল তা সইবে কেন ? ওকে কি এই জন্য মাইনে দিচ্ছে রামদয়াল ?

দু একদিন কানআড়ি শুনেছেও মালু। রমেশকে জিজ্ঞেস করছে রামদয়াল: এই রমেশ ওই নেড়ের বাচ্চাটা আগে আগে কোথায় বেরিয়ে যায় রে ?

অমন চটপটে, বি-এ পাশ, গুণী লোক অশোক, তারই বড় ভাই রমেশ। কিন্তু হলে কি হবে, বুদ্ধিতে একেবারে নীরেট বলে কলকাতার ব্যবসায় কোথাও স্থান হয়নি তার। তাই এই গ্রামের দোকানটায় বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। কোথায় একটু ছিপিয়ে ছুপিয়ে বলবে, তা নয়, একেবারে সোজাই বলে ফেলল, কেন, ওই ক্লাবে ? ওতো গান শেখে অশোকের কাছে।

কাকে বলে যায় ও ? গম্ভীর, কৈফিয়ত তলবের স্বর রামদয়ালের।

আমাকে বলে। আমি তো ছুটি দিয়ে দিই ওকে। সরল মনে সত্য কথাটাই বলে রমেশ।

গর্জে উঠেছিল রামদয়াল। তারপর ভাইপোর উদ্দেশ্যে কি কি সব শ্রাব্য অশ্রাব্য উক্তি করেছিল রামদয়াল সে সব শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি মালু।

কিন্তু তক্ষুণি তক্ষুণি মালুর তলব পড়েনি। তার পরদিন অথবা পরের সপ্তাহেও না। হয়তো ভুলেই গেছে রামদয়াল। আর মাটির মানুষ রমেশদা, সে তো কিছুই বলেনা মালুকে।

মালুর সাহসটা যায় বেড়ে।

রমেশদা যাই ? বলে একটু আগে ভাগেই বেরিয়ে পড়ে মালু।

কথায় বলে সাতদিন চোরের, একদিন গেরস্তের।

দোকান থেকে বেরিয়ে সবে মোড়টা নিয়েছে মালু, সুমুখে রামদয়াল।

এদিকে আয়, দোকান ঘরে ঢুকে ওকে ডাক দেয় রামদয়াল।

অপরাধীর মত এসে দাঁড়ায় মালু।

এটা চাকরি, দোকানের কাম, মামা বাড়ি নয়। বলতে বলতে মালুর গালে ঠাস ঠাস্ কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয় রামদয়াল। অতর্কিত আক্রমণে বুঝি হকচকিয়ে যায় মালু, পেছনে সরে পরিস্থিতিটা বুঝবার আগেই একটা কেরোসিন টিনের গায়ের পা লেগে পড়ে যায় ও।

ব্যাটা, ভাব তুমি, কিস্সু নজরে পড়েনা আমার ? বেরিয়ে যায় রামদয়াল।

উঠে দাঁড়ায় মালু। কী এক দুরন্ত উত্তাপে টগবগিয়ে উঠতে চায় মালুর তরুণ রক্ত। হাতটা মুঠো করে ও। অনুভব করে, আর যেন এই প্রথম অনুভব করে, শক্তি আছে, বিপুল শক্তি ওর দেহে।

না। রাণুদির জ্যাঠা মশায়কে মেরে, রাণুদিকে মুখ দেখাবে কেমন করে মালু? মুঠো ওর শিথিল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে ক্লাবের দিকেই চলে যায় ও।

প্যাঁ পুঁ করাই সার হল। সুর সাধনা আজ জমল না। ভয় জেগেছে মালুর, আজকের ঘটনার পর চাকরি নিশ্চয় থাকবে না ওর। তা হলে? তা হলে অশোকদার সযত্ন শিক্ষকতায় গান শেখার ইতি হবে এখানেই?

আগাগোড়া শুনে হেসেই খুন রাণু। বলে, তুই একটা বোকা। আরে যুদ্ধের বাজারে লোক ওরা পাবে কোথায় যে তোকে জবাব দেবে?

সত্যি তাই। সকালে যথারীতি দোকান খুলল মালু। রমেশ বা রামদয়াল কেউ মুখটা পর্যন্ত খুলল না, যেন কিছুই হয়নি।

শুধু একটা নতুন নিয়ম চালু করল রামদয়াল। ওই দোকান ঘরেই ঘুমুতে হবে মালুকে। এতদিন ওর ঘুমুবার জায়গাটা ছিল অন্যত্র।

সঙ্গে সঙ্গেই রাজি মালু; কিন্তু যখন আপনি ক্যাশ বন্ধ করে ফিরবেন তখন আমাকেও বন্ধ করে যাবেন।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। দোকান বন্ধ হয় সন্ধ্যার পর পর। মালু কি তখন থেকেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে নাকি? না করতে পারেনা রামদয়াল।

রামদয়ালের দুষ্ট চালটা ব্যর্থ গেল। দিব্যি গানটান সেরে শুতে আসে মালু। রাত তখন কখনো বারটা, কখনো আরো বেশি। রামদয়াল তখনো সরকার মশায়কে নিয়ে হিসেব মিলাচ্ছে।

কী কাল যুদ্ধ।

আর কী সর্বনেশে!

সব কিছু লণ্ডভণ্ড, তছনছ করে দিয়ে গেল। যেন লক্ষ কোটি শকুনি পাখা বিস্তার করেছে আকাশে। যে আলোয় আলোকিত থাকত পৃথিবী সে আলোটা আড়ালে পড়েছে। পৃথিবীময় শকুনী পাখার অন্ধকার ছায়া। শকুনির হিংস্র কুটিল দৃষ্টি আগুন ঝরিয়ে চলেছে, সে আগুনে মাটি পুড়ছে। মানুষ, জানোয়ার, পৃথিবীর সভ্যতা, পৃথিবীর সবুজ, পুড়ে পুড়ে খাক হচ্ছে। শকুনির লোলুপ জিহ্বা বয়ে টপ টপ বিষ ঝরছে। সে বিষ মাটিতে মিশে, মানুষের গায়ে লেগে ছড়িয়ে চলেছে রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ।

সেকান্দর মাষ্টারের স্বপ্নটাও ছিনিয়ে নিয়েছে এই সর্বনেশে যুদ্ধ।

সব ছারখার হয়ে গেল রে, মালু। সব ছারখার হয়ে গেল। কেমন শুকনো ম্লান মুখে বলে সেকান্দর মাষ্টার।

শত দুর্যোগ, শত অনটনের মাঝেও যে স্বপ্নটিকে ও শুকতারার মত জ্বালিয়ে রেখেছিল চোখের সুমুখে যুদ্ধের শুরুতেই সেই স্বপ্নের কবর খুঁড়ে চলে গেছে সুলতান। পড়াশোনার দরকার নেই তার। টাকা কামাবে সে, তাই কামাইয়ের জন্য যুদ্ধের হাটে নেবে পড়েছে ও।

জীবনের অপূর্ণ যত স্বাদ ছোট ভাইটির সার্থকতার মাঝে পূর্ণ করবে বলে এত যে তার আয়োজন সবই ব্যর্থ করে দিয়ে গেল সুলতান। বুকটা বুঝি ভেঙ্গে পড়েছিল সেকান্দর মাষ্টারের। নিমেষের জন্য সমস্ত শ্রম সমস্ত উদ্যোগ আর তিল তিল ত্যাগ, সবই যেন অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ মানুষের লক্ষ দুঃখ ওর একার দুঃখটাকে যে কখন ভাসিয়ে নিয়ে গেল টেরই পেলনা সেকান্দর।

এমনিতেই কাজ কি তার কম? জাহেদের চাপিয়ে দেওয়া সেই দায়িত্ব, স্কুলের কাজ, ডানে বাঁয়ে তাকাবারও সময় দেয়নি ওকে। তার উপর যুদ্ধ বিশৃঙ্খল জীবনের হাজার ফরিয়াদ, লক্ষ অনাচার, একটি প্রতিকার ; ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, নিজের বলতে সব কিছুই যেন চাপা পড়ে গেছে এত কিছুর মাঝে।

মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কান্না পায় মালুর। তিনটি বছরের প্রতিটি দিন, এক হাজার পঁচানব্বইটি দিনের প্রতিটি ঘণ্টা আর মিনিট অসংখ্য চিন্তা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার রেখায় দাগে যেন এক একটি করে ছাপ ফেলে গেছে তার মুখে। অকাল বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সেকান্দর মাষ্টারের মুখে, মাঝ কপাল বরাবর এক পোঁচ সাদা চুলে। তিনটি বছর এমন নির্দয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে কোন মুখে মাষ্টার সাহেবকে না দেখলে কোনদিনই বিশ্বাস করতনা মালু।

কিন্তু মাষ্টার সায়েব, যে ভাবে ছুটোছুটি করছেন আপনি তো মরে যাবেন ?

বলিস কিরে? মরে যাব? মালুর কথাটা কেড়ে নেয় সেকান্দর মাষ্টার। বলে, চোখে যদি দেখতিস কাণ্ডকারখানা তবে বলিতিসনা এ কথা। সুলতানপুর চাটখিল গোটা মৌজাটার উপর নোটিশ পড়ল, তিনদিনে খালি করতে হবে। কমসে কম হাজার কুড়ি মানুষ তো হবেই, তিন দিনে বাড়িঘর খালি করবে কেমন করে? আমি তো ভাবলাম এই হুড়োহুড়ি

টানাটানির চোটে আর্ধেক লোকই বুঝি সোজা বেহেশতের দিকে রওনা দেবে। বলে কয়ে গোরা সাহেবটার কাছ থেকে আর একটা দিন বাড়িয়ে নিলাম। গরু বাছুর কাঁথা বালিস খোরা শানকি সব নিয়ে যে যেদিকে পারল চলে গেল। গুণে দেখি, ওমা, মরল মোটে গণ্ডা দেড়েক মানুষ আর এক জোড়া বুড়ো বলদ।

বলে কেমন ম্লান করে হাসে সেকান্দর। মালুর মনে হয় সে হাসিটা কান্নারই আর এক রূপ। তারপর সেকান্দর মাষ্টার জুড়ে দেয় শেষ বাক্যটা: এখন বুঝলি তো, মরা কত কঠিন? মরাটা যেমন সহজ তেমনি কঠিনও।

অপলক চেয়ে থাকে মালু। ওর আবাল্য শ্রদ্ধার মানুষ মাষ্টার সাহেব। আজ আবার তার পায়ের ধূলো নিল মালু।

থাক থাক। বুঝি বিব্রত হয় সেকান্দর মাষ্টার।

হঠাৎ অমন নাটকীয় ভাবে কদমবুসি করার মত কি ঘটল বুঝতে পারেনা সেকান্দর! হাত দুটো ধরে মালুর ঝুঁকে থাকা কাঁধটা উঠিয়ে আনে ও। যেন গভীর মনোযোগে চেয়ে থাকে মালুর মুখের দিকে। ছলছলিয়ে ওঠে ওর চোখজোড়া, বলে: বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস রে! বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিস তুই। শেষ দেখাটা তুইও দেখলিনা, ওঁরাও দেখলেননা। সে দুঃখটাই সব সময় আমার মনে বাজে।

বুঝি অতীতের সেই দুঃখ দিনটিই ভেসে উঠেছে মাষ্টারের মনের পর্দায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ ছিলেন মুন্সিজী। পরিষ্কার নিখুঁত কেরাত ধরে দোয়া পড়েছেন আর শুধু তোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন। গরু খোঁজার মতো খুঁজলাম তোকে। হয়তো খবর পেলাম অমুক বাজারে আছিস, গিয়ে দেখি, কোথায় কি?

থামল সেকান্দর। ছাতাটাকে কোলের উপর তুলে শুইয়ে রাখল। বলল আবার: তিনটি মাস যেতে না যেতেই তোর আম্মাও অসুখে পড়লেন। সে অসুখই তাঁর শেষ অসুখ। আমার কি মনে হয় জানিস? ওদের কাছে শেষ জীবনের ওই পরিহাসটার চেয়েও বড় ছিল তোকে হারানোর শোক। শোকেই···হঠাৎ সেকান্দরের নজরে পড়ে, মালু শুনছেনা ওর কথাগুলো। হাতে একটা ন্যাকড়া প্যাঁচিয়ে চাটাই ঘঁসছে মালু। ঘঁসে ঘঁসে ময়লা তুলছে। যখনি দেখা হয়েছে মাষ্টারের সাথে প্রসঙ্গটা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়েছে। আর নির্বাক অন্যমনস্কতায় আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে মালু। মাষ্টার সাহেবের সমবেদনা এতটুকু দাগ কাটে না ওর মনে। ভারি হয় না মনটা।

অমন যে মালু, একটুতেই জলে ভরে আসত যার চোখ, সেই মালু অনেক সাধ্য সাধনা করেও ঝরাতে পারেনা এক ফোঁটা অশ্রু। রাণুদি, মাষ্টার সাহেব, ওদের সমবেদনার জবাবে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের খাতিরেও না। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন কঠিন হয়ে আসে ও। চোখজোড়া যায় শুকিয়ে। আর সেই শুকনা চোখের গর্ত থেকে কি এক জ্বালা উঠে আসে। সে জ্বালায় কপালের শিরা আর মাথার ঝিল্লিগুলো দপদপিয়ে ওঠে, সারা দেহে আগুন ছড়ায়।

যেন কলঙ্কের ভারে নুয়ে ছিল ওর পিঠটা, ছোট ছিল ওর মুখটা। আব্বা আম্মা মরে গিয়ে সে ভার থেকে মুক্ত করেছে ওকে। সিধা হয়ে আজ দাঁড়াতে পারবে ও, মুখ বড় করে কথা বলতে পারবে। কেন এমন মনে হয় মালুর?

দুঃখ সওয়া, দুঃখ নেওয়া খুব বড জিনিস রে মালু, খুব বড় জিনিস, দুঃখের আগুনে যে না পুড়েছে সে চিনতে পারেনা, জানতে পারেনা এই দুনিয়াটাকে। ভুল করে ওকে সান্ত্বনা দেয় সেকান্দর মাষ্টার।

চোখ তুলে তাকায় মালু। ঘরে ঘরে যুদ্ধের সর্বনাশ ডাকা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটাতে সান্ত্বনা, সহিষ্ণুতা আর আশার প্রতীক সেকান্দর মাষ্টার। কিন্তু তাঁকে কি সান্ত্বনা দেবার আছে কেউ? অথবা, আত্মবোধটাকে একেবারেই বিসর্জন দিয়েছে সেকান্দর মাষ্টার, তাই নিজের জন্য সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়না তাঁর।

উঠি এখন। শিমুল পাডাটাকে একেবারেই পুড়িয়ে দিয়েছে গোরাগুলো। যাচ্ছি সেখানে রিলিফ নিয়ে। কাল নাও ফিবতে পারি।

ছাতাটা বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সেকান্দর মাষ্টার। কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় আবার বসে পড়ে।

ওহ্ হো ভুলেই গেছিলাম, জাহেদ লিখেছে যেমন করে হোক তোকে খুঁজে বের করতে আর তোর লেখা পডার ব্যবস্থা করতে। বুক পকেট থেকে খামটা বের করে মালুর হাতে দেয় সেকান্দর। আর রাস্থ খবর পাঠিয়েছে শ্বশুর বাড়ি থেকে, তুই যেন একবার বেড়িয়ে আসিস।

তা হলে মেজো ভাই ভোলেনি ওকে? চিঠিটার উপর চোখ বুলিয়ে কী আনন্দে নেচে ওঠে ওর মনটা। কিন্তু রাস্থ! অবাক মানে মালু। রাস্থর মুখটা সত্যিই ভুলে গেছে ও।

চল্ আমার বাড়িতেই থাকবি তুই। দোকানে কাজ ছেড়ে দে। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে বলল সেকান্দর।

ধপ করে যেন পড়ে গেল আনন্দে নেচে ওঠা সেই মনটা। কী আতংকে চেঁচিয়ে উঠল মালু : না না মাষ্টার সাহেব, বাকুলিয়া যাবার কথা বলবেন না আমায়, সে আমি পারব না, কোনদিন না।

তুই, তুইও একথা বললি? এখনো হুকুম দখলের নোটিশ পড়েনি। কিন্তু, জানিস এরি মাঝে আর্দ্ধেক গ্রাম খালি? শূন্য ভিঁটিগুলো দেখে মনে হয় খোলা বুকে মাতম করছে না ওরা, ওরা অভিশাপ দিচ্ছে, অভিশাপ। ধিক্কার দিচ্ছে তোকে, আমাকে সবাইকে, সমগ্র মানবজাতিকে। মাটির অভিশাপ। আমি তাকাতে পারি না। চোখ বুজে হাঁটি।

রেগে গেছে সেকান্দর। রাগটাকে সামাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায় ও। নিথর নির্বাক মালু। চেয়ে থাকে মাষ্টারের ছেড়ে যাওয়া টিনের চেয়ারখানার দিকে।

অসাবধানে বলে ফেলেছে মালু, কিন্তু, সে তো ওর মনেরই কথা। কেমন করে ও ফিরে যাবে বাকুলিয়ায়? রাবু, আরিফা, জাহেদ, যাদের কেন্দ্র করে ওর বাকুলিয়ার শৈশব, বাকুলিয়ার আনন্দ, ওরা তো কেউ আপন নয় ওর। সে সব দিন, সে সব আনন্দ পরভূতের গ্লানি, উচ্ছিষ্ট ভোজির অনধিকার। সে আনন্দের স্মৃতি আজ শুধুই দুর্ভার। সে স্মৃতি আজ বেদনা দেয়, কি এক অপমানের জ্বালা ছিঁটিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। ওর এই মনের কথাটা কি বুঝবেনা মাষ্টার সাহেব?

মাষ্টার সাহেবের সেই বেদনা-পীড়িত ক্ষুব্ধ মুখের ছবিটাই বার বার ভেসে ওঠে মালুর চোখের সুমুখে। আর ছোট বেলার যে সব স্মৃতি বা যন্ত্রণা হয়েই জাগে, সেই স্মৃতিরা কী এক টানে পেছনে নিয়ে যায় ওকে।

মাটিরও কি অভিশাপ আছে? হয়তো আছে। সেই মাটির অভিশাপটা বুঝি মিশে আছে মালুর রক্তে। আর ওর আম্মার অভিশাপ? সে তো এখনো পিছু তাড়া করে চলেছে ওকে!

ছিঃ মালুর মা। অমন করে কহর দেয় না ছেলেকে। মায়ের কহর বড় কঠিন, লেগে যায়। সৈয়দ গিন্নীর সেই তিরস্কারটাও মনে পড়ে মালুর।

তার চেয়েও আশ্চর্য, মিঞা সৈয়দ গ্রাম ছেড়েছে বলে ধিক্কার দিয়ে গান বেঁধেছিল মালু। গোটা গ্রামের মানুষকে শুনিয়েছে সে গান। সেই মালুর কাছে বাকুলিয়া আজ কলঙ্কের সাক্ষী, মর্মন্তুদ কোন যন্ত্রণার পীড়ন? মনটা দমে যায় মালুর। গান আজ একটুও জমল না। বারে বারে সুর কেটে যায়, তালে ভুল হয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে বলে উঠে আসে ও। বস্ মালু।

আজ একটু দেরী হবে শুতে। ওকে দেখে বলল রামদয়াল। বসে বসে আরো খারাপ লাগে মালুর। অতীতটাই ছুটে আসে, ওকে ঘিরে ধরে। বাকুলিয়ার আনন্দ, রাবু আপা মেজো ভাই, ওদের স্নেহ, সবই কি মিথ্যে? তা কেন হবে? আজও তো সেই স্নেহের টান অনুভব করে চলেছে মালু! মেজো ভাইয়ের চিঠির ছত্রে নিজের উল্লেখ দেখে নেচে ওঠেছে ওর মন।
রাত বেড়ে যায়। ঠেস তোলা টুলে বসে বুঝি ঘুমে ঢুলে পড়ে মালু। হঠাৎ লরীর শব্দ পেয়ে ঢুলুনিটা ভেঙ্গে যায় মালুর। তেরপাল দিয়ে ঢাকা দুটো লরী এসে থামল রামদয়ালের গুদাম ঘরের সামনে।
ফিস ফিস কথা চলে ওদের। উসখুস করে মালু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বারটা বেজে মিনিটের কাঁটা ডান দিকে হেলে পড়েছে।
না না, সে সম্ভব হবে না। হঠাৎ উচ্চস্বর ভেসে আসে রমজানের।
আরে হবে হবে। তুমি ইচ্ছে করলেই হবে। অনুনয়ের স্বর রামদয়ালের।
আহা বুঝছেন না আপনি, গাড়ি যে মালে বোঝাই। ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে রমজান।
কয়টিই বা বস্তা আমার। যতই মালে ঠাসা থাকুক, অত বড় গাড়িতে চার পাঁচটি বস্তা কি আর ধরবে না? চল দেখি না?
রামদয়াল লরীর ভেতরটা দেখবার জন্য উঠতে যাচ্ছে দেখে লাফিয়ে উঠে ওর পথটা আগলে দাঁড়ায় রমজান।
বলে, আচ্ছা দেন দেন। কিন্তু পাঁচ বস্তার বেশি নয়।
হাসির একটি চতুর রেখা খেলে যায় রামদয়ালের মোচের ফাঁকে।
ডাক পড়ে মালুর।
ওই চিনির গুদাম খোল্। পাঁচটা চিনির বস্তা বের করে নিজেও মালুর পিছে পিছে আসে রামদয়াল।
বস্তাগুলো বের করার পর হুকুম দেয় রামদয়াল: এই গাড়িতে দুটো আর ও গাড়িতে তিনটে, তুলে দে।
দুমণি বস্তা। কিন্তু পিঠে আর হাতে ভার টানতে টানতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মালু। পিঠ বেঁকিয়ে একটু নীচুতে বসে ও। বস্তার কান দুটো ধরে একটু সুমুখে টেনে নেয়। পিঠ আর বস্তাটাকে সমান্তরাল করে। তারপর পা দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে উপরের দিকে ঠেলে দেয় মালু। বস্তা সুদ্ধ উঠে আসে উর্দ্ধাঙ্গ।
কিন্তু, এ কী 'মাল' রমজানের গাড়িতে। কিষানী মেয়েতে গাদাগাদি। ভর্তি

গাড়ি। ছোট বড় ন্যাকড়ার পুঁটলী হয়ে এ ওর গায়ে সেঁটে রয়েছে। এক তিল ঠাঁই নেই গাড়িতে। এরি মাঝে আচমকা একটা বস্তা এসে পড়ায় এতগুলো 'পুঁটলী' যেন এক সাথে নড়ে উঠল. কি এক আতংকের চাপা আর্তনাদ তুলল। দরজার মুখের দুটো মেয়ে উহ্ করে ছিঁটকে পড়ল পেছনের কয়েকজনের গায়ের উপর দিয়ে। হঠাৎ বস্তা পড়ে বুঝি চোট লেগেছে ওদের পায়ে। ধপাধপ বস্তাগুলো ফেলল মালু।

ওরা ভয়ে মৃত। ওরা আতংকিত। উহ্ করে শুধু সরে গেল। এ ওর গায়ের উপর ভয়ের কম্বল জড়িয়ে পড়ে রইল।

বস্তাগুলো উঠানো হলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল রমজান। গাড়িছেড়ে দিল। ঘুম পালিয়ে গেছে মালুর। ঘুম আর হবে না। বিড়ি তামাক. চিড়া গুড়, তেল সাবান. সব মিলিয়ে মনোহারী দোকানের সে বিচিত্র গন্ধ, শুয়ে শুয়ে সেই গন্ধটা শোঁকে মালু। এ পাশ ও পাশ করে।

এই তবে রমজানের ব্যবসা? সুলতান তার সহকারী? শুনেছে মালু. কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়েছে রমজান। যুদ্ধের হাটে বিচিত্র পণ্যের কারবার তার। রামদয়াল তাব দোসর। ঘরে ঘরে বুভুক্ষু কৃষক বধুরা, নিরাশ্রয় কিষানী কুমারী রমজানের পুঁজির কড়ি।

অন্ধকারেই উঠে বসে মালু। দিয়াশলাই হাতড়িয়ে মোম জ্বালায়। মোমটা একটু কাত করে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বস্তাগুলোর দিকে। কোনের দিকে একটার পর একটা একেবারে ছাদ অবধি সাজানো বস্তার সার, চাল ডাল লবণের। দোকানের মজুদ মাল। এ বস্তাগুলোর মাঝেই কতগুলো নতুন ধরণের বস্তা রেখে গেছে রমজান। ময়লা আলকাতরার দাগ পড়া বস্তা. হাত দিয়ে ছুঁতেই ঘেন্না ধরে। অযত্নে রাখা, অথচ রামদয়ালের কেমন একটা গোপন সতর্কতা। স্টক দেখবার অছিলায় যখন দোকানে ঢোকে রামদয়াল ওই বস্তাগুলোর কাছেও যায় না সে, কিন্তু কেমন আড়চোখে সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখে। মালুর দৃষ্টি এড়ায় না। সেদিনও এমনি গভীর রাতেই গাড়ি থেকে বস্তাগুলো নাবিয়ে রেখে গেছিল রমজান। মালুকে ছুঁতে দেয়নি, নিজেই গাড়ি থেকে বয়ে এনেছিল রমজান। মোমটা কাছের খালি টিনের উপর বসিয়ে একটা বস্তার উপর হাত রাখল মালু। চাল ডালের বস্তার মতো নয়, হাতটা কেমন শক্ত ঠেকে। মনে হয় বস্তার নীচেই পীচবোর্ড। হাতটা একটু চাপতেই ডেবে যায়। অবাক হয় মালু, ভুসিটুসি নয় তো?

দুহাতের বেড়ে একটা বস্তা তুলতে গিয়ে বেকুব বনে গেল মালু। হাতে

যতটা জোর খিঁচেছিল সেই জোর যেন উল্টে এসে ওরই বুকে আছড়ে পড়েছে। একেবারেই হাল্কা বস্তাটা, শুকনো মরিচের বস্তাগুলোও এত হাল্কা নয়।

ডবল সুতোর প্যাঁচে মজবুত করে বাঁধা বস্তার মুখটা। অভিজ্ঞ হাতের ক্ষিপ্র চালনায় সেই মজবুত শেলাইটা খুলে ফেলল মালু। যা ভেবেছি তাই, মুখের দিকে পীচবোর্ডের ঢাকনি মতো। পীচবোর্ডগুলো সরিয়ে হাতটা ভেতরে সেঁদিয়ে দিল মালু। যেন শুকনো পাতার গাদির ভেতর দিয়ে থরথরিয়ে গেল মালুর হাতখানা। খস খস আওয়াজ উঠল বস্তার ভেতর থেকে, শুকনো পাতা গায়ে গায়ে লেগে যেমন খসখসিয়ে ওঠে। এক মুঠো পাতা তুলে আনল মালু। মোমের সামনে ধরে হাতটা তার কেঁপে গেল। পাতাগুলো ঝরে গেল। ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

দু টাকার পাঁচটাকার এক শো টাকার, সব ধরনের নোটই উঠে এসেছে ওই একটি মুঠোতে।

আবার ছুটে গেল মালু। আবার মুঠো ভরে তুলল, মেঝেতে ছড়িয়ে দিল, দশ টাকা এক শো টাকার কাগজ। রাজার ছবি আঁকা, বিচিত্র রং করা, পাতা আঁকা সব কাগজ।

আবার ছুটে গেল মালু, খুলে ফেলল আর একটা বস্তা। বেরিয়ে এল গাদি গাদি নোট।

আর একটা বস্তা। সেখানেও শুধু গাদি গাদি কাগজের নোট।

আর একটা বস্তা। সেখানেও শুধু তাড়া তাড়া কাগজের টাকা।

এ কী করছে মালু? হঠাৎ বুঝি ভয় পেয়ে যায় ও। ফুক করে নিভিয়ে দেয় মোমটা। টাকার গাদির উপর অন্ধকারে বসে থাকে মালু। বসে বসে ঘামে।

টাকার যেন ওকে দেখছে। দেখছে তন্ন তন্ন করে। দু চোখে সূঁচের তীক্ষ্ণতা ফুটিয়ে সেও যেন ভাসমান আঁধারের মিশকালো দেহটাকে বিঁধছে। বুকের ভেতর শুনতে পাচ্ছে অন্ধকারের কু মন্ত্রনা। ওর পায়ের নিচে লক্ষ টাকার মর্মর, শুকনো পাতার মতো যেন ভেংগে ভেংগে পড়ছে ওর পায়ের চাপে। অন্ধকারের কুমন্ত্রনার কাছে হার মানবে মালু?

মালু হাঁপিয়ে চলে। মালু ঘামিয়ে একসার হয়।

ধ্যুৎ শালা। হারামের টাকা। পাপের টাকা। চোরা বাজারের টাকা। বুঝি অন্ধকারকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে মালু। উঠে দাঁড়ায়। মোমটা জ্বালায়। বস্তায় বস্তায় কাগজের টাকাগুলো ভরে রাখে। ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি সেলাই করে রাখে মুখগুলো।